সুন্নাহর কর্তৃত্ব ও মর্যাদা

দলিল হিসাবে সুন্নাহর গ্রহণযোগ্যতা

মো: এনামুল হক

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

সুন্নাহ্‌র কর্তৃত্ব ও মর্যাদাঃ দলিল হিসাবে সুন্নাহ্‌র গ্রহণযোগ্যতা

মোঃ এনামুল হক

[সমকালীন বিশ্বের প্রখ্যাত ইসলামী স্কলার, জামালুদ্দিন জারাবযো-র **The Authority and the Importance of the Sunnah**-এর ছায়া অবলম্বনে লিখিত]

www.pathagar.com

সুন্নাহ্‌র কর্তৃত্ব ও মর্যাদা:
দলিল হিসাবে সুন্নাহ্‌র গ্রহণযোগ্যতা

মোঃ এনামুল হক

প্রকাশক
মুহাম্মাদ নাসীল শাহরুখ
সরণী প্রকাশনী
২৫, গ্রীন কর্ণার, গ্রীন রোড, ঢাকা-১২০৫ ।
গ্রন্থস্বত্ব:
লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত
প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১১
প্রাপ্তিস্থান:
আহসান পাবলিকেশন
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস (নীচতলা), ঢাকা-১০০০, ফোন: ৯৬৭০৬৮৬ ।
প্রচ্ছদ
সরণী প্রকাশনী
মুদ্রণ
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০, ফোন: ৯৫৭১৩৬৪ ।

মূল্য: ২০০ টাকা মাত্র

Sunnahr Kartritta O Marjada: Dalil Hishebe Sunnahr Grahanjoggata: Written by Md. Enamul Haque. Price: **TK.**.200 only.

www.pathagar.com

সরণী প্রকাশনীর অন্যান্য বই

কুর'আনে নৈতিক মূল্যবোধ

রাসূলুল্লাহর নামায (দ্বিতীয় সংস্করণ)

সমকালীন অপ্রিয় প্রসঙ্গ - ১

ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ

কুর'আন অধ্যয়নের সঠিক পন্থা

তিনি হলেন জিবরীল - তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন শিক্ষা দিতে এসেছিলেন।

সরণী কিশোর সিরিজ

আমাদের প্রিয় নবী

আল্লাহ্‌র পরিচয়

এই লেখকের অন্যান্য বই

অন্য পথের কন্যারা (অনুবাদ)

ইসলাম ২০০০ (অনুবাদ)

নিশ্চিহ্ন হওয়ার হুমকির মুখে ইসলামী মূল্যবোধ

সভ্যতার সংঘাত: আমরা এবং ওরা

বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে বিবাহ ও নারীবাদ

সমকালীন অপ্রিয় প্রসঙ্গ - ১

পবিত্র কুর'আনে জেরুজালেম (অনুবাদ)

কুর'আন অধ্যয়নের সঠিক পন্থা

www.pathagar.com

পূর্বকথা

লেখালেখির বয়স যত বাড়ছিল, আমার ততই মনে হচ্ছিল যে, আগের আবেগী লেখাগুলো না লিখলেই বোধহয় ভালো ছিল। যদিও এটা ঠিক যে, ইসলামকে ভালোবেসেই আমার প্রথম কলম ধরা। ইসলামের বা মুসলিমদের বিরুদ্ধে সকল অন্যায়ের প্রতিকারের দায়-দায়িত্ব বুঝি আমার একার ঘাড়েই বর্তায় - এমন একটা সুপ্ত অনুভূতিও হয়তো বা মনের কোন গোপন কোণে বাসা বেঁধে থাকবে। **জ্ঞান ছাড়া ঈমান বা ঈমান ছাড়া জ্ঞান** - স্কলাররা বলে থাকেন যে, দু'টোই খুব বিপজ্জনক। আমার প্রথম দিকের লেখা-লেখিগুলি একাধারে আবেগী ও "বিপ্লবী"ও বলা যায় - না, রাজনীতির ভাষায় "বিপ্লবী" বলতে যা বোঝায় তা নয় - আমি বলবো অনুভবের দিক থেকে "বিপ্লবী"। **"সঠিক জ্ঞান"** আর **"নানান দোষে দুষ্ট জ্ঞানের"** ভিতর তফাৎ করার মত জ্ঞান আমার তখন ছিল না! আমরা সবাই হয়তো জীবনে এরকম একটা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাই।

একটা সময় ছিল যখন সায়্যিদ কুতুব, মৌলানা মৌদুদী বা এমন কি আয়াতুল্লাহ্ খোমেনীর একটা লেখা পড়ে মনে হয়েছে - বাহ্ কি দারুণ! এরাই ইসলামের সত্যিকার মুখপাত্র! এখন বুঝি, এদের লেখা-লেখিতে সত্য যেমন রয়েছে, তেমনি অগণিত conjecture based বা "অনুমান নির্ভর" নিজস্ব মতামতও রয়েছে - যেগুলোর সূত্র অনুসন্ধান করে পেছনে চলতে থাকলে সুন্নাহয় গিয়ে পৌঁছানোর কোন সম্ভাবনা নেই! রাফিদী শিয়া আয়াতুল্লাহ্ খোমেনীর কথায় ও কাজে কত অগণিত মানুষ বিভ্রান্ত হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে - কারণ, মূলধারা সাধারণ মুসলিমরা জানেনই না যে, নবী (সা.) এবং সাহাবীরা যে পথের উপর ছিলেন, সেই পথের অনুসারী কেউ, কখনোই কোন

www.pathagar.com

রাফিদী শিয়ার অনুসারী হতে পারে না [১]! অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, জ্ঞানবিহীন ধর্মীয় আবেগের কারণে মানুষ এমন করে থাকবে/থাকে! সালমান রুশদীর "স্যাটানিক ভার্সেস" বের হবার পর, আয়াতুল্লাহ্ খোমেনী সালমান রুশদীর মৃত্যুদন্ড ঘোষণা করেছিলেন এবং যে তা কার্যকর করবে (অর্থাৎ যে তাকে হত্যা করবে) তার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন! সারা মুসলিম বিশ্বে তখন আয়াতুল্লাহ্ খোমেনী খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন এবং গণমানুষের মাঝে এমন একটা অনুভূতি আসে যে, গোটা মুসলিম জাহানে, সাহসী নেতা থাকলে ঐ একজনই আছেন, আর 'আলেম থাকলেও ঐ একজনই আছেন - যিনি ইসলামের সত্যিকার "সুবিচার" তুলে ধরে কথা বলতে পেরেছেন। কিন্তু আসলে কি তাই? যারা ফিকহ ও সুন্নাহ্ সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞান রাখেন, তারাই জেনে থাকবেন যে, সালমান রুশদী যদিও খুব খারাপ একটা কাজ করেছিলেন এবং ইসলামী রাষ্ট্রে ঐ কাজের সুন্নাহ্সম্মত বিচার হলেও হয়তো ঠিকই তার মৃত্যুদন্ডই হতো - তবু তার (আয়াতুল্লাহ্ খোমেনীর) ঐ ফতোয়া সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী ছিল। এর প্রধান কারণ হচ্ছে, সালমান রুশদীর উপর রিদ্দার হুজ্জত (প্রমাণ বা evidence) কায়েম করা হয় নি - অর্থাৎ তাকে ডেকে এরকম বোঝানো হয় নি যে, *দেখ এই কাজটা করলে কেউ যে ইসলাম থেকে বেরিয়ে "মুরতাদ" হয়ে যাবে - তুমি কি সেটা জানো/বোঝো? না জানলেও এখন তো জানলে - এখন তোমাকে তওবা করার সুযোগ দেয়া হলো ইত্যাদি ইত্যাদি.......* । হতে পারে আয়াতুল্লাহ্ খোমেনীর পদক্ষেপটা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ছিল - সহজ একটা জনপ্রিয়তা লাভের জন্য অথবা নিজের দ্বীন-না-জানা নির্বোধ সাধারণ মুসলিমদের কাছে নিজেকে মুসলিম জাহানের অবিসংবাদিত ও অপরিহার্য নেতা প্রতীয়মান করার জন্য। কিন্তু সাধারণ মানুষ জ্ঞানের অভাবে সেটাকেই সঠিক ও সময়োপযোগী মনে করেছে - আমি নিজেও তাই ভেবেছি।

---

[১] দেখুন: http://www.fatwa-online.com/fataawa/creed/deviants/0040416.htm

www.pathagar.com

অথচ, OIC-ভুক্ত ৪৮টি দেশের বড় বড় 'আলেমগণ ঐ ফতোয়াকে ভুল মনে করেছেন! জীবনের তথা সময়ের ঐ প্রস্থচ্ছেদে ব্যাপারটা না বুঝলেও, বিবর্তনের একটা পর্যায়ে বুঝেছি: **যে কোন 'আলেম, লেখক, নেতা বা চিন্তাবিদ - তিনি যত বড় মাপেরই হোন না কেন, তার আনুগত্য বা অনুসরণ হবে শর্ত-সাপেক্ষ - যতক্ষণ তার কথা আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূলের (সা.) সুন্নাহ্‌র সাথে সঙ্গতিপূর্ণ - আমরা তা শুনবো বা মানবো! আর তা না হলে তা মানবো না!!** এই ব্যাপারে কুর'আনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আয়াতটি (সূরা নিসা, ৪:৫৯) এই বইয়ে, আরো পরে, অনেক বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

আয়াতুল্লাহ্‌ খোমেনীর ব্যাপারে আমার বোধোদয় সম্বন্ধে তো বেশ বিস্তারিত বললাম। কিন্তু অপর দু'জন, যাদের নাম দিয়ে আলোচনা শুরু করেছিলাম - **সায়্যিদ কুতুব ও মৌলানা মৌদুদী** - তাদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে এটুকু বলা যায় যে, তারা সত্যি খুব বিশ্বস্ততার সাথে ইসলামের পুনর্জাগরণ চেয়েছিলেন, তারা বহু বিষয়ে কলম ধরেছিলেন, বিপ্লবী চিত্তের মানুষদের কাছে তারা খুবই জনপ্রিয় ছিলেন এবং এখনো আছেন - কিন্তু তাদের প্রচেষ্টায় কিছু আক্বীদাহ্‌গত ও পদ্ধতিগত ত্রুটি যেমন ছিল, তেমনি অগ্রাধিকার ঠিক করাতেও অনেক ভুল-ভ্রান্তি ছিল। তাদের নিয়ে আলোচনা বা সমালোচনা কোনটাই এই বইয়ের অবকাশের আওতায় আসে না। তাদের জন্য মুসলিম হিসাবে আমরা দোয়া করবো ইনশা'আল্লাহ্‌: ***আল্লাহ্‌ যেন তাদের ভুল-ভ্রান্তিগুলো ক্ষমা করে দেন এবং অন্যকে বিভ্রান্ত করার দায়-দায়িত্ব থেকেও যেন তাদের অব্যাহতি দেন*** - যেটা যে কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির জন্য খুব ভয়ের একটা ব্যাপার। তবে এটাও ঠিক যে, তাদের পাঠক, অনুরাগী বা অনুগামীরা যদি তাদেরকে proper perspective-এ দেখতে/ভাবতে পারতেন - অর্থাৎ, এটা ভাবতে পারতেন যে, ***তারা নবী-পয়গাম্বর কিছুই নন, সাহাবীও নন, চার***

www.pathagar.com

ইমামদের মত বিশেষ কেউ নন, এমন কি গত ১৪০০+ বছরে ইসলামের যত স্কলার গত হয়েছেন, তার ভিতর হয়তো এমন ১০০০ জন পাওয়া যাবে, জ্ঞানী হিসাবে যাদের মর্যাদা তাদের উপরে; সুতরাং তাদের ভুল-ভ্রান্তি থাকতেই পারে - তাহলে কোন সমস্যাই ছিল না। সমস্যা হচ্ছেঃ **শ্রদ্ধা করতে করতে এক সময় আমরা মানুষকে নির্ভুল বা infallible মনে করতে শুরু করি, ভাবতে শুরু করি যে তাদের সকল judgementই সঠিক**। অথচ, "আহলুস সুন্নাহ্ ওয়া আল জামা'আ"র মতে, আমাদের জন্য একমাত্র রাসূল (সা.)-ই হচ্ছেন নির্ভুল বা infallible। আর সবাই ভুল করতেই পারেন - তাদের শুদ্ধটুকু আমরা নেব, ভুলটুকু আমরা পরিত্যাগ করবো, ইনশা'আল্লাহ্! তা না করে যদি শ্রদ্ধাভাজন কারো কথায় আমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের (সা.) বেঁধে দেয়া কোন নিয়মের বাইরে চলে যাই - তবে **"আনুগত্যে শিরক"** নামক ভয়াবহ শিরকে পতিত হয়ে চির জাহান্নামী হবার সম্ভাবনার সম্মুখীন হতে পারি।

যাহোক, এই পর্যায়ে আমি আপনাদের আমার একটা disclaimer জানাতে চাই। আমার জ্ঞানের স্বল্পতাহেতু আমার কোন ভুল কথা/লেখা যদি কাউকে বিভ্রান্ত করে থাকে, **আমি সেজন্য আল্লাহ্র কাছে তওবা করছি এবং তারপর সর্বান্তঃকরণে তাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি!** এমন হয়ে থাকতে পারে যে, কোন একজন লেখক বা চিন্তাবিদের কোন কাজের প্রতি আমার উচ্ছ্বাস থেকে কেউ তার ভক্ত হয়ে উঠেছেন এবং পরবর্তীতে সেই সূত্র ধরে বিভ্রান্তিতে ডুবে গেছেন। ভবিষ্যতের জন্য বলছি, আমি যদি কারো রেফারেন্স দিই - তার মানে এই নয় যে, ঐ লেখক বা চিন্তাবিদ নিশ্চিতই আমার কাছে আদর্শ কোন ব্যক্তি - যার কোন দোষ-ত্রুটি নেই! মোটেই তা নয়, বরং ঐ লেখক বা চিন্তাবিদের যতটুকু শুদ্ধ - যতটুকু কুর'আন ও সুন্নাহ্র সাথে

www.pathagar.com

সঙ্গতিপূর্ণ, আমরা শুধু তাই নেব, যতটুকু কুর'আন ও সুন্নাহ্‌র সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ - আমরা তা প্রত্যাখ্যান করবো, ইনশা'আল্লাহ্!

ইসলাম কি, ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো কি, অগ্রাধিকারগুলো কি কি ইত্যাদি না জেনেই - ইসলামের জন্য **"কিছু একটা করার"** ব্যাপারে মনের ভিতর এক অদম্য বাসনা জাগ্রত হওয়া - যেটাকে আমাদের সিলেটি ভাষার স্থানীয় প্রবাদে "ঘোড়ার আগে গাড়ী" পরিস্থিতি বলা হয় - এরকম একটা অবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তি, সমষ্টি/সমাজ এমন কি ইসলামের জন্যও বিপজ্জনক! হঠাৎ একদিন বোধোদয় হবার পর, ইসলামের মহাসমুদ্রের দিকে ধাবমান কোন একটা ধারার সন্ধানে, অনেক তরুণ প্রাণকেই দেখেছি যেন-তেন কোন একটা ধারায় ঝাঁপ দিতে - পরিণতিতে শেষ পর্যন্ত কোথাও আর যাওয়া হয়নি। "রবিন হুড" মানসিকতার দুর্বল ধারা - শেষ পর্যন্ত মূল ধারার সাথে একাত্ম হতে পারে নি বরং বালুচরে মুখ থুবড়ে আটকে গেছে সকল প্রচেষ্টা। আমার উচিত আল্লাহ্‌র কাছে অশেষ শুকরিয়া জানানো - আল্লাহ্ যে আমাকে ঐ রকম সম্ভাব্য কোন পরিণতি থেকে রক্ষা করছেন সেজন্য - আলহামদুলিল্লাহ্!

"রবিন হুড" মানসিকতা কেন বললাম, সেটা আপনাদের একটু খুলে বলি। ৬০-এর দশকের মাঝামাঝি, আমরা যখন প্রথম অন্যের বাসায় গিয়ে টেলিভিশন দেখতে শুরু করি, তখন Richard Green অভিনীত "রবিনহুড" আমাদের খুব প্রিয় একটা সিরিজ ছিল (নাউযুবিল্লাহ্ - এখান থেকে কেউ যেন টেলিভিশনে হারাম বিষয় দেখতে উদ্বুদ্ধ না হয় - আল্লাহ্ যেন আমার অজ্ঞতাবশত করা গুনাহসমূহ সহ সকল গুনাহ মাফ করে দেন)। গরীবের বন্ধু রবিনহুড, "অত্যাচারী" শাসক বা ধনী মানুষদের থেকে গরীব বা অবহেলিত মানুষদের "অধিকার" ছিনিয়ে নিয়ে তাদের ফিরিয়ে দেয় - আমার বালক হৃদয়ে ধারণাটা সাংঘাতিক আলোড়ন সৃষ্টি করতো। যা সহজে

www.pathagar.com

achieve করা যায় না, তা শর্ট-কাট কোন উপায়ে দৈবাৎ যদি লাভ করা যেতো!!! - এধরনের একটা romanticism মানুষের সহজাত কি না - বিষয়টা নিয়ে আমি অনেক চিন্তা-ভাবনা করেছি। অথচ, দ্রুত ফলাফল লাভ করার চিন্তাটাই essentially অনৈসলামিক! একটা রাফ সার্চ করলেও patient, patiently, patience ইত্যাদি রূপে পবিত্র কুর'আনে "ধৈর্য্য" শব্দটি অন্তত ৬৯ বার ব্যবহৃত হতে দেখা যায়! ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনার প্রক্রিয়ায় আমি এটাও বুঝলাম যে, অনেক সংবেদনশীল, কোমল ও আবেগী হৃদয়ই হয়তো, প্রাথমিকভাবে, একটা অন্যায়ের প্রতিকার করতে কোন বিপ্লবী দলের সাথে সম্পৃক্ত হয় - "রবিন হুড" মানসিকতাবশত। যেমন ধরুন, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সাম্যবাদী বা সর্বহারাদের কথা! গরীবদের, মহাজনেরা বা ধনীরা শোষণ করছে দেখে অন্তরে একধরনের ক্ষোভের সৃষ্টি হওয়াটা স্বাভাবিক। এই শোষণের প্রতিকার কি?? এটা ভাবতে ভাবতেই হয়তো "আবেগবশতই" একজন কিশোর, মুহূর্তের ডিসিশনে কোন চরমপন্থী দলে যোগ দেয়। তারপর দলের অন্যান্যদের মতই সেও ভাবতে শুরু করে যে, এই অন্যায় বা বৈষম্যের প্রতিকার কি করে করা যায় এবং কত তাড়াতাড়ি করা যায়! পৃথিবীর ইতিহাসে কোন ভালো কাজে "শর্টকাট" নেবার উপায় নেই। "শর্টকাট" নিতে গেলেই হয় সেই ভালো কাজ ভেস্তে যাবে, নতুবা সেটা অন্য কিছুতে পরিণত হবে। এক্ষেত্রেও হয়তো তাড়াতাড়ি "বৈষম্য" দূর করতে গিয়ে, ধনীর কাছ থেকে সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে গরীবকে দেয়ার কোন অপারেশনে "রবিন হুড মানসিকতাবশত" "বড়দের" সাথে একদিন যোগ দেয় কিশোরটি। সেই প্রক্রিয়ায় হয়তো "শ্রেণী-শত্রু" খতম করার মত "মহৎ" কাজটি করতে গিয়ে একটি "বিপ্লবী হত্যাকান্ডের" সাথে জড়িয়ে পড়ে সে। এমনিতেই, সাধারণত এসব গুপ্ত সংগঠনে যোগদান করাটা অনেকটা one way journey, ফিরে আসার কোন পথ

www.pathagar.com

থাকে না! তারপর হত্যাকান্ডের সাথে নাম জড়িয়ে পড়লে তো আর কথাই নাই - খুন, জখম আর extortion তখন তার একমাত্র way of life হয়ে দাঁড়ায় - পরিণতিতে সর্বহারাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হৃদয়সম্পন্ন মানুষটি হয়ে ওঠে "ডাকাত"! ঐ জীবন থেকে মুক্তির কেবল মাত্র একটা দরজাই উন্মুক্ত থাকে - যা হচ্ছে "মৃত্যু": সুজানগরের কামরুল মাস্টার আর ঝুনু মেকারের মত করুণ পরিণতি। জীবনের শুরুটা হয় জনদরদী বিপ্লবী হিসেবে পরিচিত হবার মাধ্যমে, শেষটা হয় "ডাকাত" হিসেবে র‍্যাব বা পুলিশের সাথে "বন্দুকযুদ্ধে" নিহত হবার মাধ্যমে!

এত কথা বলার একটাই উদ্দেশ্য: **অনেককেই - বিশেষত বয়সে যারা তরুণ - তাদেরকে দেখা যায়, হঠাৎ যখন ভিন্ন কোন পথে চলতে চলতে আল্লাহ্, তাঁর রাসূল (সা.) ও তাঁর দ্বীনে সিরিয়াসলী বিশ্বাস করতে শুরু করেন - তখন আবেগ ও উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে অনেক সময়ই ঝামেলা বাঁধিয়ে ফেলেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তার নিজেরই শুদ্ধ দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাবার উপক্রম হয়।** সাধারণত দেখা যায়, দ্বীন শিখতে শুরু করেই, অন্যের দোষ ও অপূর্ণতা চোখে পড়তে শুরু করে - শুরুর দিকেই হয়তো বাসায় গিয়ে, নিজের বাবা, মা বা ভাই-বোনকে বলতে শুরু করলেন: **"তোমরা এসব কি নামায পড় - তোমাদের এসব নামায তো হচ্ছেই না!"** বা **"তোমরা তো কুফর ও শিরকে নিমজ্জিত"** ইত্যাদি। এরপরের দশা হচ্ছে কোন ইমামের পেছনে নামায হবে, আর কোন ইমামের পেছনে নামায হবে না - এসব নিয়ে গবেষণা এবং প্রচলিত মসজিদের ইমামদের পেছনে সালাত আদায় না করা (নামায না পড়া)। তারুণ্যের এসব প্রাণশক্তি, আবেগ বা অনুভূতিকে harness করতে না পারলে, বা লাগাম টেনে ধরতে না পারলে - সে সব বিপথে প্রবাহিত হতেই পারে। আমরা রাসূলের (সা.) জীবনী ঘাঁটলে দেখবো যে, মক্কার জীবনে, এরকম কত

www.pathagar.com

উচ্ছ্বাসকে তিনি প্রশমিত করেছেন - যখন বয়সে তরুণ সাহাবীরা "কিছু একটা" করতে চেয়েছেন।

যারা ইসলামকে ভালোবাসেন, ইসলামের প্রচার ও প্রসার নিয়ে কাজ করতে চান, অনুশীলনরত মুসলিম হিসেবে জীবনযাপন করতে চান, তাদের অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ও ধৈর্য্য সহকারে জীবন যাপন এবং জীবনধারণ করা উচিত - আর সেই প্রক্রিয়ায় তাদের আবেগের লাগাম টেনে ধরা উচিত এবং অগ্রাধিকার ঠিক করে নিজের দ্বীন শিখে নেয়া উচিত। প্রথমত, নিজের ঈমান বা আক্বীদাহ্‌কে নিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতে শুদ্ধ করে নেয়া উচিত। **আক্বীদাহ্‌ বলতে আমরা বোঝাতে চাচ্ছি: একজন মুসলিম আল্লাহ্‌, ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ, রাসূলগণ, ক্বিয়ামত ও অদৃষ্ট বা ভাগ্যের নির্ধারণ সম্বন্ধে কি কি বিশ্বাস রাখবেন আর কি কি বিশ্বাস রাখবেন না!** বলা বাহুল্য, এই বিশ্বাসগুলোর সব আসতে হবে **"অহী"** বা **"নস্‌"** (text)থেকে: হয় **কুর'আন**, নয়, **সহীহ সুন্নাহ্‌** থেকে। শুদ্ধ আক্বীদাহ্‌কে আমরা কম্পিউটারের "সফ্‌টওয়ারের" সাথে তুলনা করতে পারি। "সফ্‌টওয়ার" ছাড়া একটা কম্পিউটার যেমন কেবলই **"কোন-কাজে-না-লাগা"** একটা বাক্স বা "খোল", তেমনি, শুদ্ধ বিশ্বাস বা আক্বীদাহ্‌ ছাড়া একটা মানব জীবন একদিকে যেমন নিতান্তই নিষ্ফল, তেমনি অপরদিকে এই মানব দেহ পাথরের মতই তুচ্ছ - কেবলই জাহান্নামের জ্বালানী হবার যোগ্য(কুর'আন, ৬৬:৬)। তাছাড়া যে কারো এটা অনুধাবন করা উচিত যে, সারা পৃথিবীতে আজ যদি আবারও ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়, তবু তার নিজের কোন লাভ নাই - যদি তিনি (বড়) শিরক বা (বড়) কুফরের উপর মৃত্যুবরণ করেন। একবার ঈমান/আক্বীদাহ্‌ মোটামুটি শুদ্ধ ও কুফর/শিরক বিবর্জিত হলে, তখন যে কেউ সর্ব প্রথম নিজের জীবনে ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ায়, ইবাদতের কাজগুলো (অন্তত ফরজ ইবাদতগুলো) সঠিকভাবে সম্পন্ন করার চেষ্টা করবেন - পর্যায়ক্রমে সালাত (৫ ওয়াক্ত নামায), যাকাত,

www.pathagar.com

সিয়াম (রমাদানে ১ মাস রোজা), হজ্জ এবং তারপর অন্যান্য ইবাদতের ব্যাপারগুলো: দোয়া, কুরবানী, মানত, কসম ইত্যাদি ইত্যাদি! মনে রাখতে হবে যে, ঈমানের পরে ইবাদত কবুলের বা গ্রহণযোগ্য হবার দু'টি প্রধান শর্ত হচ্ছে:

১) বিশ্বস্ততা সহকারে একমাত্র আল্লাহ্‌র এবং আল্লাহ্‌র জন্যই সকল ইবাদতের কাজ নিবেদন করা। ২) রাসূলের (সা.) নির্দেশ, অনুমোদন **বা দেখিয়ে দেওয়া পন্থায় সেগুলো সম্পাদন করা!** এখানে প্রথম ব্যাপারটা হচ্ছে অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত - আর দ্বিতীয় ব্যাপারটা হচ্ছে কাজের ও প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত। এখান থেকেই ইসলামের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা মূলনীতি বেরিয়ে আসে - কোন একটা কাজে কেবল "বিশ্বস্ততাই" পর্যাপ্ত নয়, বরং কাজটা সম্বন্ধে জ্ঞান বা সেটা কিভাবে করতে হবে সে সম্বন্ধে জ্ঞান থাকাটা অপরিহার্য - অন্যভাবে বললে কার্য সম্পাদনের প্রক্রিয়াটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ - আর বলা বাহুল্য দ্বীনের সাথে সম্পৃক্ত যে কোন কাজের সঠিক প্রক্রিয়া খুঁজতে হবে সুন্নাহ্‌র মাঝে!! আমাদের এই বইটা এজন্যই এত গুরুত্বপূর্ণ।

আবু আমীনাহ্ বিলাল ফিলিপ্সের একটা বক্তৃতায় শুনেছিলাম, তিনি আমেরিকার জেলে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত একজন অন্ধ 'আলেমের কথা বলছিলেন - যিনি নাকি ওখানকার ধর্মান্তরিত মুসলিমদের ফতোয়া দিয়েছিলেন যে, আমেরিকা যেহেতু তাদের জন্য শত্রু-ভূমি, সেহেতু, ওখানকার জুয়েলারী দোকান-পাট ইত্যাদি লুটপাট করে অর্থ সংগ্রহ করাটা জায়েয। ফলে কিছু ধর্মান্তরিত যুবক আবেগতাড়িত হয়ে চুরি-ডাকাতিতে আত্ম-নিয়োগ করেন এবং ধরা পড়ার পর একেক জনের ৪৫ বছরের কারাদন্ড হয়। এখানেই ঐ **"রবিনহুড" মানসিকতার** কথা এসে গেল - শর্টকাট নেয়ার ব্যাপার এসে গেল - এখনকার সমাজব্যবস্থায় হয়তো যেটাকে "নিজের হাতে আইন" তুলে নেয়ার মত কিছু বলা হবে। অথচ, আমরা যদি রাসূলের

www.pathagar.com

(সা.) জীবন বা সুন্নাহ থেকে শিক্ষা নিতাম, তাহলে দেখতাম যে নবুয়ত পরবর্তী মক্কার ১৩ বছরের জীবনে মুসলিমরা কাফির-মুশরিক শাসিত জগতে বাস করতেন চরম প্রতিকূল অবস্থায় - যার একটা পর্যায়ে, এমন কি ৩ বছরের মত সময় তাঁরা অবরুদ্ধ অবস্থায় কাটান - তাঁদের বয়কট করা হয়েছিল, তাঁরা literally ঘাস-পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করেছেন - কই একটা লুট-পাটের ঘটনাও তো আমরা শুনি না! এভাবেই আমরা যদি প্রতিটি সমস্যা বা প্রতিকূল অবস্থায় রাসূল (সা.) বা তাঁর সাহাবীরা (রা.) কি করেছেন তা খুঁজে দেখতাম - তবে হয়তো আজকের আবেগ-ভিত্তিক বিভ্রান্তির অনেকটুকুই এড়িয়ে চলা সম্ভব হতো।

ইতিহাসে সুন্নাহ্ বিবর্জিত এই বিভ্রান্তির প্রথম মুখ্য বহিঃপ্রকাশ ঘটে খারেজীদের উত্থানের মধ্য দিয়ে - কি সাংঘাতিক "ইখলাস" বা "বিশ্বস্ততা" ছিল তাদের, অথচ গভীর জ্ঞান না থাকা তথা রাসূলের (সা.) সুন্নাহ্ না জানার কারণে, হযরত আলী (রা.) সহ কত প্রথম শ্রেণীর মুসলিমকে হত্যা করেছে তারা! আলী (রা.) ও ইবন আব্বাস (রা.)-এঁর মত সাহাবীদেরও তারা "কাফির" ঘোষণা করে। আজও সেই trend অব্যাহত রয়েছে পৃথিবীতে এবং দুঃখজনক হলেও এমন কি বাংলাদেশেও। বাংলাদেশেও এমন সমষ্টি বা গোষ্ঠী রয়েছে, যারা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে মুসলিম মনে করে না - সাধারণ মসজিদে নামায পড়ে না এবং সর্বক্ষণ অন্যের দোষ খুঁজে বেড়ায় - অথচ রাসূলের (সা.) মসজিদে মুনাফিক্বরাও নামায পড়তো বিনা বাধায়।

আলী (রা.)-কে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, *"নাহরাওয়ানের লোকেরা (অর্থাৎ খারেজীরা) কাফির কি না?"* তিনি বলেছিলেন, *"তারা কুফর থেকে পালিয়েছে"*। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো তারা মুনাফিক্ব কি না? তখন তিনি বললেন, *"মুনাফিক্বরা কদাচিৎ আল্লাহ্‌কে*

www.pathagar.com

স্মরণ করে, কিন্তু এরা সকাল বিকাল আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে থাকে; এরা হচ্ছে আমাদের ভাই যারা আমাদের বিরুদ্ধে (যেতে গিয়ে) সীমা লঙ্ঘন করেছে।"[২] দেখুন তাঁর সাথে যুদ্ধরত ও তাঁকে "কাফির" জ্ঞান করা বিদ্রোহীদের ব্যাপারেও, একজন খলিফার তথা সাহাবীর কত সহনশীল মনোভাব ছিল!!

গত কয়েকবছর ধরে বাংলাদেশে ধর্মীয় চরমপন্থার যতটুকু বিস্তার দেখা যায়, তার মূলেও আরো অনেক কিছুর পাশাপাশি রয়েছে একধরনের **"রবিনহুড" মানসিকতা**। তাড়াতাড়ি সবকিছু বদলে দেয়ার জন্য শর্ট-কাট রাস্তা খোঁজা। অথচ এসব করে ইসলাম প্রচার, ইসলাম শিক্ষা এবং ইসলাম অনুযায়ী জীবন যাপন করাকে যে প্রকারান্তরে ব্যাহত ও বিপর্যস্ত করা হলো - তার দায়-দায়িত্ব কে নেবে। এসব করে লাভ হয়েছে কাদের? আর ক্ষতিই বা হয়েছে কাদের?? ইসলামের প্রচার প্রসার কি এগিয়ে গেছে না শতবর্ষ পিছিয়ে গেছে?? তাছাড়া বোমাবাজি অথবা অন্যান্য নাশকতামূলক কান্ডের ফলশ্রুতিতে যদি একজন মুসলিমেরও (আমরা বলছি না যে, এমনি এমনি একজন অমুসলিমের ক্ষতি করা যাবে, তবু তর্কের খাতিরে আমরা শুধু মুসলিমদের ব্যাপারটাই consider করবো) অহেতুক প্রাণহানি ঘটে থাকে (বহু ঘটনায় যা নিশ্চিতভাবেই ঘটেছে), তাহলে ব্যাপারটা আল্লাহ্‌র কাছে অত্যন্ত অপছন্দনীয় হবার কথা - কারণ, একজন মুসলিমের জীবন আল্লাহ্‌র কাছে এই পৃথিবী এবং এতে যা কিছু রয়েছে তার চেয়ে প্রিয় - যে কারণে একজন মুসলিম বেঁচে থাকতেও আল্লাহ্‌ পৃথিবী ধ্বংস করবেন না (অর্থাৎ ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না)! আমাদের উচিত গত কয়েক বছরের ঘটনাবলী নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা এবং প্রত্যেকটি পরিস্থিতিতে রাসূল (সা.), খুলাফায়ে রাশেদীন বা সাহাবীরা কি করেছেন বা করতেন তা নিয়ে গভীরভাবে

---

[২] দেখুনঃ পৃষ্ঠা#১৭৩, ভল্যুম#৮, *আস-সুনান আল-কুবরা* - আল-বাইহাকি।

www.pathagar.com

চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করা! এই বইখানি ইনশা'আল্লাহ্ আমাদের সেই লক্ষ্য অর্জন করতে সমূহ সহায়তা দান করবে। আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে তাঁর রাসূলের (সা.) সুন্নাহ্ জানার, বোঝার ও মানার তৌফিক্ব দিন - আমীন!!

আমরা যেমনটা পরে এই বইয়েই দেখবো, ইনশা'আল্লাহ্, যে, বড় স্কলাররা সবাই বলে থাকেন, **"সুন্নাহ্ মানেই হচ্ছে দ্বীন ইসলাম, আর দ্বীন ইসলাম মানেই হচ্ছে সুন্নাহ্"**! অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হবে যে, **"সুন্নাহ্ ছাড়া দ্বীন ইসলামের কোন অস্তিত্বই নেই"**!! সেই সুন্নাহ্কে কিভাবে মূল্যায়ন করতে হবে – সে সম্বন্ধে অমূল্য তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ এই বইখানি পড়া থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান, বাংলাভাষী দ্বীনী ভাই-বোনদের সাথে ভাগাভাগি করার অদম্য ইচ্ছা থেকেই মূলত এই কাজে হাত দেয়া। সূত্র ও তথ্যের অনেক খুঁটিনাটি – বইখানির সরাসরি অনুবাদকে সাধারণের অনুধাবন ক্ষমতার সীমার বাইরে নিয়ে যেতে পারে – সেজন্য সরাসরি অনুবাদ এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। দ্বীনের মৌলিক বিষয় সংশ্লিষ্ট বই বলেই, যত বেশী সম্ভব পাঠকের কাছে পৌঁছে দেয়া যায় – সে চেষ্টা করতে গিয়ে এবং খানিকটা, অহেতুক আনুষ্ঠানিকতার জালে আটকানো এড়িয়ে যেতেও এমন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এছাড়াও অতীতে কয়েকখানি বই অনুবাদ করতে গিয়ে বুঝেছি যে, অনুবাদক, লেখকের প্রতি বিশ্বস্ত হতে চাইলে, তিনি আষ্টে-পৃষ্টে বাঁধা থাকেন – তিনি কি বুঝলেন বা অনুধাবন করলেন, তার চেয়ে লেখকের বাক্য-বিন্যাসের প্রতি সম্ভ্রম অনেক ক্ষেত্রেই প্রাধান্য লাভ করে – বিশেষত বইখানি যদি তথ্য সমৃদ্ধ হয়, তবে তো কথাই নেই। তাই আমি বরং চেষ্টা করেছি মূল বইখানার ছায়া অবলম্বনে – সংক্ষিপ্ত ও সহজ আকারে সাধারণ বাংলাভাষী পাঠকদের জন্য একখানা সহজ বই উপস্থাপন করতে। বাংলা বইখানা সংক্ষিপ্ত হলেও, মূল বইয়ের তথ্যের যথার্থতা ও গ্রহণযোগ্যতা এখানেও সম্পূর্ণ অটুট রাখা হয়েছে – যা যাচাই করার

www.pathagar.com

জন্য যে কোন উৎসাহী ও অনুসন্ধিৎসু পাঠক, যে কোন সময়ে মূল বইখানিতে ফিরে যেতে পারবেন ইনশা'আল্লাহ্!

সবশেষে, এই বই থেকে যদি মুসলিম উম্মাহ্‌র বাংলাভাষাভাষীরা সত্যিই উপকৃত হন এবং আল্লাহ্ যদি তাঁর অপার করুণাবশত আমার এই দীন হীন প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন, তবে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র – আর যে কোন ব্যর্থতার দায়-দায়িত্ব অতি অবশ্যই একান্তভাবে আমার।

ঢাকা
১১ই এপ্রিল, ২০১১।

www.pathagar.com

Glossary

'আক্বীদাহ্: দ্বীন ইসলামভুক্ত হতে হলে, যে সব বিষয়াবলীতে বিশ্বাস আনা অপরিহার্য।

আহ্লে কিতাব: সাধারণ অর্থে যাদের কাছে আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছিল – বিশেষ অর্থে ইহুদীগণ ও খৃস্টানগণ।

আহাদ হাদীস: খুব অল্প বা ২/১ সূত্রে বর্ণিত হাদীস।

আসার: কোন সাহাবী (বা তাবেঈ) থেকে আসা বর্ণনা - এগুলোকে যদিও অনেক ক্ষেত্রে হাদীস বলে উল্লেখ করা হয় অথবা হাদীসগ্রন্থে লিপিবদ্ধ হতেও দেখা যায়।

ইখলাস: বিশ্বস্ততা।

ইলাহ্: যার ইবাদত বা উপাসনা করা হয।

ইজতিহাদ: কুর'আন ও সুন্নাহ্ থেকে নিয়ম, কানুন বা ফতোয়া বের করা।

ইসনাদ: বর্ণনাকারীদের ধারা - সাধারণত হাদীস বর্ণনাকারীদের ধারার বেলায় শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ।

কাফির: সাধারণ অর্থে অবিশ্বাসী, বা, যে ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করেছে। দ্বিতীয় অর্থে আল্লাহ্র অনুগ্রহের ব্যাপারে যে অকৃতজ্ঞ।

উসূলী : যারা ইসলামী আইনতত্ত্বের বিশেষজ্ঞ বা আইনতত্ত্ববিদ। কোনটাকে আইন প্রণয়নের ব্যাপারে দলিল হিসাবে গ্রহণ করা যাবে অথবা কোনটা আইন প্রণয়নের ব্যাপারে দলিল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয় ইত্যাদি নিয়ে যারা গবেষণা করেন।

কুফ্র: প্রাথমিক সংজ্ঞায় আল্লাহ্য়, তাঁর রাসূলে (সা.) বা দ্বীনের মৌলিক বিষয়ে অবিশ্বাস।

কুফ্ফার: কাফিরের বহুবচন।

www.pathagar.com

খাবারঃ আক্ষরিক অর্থে "বর্ণনা" বা "সংবাদ"। কোন কোন হাদীসের স্কলার "হাদীস" ও "খাবার" দু'টো শব্দই একই অর্থে ব্যবহার করে থাকেন; আবার অন্যরা নবীর(সা.) কাছ থেকে আসা বর্ণনাকে "হাদীস" বলে থাকেন, কিন্তু অন্যদের কাছ থেকে আসা বর্ণনাকে "খাবার" বলে থাকেন।

হিকমাহ্/হিকমতঃ হিকমাহ্ শব্দের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে প্রজ্ঞা। কিন্তু কুর'আনে যখন اَلْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (কিতাবখানি ও হিকমাহ্) বলা হয়েছে - তখন হিকমাহ্ বলতে কুর'আনের সাথে সাথে আর যা কিছু নাযিল করা হয়েছে - তা বোঝানো হয়েছে! এখানে নবীর (সা.) সুন্নাহ্‌র কথা বলা হয়েছে বলে মনে করা হয়।

ফাসিক্ঃ আল্লাহ্‌র বিধানকে যে অবশ্যকরণীয় মনে করে (অর্থাৎ বিশ্বাসী), কিন্তু বাস্তবে তা পালন করে না।

শির্কঃ প্রতিপালক হিসেবে বা উপাস্য হিসেবে আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে অংশীদার করা, অথবা, আল্লাহ্‌র নামসমূহের যে গুণাগুণ, নিরঙ্কুশ অর্থে, আর কারো সে সব গুণাগুণ রয়েছে বলে মনে করা।

মুশরিকঃ যে শির্ক করে।

মুরতাদঃ একবার ইসলাম গ্রহণ করার পর যে স্বধর্ম ত্যাগ করে।

মুনাফিক্বঃ যারা মুখে বিশ্বাসের ঘোষণা দেয়, অথচ অন্তরে বিশ্বাস পোষণ করে না।

বিদ'আতঃ উপাসনা ভেবে বা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করার উদ্দেশ্যে এমন কিছু করা - যা আল্লাহ্ বা তাঁর রাসূল (সা.) করতে বলেননি, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) নিজে করেন নি, নীরবে অনুমোদন করেন নি অথবা সাহাবারা ঐক্যমতের ভিত্তিতে করেন নি।

শাহাদাঃ "শাহাদা" আক্ষরিক অর্থে "সাক্ষ্য"। ইসলামী পরিভাষায় এই ঘোষণা (সাক্ষী) দেয়া যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন সত্যিকার ইলাহ্ (বা উপাস্য) নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র রাসূল।

মুজতাহিদঃ যিনি ইজতিহাদ করতে সক্ষম।

তাগুতঃ আল্লাহ্ ছাড়া আর যা কিছুর ইবাদত করা হয় - মিথ্যা ইলাহ্!

www.pathagar.com

সালাফঃ ইসলামের প্রথম তিন প্রজন্মের মুসলিমগণ – রাসূল(সা.)-এর হাদীস অনুসারে যাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজন্ম বলে ধরা হয়।

মুতাওয়াতির হাদীসঃ ঐ হাদীসকে বলা হয় যা অনেকের বর্ণনায় এমনভাবে এসেছে যে, এটা অকল্পনীয় যে, তারা সকলেই একই ভুল করে থাকবেন অথবা সকলেই মিথ্যা বলবেন।

শরীয়াহ্ঃ ইসলামী আইন।

ফিক্হঃ যে শাস্ত্রে কোন একটা কাজের বা আমলের মূল্যায়ন করা হয় - কাজটা ফরজ, ওয়াজিব, মুস্তাহাব, মানদুব, মুবাহ্, মাকরূহ্ বা হারাম যে শ্রেণীরই হোক না কেন। আরো সহজভাবে বোঝাতে বলতে পারতামঃ যে শাস্ত্রের উপর ভিত্তি করে "ফতোয়া" বা "মতামত" দেয়া হয়ে থাকে - বাস্তব জীবনে আমরা যখন এমন কোন সমস্যায় বা অবস্থায় পড়ি যা ইতিপূর্বে আমাদের কাছে অজানা ছিল - তখন, ঐ অবস্থায় আমাদের জন্য কি করণীয় তা জানতে আমরা এই শাস্ত্রের পন্ডিতদের শরণাপন্ন হই।

হাদীসঃ পারিভাষিকভাবে একটা হাদীস হচ্ছে মূলত রাসূল (সা.)-এঁর যে কোন বর্ণনা – তাঁর কথা, কাজ এবং নীরব সম্মতি, আচরণ, শারীরিক বৈশিষ্ট্য অথবা জীবন-বৃত্তান্ত সংক্রান্ত যে কোন বর্ণনা।

সহীহ্ হাদীসঃ পরীক্ষিত ও গ্রহণযোগ্য শুদ্ধ হাদীস, যা শুদ্ধতার সকল শর্ত পূরণ করে। এই শ্রেণীর হাদীস ইসলামী আইনের ভিত্তি হিসেবে নেয়া হয়।

হাসান হাদীসঃ এটাও পরীক্ষিত "ভালো" হাদীস, কিন্তু সহীহ্ হাদীসের মত শক্তিশালী নয়।

দঈফ হাদীসঃ দুর্বল হাদীস - যা "সহীহ্" বা "হাসান" হবার শর্তগুলো (এই বইয়ে আরো পরে "সহীহ্" বা "হাসান" হবার ৫টি শর্ত বর্ণনা করা হয়েছে) পূরণ করে না। সরাসরি ইসলামবিরোধী কোন ব্যাপার না থাকলে এবং এর সমর্থনে অন্যান্য পর্যাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ থাকলে (যেমন, কিছু দুর্বলতা সহ অনেকে বর্ণনা করেছেন) এই শ্রেণীর হাদীসকে "হাসান" পর্যায়ে উন্নীত করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

দঈফ জিদ্দানঃ খুবই দুর্বল হাদীস, এটাকে কখনোই "হাসান" পর্যায়ে উন্নীত করা যাবে না।

মওদুঃ মওদু বা জাল হাদীস হচ্ছে, হাদীস বলে চালিয়ে দেয়া এমন একটি বর্ণনা - যা কিনা সূত্র ধরে পেছনে গেলে একজন জালকারী পর্যন্ত পৌঁছায়। হাদীসের আলোচনা করতে গিয়ে, অনেক স্কলারই এই শ্রেণীর বর্ণনাকে হাদীস বলেই গণ্য করেন না।

তাকওয়াঃ আল্লাহ্‌ভীরুতা বা আল্লাহ্‌র সামনে যে আমরা রয়েছি এই সচেতনতা।

ওহী মাতলুঃ আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আসা যে বাণী বা ওহী তিলাওয়াত করা হয়।

ওহী গায়ের মাতলুঃ আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আসা যে বাণী বা ওহী তিলাওয়াত করা হয় না, যেমন সুন্নাহ্‌র মাধ্যমে প্রাপ্ত নির্দেশাবলী।

তৌহীদঃ আল্লাহ্‌র একত্ব - "আর কেউ বা কিছুই কোন দিক দিয়েই আল্লাহ্‌র মত নয়" - মূলত এই ধারণা।

খাওয়ারীজঃ রাসূলের(সা.) বর্ণনায় ও ভবিষ্যতবাণীতে বর্ণিত ধর্মীয় চরমপন্থী গোষ্ঠী। হযরত আলী (রা.) বিরুদ্ধে যুদ্ধের মাধ্যমে এদের অধ্যায়ের সূচনা হলেও, যুগে যুগে এদের আবির্ভাব ঘটতে থাকবে বলে মনে করা হয়।

যিন্দিকঃ – ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী, যারা মুসলিমদের মাঝে ছদ্মবেশে থেকে, ভিতর থেকে ইসলামকে ধ্বংস করতে চায়।

তিজারাহ্‌ঃ ব্যবসায়ের আরবী প্রতিশব্দ – পবিত্র কুর'আনে যা বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে।

তাওয়াক্কুলঃ কোন কিছুর উপর ভরসা করা বা কোন কিছুর উপর আস্থা জ্ঞাপন করা।

ফিত্‌রাঃ সহজাত বোধ বা প্রবণতা।

সাকিনাঃ প্রশান্তি।

মতনঃ হাদীসের বক্তব্য বা ভাষ্য (text)।

মিলাদঃ জন্ম, জন্মকাল বা জন্মতারিখ।

www.pathagar.com

নাজাসা: অপবিত্রতা – যেমন মল-মূত্র ইত্যাদি।

দ্বীন: দ্বীন হচ্ছে কোন একটি নির্দিষ্ট ব্যবস্থার নিয়মকানুন ও সেসবের অনুশীলনের প্রতি কারো আত্মসমর্পণ এবং আনুগত্য। দ্বীনের শব্দগত অর্থ হচ্ছে 'ঋণ' বা দু'টি পক্ষের মাঝে একটা দেয়া-নেয়ার সম্পর্ক – ইসলামী পরিভাষায় যে সম্পর্কটি হচ্ছে – সৃষ্টিকর্তা ও তাঁর সৃষ্টির মাঝে। কুরআনে আল্লাহ্ বলেন যে, নিশ্চিতভাবে ইসলামই হচ্ছে আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কযুক্ত একমাত্র জীবনধারা বা 'দ্বীন'।

www.pathagar.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
পূর্বকথা	৪
Glossary	১৭
ভূমিকা	২৫
এরকম একটা বইয়ের প্রয়োজনীয়তা	২৫
প্রথম অধ্যায়: 'সুন্নাহ্' ও 'হাদীস' -এই শব্দ গুলির অর্থ	৩০
সুন্নাহ্ শব্দের অর্থসমূহ	৩০
'সুন্নাহ্‌র' আভিধানিক অর্থ	৩১
ফিকহ্ শাস্ত্রবিদদের বা ফকীহদের ব্যবহারে 'সুন্নাহর' সংজ্ঞা	৩৩
হাদীসের স্কলাররা সুন্নাহ শব্দটির যে সংজ্ঞা দিয়ে থাকেন	৩৭
ইসলামের আইন তত্ত্বে 'সুন্নাহ' শব্দটির সংজ্ঞা	৪০
"সুন্নাহ্" শব্দটি ব্যবহার করার বেলায় ফিকহ্ শাস্ত্রবিদ এবং উসূলীদের মাঝে যে পার্থক্য দেখা যায়	৪২
আক্বীদাহ্ বিশেষজ্ঞদের মতে "সুন্নাহ্" শব্দটির সংজ্ঞা	৪৫
হাদীস শব্দটির অর্থ	৪৯
সুন্নাহ ও হাদীসের মাঝে সম্পর্ক	৫২
'সুন্নাহর কর্তৃত্ব'এই অভিব্যক্তিতে 'কর্তৃত্ব ' ও 'সুন্নাহ' শব্দগুলির অর্থ	৫৫
উপসংহার	৫৮
দ্বিতীয় অধ্যায়: দলিল হিসাবে সুন্নাহর মর্যাদা ও গুরুত্ব প্রতিষ্ঠায় প্রমাণসমূহ	৬০
ভূমিকা	৬০
নবীর সুন্নাহর সাথে সম্পৃক্ত কুর'আনের আয়াত সমূহ	৬১
রাসূলের (সা.) প্রতি আনুগত্য হচ্ছে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য	৬১
আল্লাহ্ নবীর আনুগত্য করার আদেশ দেন এবং তাঁকে অমান্য করার ব্যাপারে সতর্ক করে দেন	৬৩
নবীর সিদ্ধান্ত ও অনুশাসন মেনে নেয়া হচ্ছে ঈমানের অংশ	৭৮
রাসূল (সা.) কে অনুসরণ করাটা আল্লাহর ভালবাসা , সত্যিকার জীবন ও হেদায়েতের চাবিকাঠি	৮৪
কৌশল (হিকমাহ্/হিকমত) নাযিল হওয়া	৮৭
নবীর প্রতি সঠিক আদবের আদেশ তাঁর অবস্থান ও কর্তৃত্বের ইঙ্গিত দেয়	৯১
আল্লাহর তরফ থেকে নবীর জন্য দিকনির্দেশনা	৯৪

www.pathagar.com

কুর'আনের আয়াতসমূহ থেকে উপনীত সিদ্ধান্ত	৯৭
সুন্নাহর গুরুত্বের বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে যে সমস্ত আয়াত ব্যবহার করা হয়	৯৮
সুন্নাহর গুরুত্ব সম্বন্ধে নবীর (সা.) নিজের বক্তব্যসমূহ	১০৩
সুন্নাহ্ সম্পর্কে সাহাবীদের দৃষ্টিভঙ্গী	১১৫
সুন্নাহর ব্যাপারে স্কলারদের মতামত	১২৫
চার ইমাম এবং সুন্নাহ্ সম্বন্ধে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি	১২৮
উপসংহার	১৩৮
তৃতীয় অধ্যায়ঃ রাসূলের (সা.) ভূমিকাসমূহ	**১৪১**
(১) কুর'আন ব্যাখ্যাকারী হিসেবে নবী মুহাম্মদ (সা.)	১৪১
নবী (সা.) যেভাবে কুর'আনের অর্থ ব্যাখ্যা করে গেছেন	১৪৬
নবী (সা.) ঐ সমস্ত শব্দাবলীর অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন যেগুলোর অর্থ বিভিন্ন কারণে অনির্দিষ্ট ছিল	১৪৬
নবী (সা.) সাহাবীদের ও অন্যান্যদের ভুল সংশোধন করেন	১৫০
যা কিছু অবাধ, নবী (সা.) সেটা নির্ধারণ করে দিয়ে গেছেন এবং সাধারণ অনুশাসন প্রয়োগের নির্দিষ্ট ক্ষেত্র চিহ্নিত করে গেছেন	১৫১
কুর'আনের কোন আয়াতগুলো মানসুখ তা নবী (সা.) চিহ্নিত করে গেছেন	১৫৪
নবী (সা.) কুর'আনের ঐ সমস্ত আদেশগুলোর বিস্তারিত প্রয়োগ দেখিয়ে গেছেন, যেগুলোর কুর'আনে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ নেই	১৫৫
নবী (সা.) এমন বক্তব্য রেখেছেন যেগুলোর অর্থ কুর'আনের আয়াতসমূহের মতই যেগুলো কুর'আনের বক্তব্যকে জোরদার করে এবং আরো পরিস্কার করে দেয়	১৫৭
নবী (সা.) এমন সব ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা করে গেছেন যেগুলোর কুর'আনে উল্লেখ নেই	১৫৯
কুর'আন বুঝতে গিয়ে নবীর (সা.) জীবন বৃত্তান্তের শরণাপন্ন হওয়া	১৬১
কুর'আনের ব্যাখ্যাকারী হিসাবে নবীর (সা.) ভূমিকার ব্যাপারে উপসংহার	১৬৩
(২) এক স্বনির্ভর আইনের উৎস হিসেবে আল্লাহর রাসূলের (সা.) ভূমিকা	১৬৯
নবীর (সা.) আইন প্রণয়নের ব্যাপারে আল্লাহর অনুমোদন	১৭২
কুর'আনে কোন ভিত্তি নেই এমন একটি সুন্নাহ	১৭৫
(৩) আচরণের আদর্শ হিসেবে নবীর (সা.) ভূমিকা	১৮০
(৪) আনুগত্যের দাবীদার হিসেবে নবীর (সা.) ভূমিকা	১৮৮
উপসংহারঃ নবীর (সা.) ভূমিকাসমূহ, সুন্নাহ অনুসরণের অপরিহার্যতা নির্দেশ করে	১৯২

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়ঃ সুন্নাহর মর্যাদা বনাম কুর'আন	**১৯৪**
প্রথম মতঃ কুর'আন সুন্নাহর উপর প্রাধান্য বা অগ্রাধিকার পাবে	১৯৪
উপরোক্ত প্রথম মতের প্রমাণের উপর মন্তব্য	১৯৮
দ্বিতীয় মতঃ কর্তৃত্ব ও মর্যাদার ব্যাপারে কুর'আন ও সুন্নাহ সমান গুরুত্ব বহন করে	২০৬
তৃতীয় মতঃ কুর'আনের উপর সুন্নাহ প্রাধান্য পাবে	২১০
কুর'আনের পাশাপাশি সুন্নাহর কর্তৃত্ব ও অবস্থানের বিষয়ে উপসংহার	২১২
এই বোধের গুরুত্ব	২১৪
উপসংহার	২১৬
পঞ্চম অধ্যায়ঃ আল্লাহ কর্তৃক সুন্নাহর সংরক্ষণ	**২১৭**
কতগুলো উপায় যার মাধ্যমে আল্লাহ সুন্নাহ সংরক্ষণ করেছেন	২২১
নিজেদের গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে সাহাবীদের অনুধাবন	২২৩
হাদীসের নথিভুক্তি বা লিপিবদ্ধকরণ	২২৭
প্রথম বছরগুলোর ইসনাদ	২৪০
হাদীস সংগ্রহ করতে গিয়ে পরিভ্রমণ	২৫১
প্রথম যুগের হাদীস সমালোচনা এবং বর্ণনাকারীদের মূল্যায়ন	২৫৭
হাদীস জাল করার সূত্রপাত	২৫৯
উপসংহার	২৬৯
ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ যে সুন্নাহ প্রত্যাখ্যান করে তার বেলায় বিধান	**২৭১**
দ্বীনের এমন কিছু অস্বীকার করা যা কিনা নিশ্চিতভাবেই এর অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।	২৭১
যে ব্যক্তি সুন্নাহ প্রত্যাখ্যান করে তার ব্যাপারে বিভিন্ন স্কলারদের বক্তব্য	২৭৬
উপসংহার	২৮১
সপ্তম অধ্যায়ঃ সুন্নাহর পথই হচ্ছে ইসলামের পথ	**২৮৩**
সুন্নাহ ও হাদীসের লোকজন বলতে আসলে কি বোঝায়	২৯৭
সুন্নাহ অনুসরণ করতে গেলে কঠোর সংকল্পের প্রয়োজন রয়েছে	৩০৬
উপসংহার	৩১৮
শেষ কথা	৩১৯

www.pathagar.com

ভূমিকা

এরকম একটা বইয়ের প্রয়োজনীয়তা

সাধারণ ভাবে এই ব্যাপারটা সর্বজনবিদিত যে, কুর'আন ও মুহাম্মাদ (সা.)-এঁর সুন্নাহ্‌র উপর ভিত্তি করেই ইসলাম প্রতিষ্ঠিত [পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা সুন্নাহ্‌র সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করবো, এখানে সংক্ষেপে আমরা এটুকু বলবো যে, সুন্নাহ্ হচ্ছে "রাসূলের (সা.) জীবনের ধরন"]। কিন্তু এমন কিছু অবস্থার অবতারণা হয়েছে, যে জন্য সুন্নাহ্ সমন্ধে বিস্তারিত আলোচনা এবং ইসলামে এর গুরুত্ব নিয়ে লেখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। সে অবস্থাগুলো নিম্নরূপঃ

১)কুর'আনের বিপরীতে সুন্নাহ্‌র অবস্থান নিয়ে সংশয় বা ভুল বোঝাবুঝি রয়েছে **"কুর'আন যা বলে, তা আমাদের অবশ্যই পালন করতে হবে, যা কিছু সুন্নাহ্‌য় পাওয়া যায়, তা পালন করাটা উত্তম"** – এরকম একটা কথা যে মুসলিমরা বলে থাকেন, তার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া বিরল নয়। এমনও শোনা যায় যে, **"যতক্ষণ পর্যন্ত কুর'আনে কিছু পাওয়া যাচ্ছে না, ততক্ষণ সেটাকে ফরজ বলে মনে করা যাবে না। যদি তা কেবল সুন্নাহ্‌য় পাওয়া যায়, তবে কেবল এটুকুই বলা যাবে যে, তা পালন করা পছন্দনীয় এবং কারো জন্য সেটা পালন করাটা অবশ্যকরণীয় নয়"**। এ ধরনের ভুল বোঝাবুঝি বা সংশয়ের পেছনে মূল কারণ হচ্ছে এই বাস্তবতা যে, সুন্নাহ সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট তথ্য এবং "সুন্নাহ্" শব্দটির ব্যবহারবিধি ঐ ব্যক্তির কাছে অস্পষ্টভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

২)সময়ের ব্যবধানে এমন দলেরও উৎপত্তি ঘটেছে, যারা দাবী করে যে, মুসলিমরা সুন্নাহ্ অনুসরণ করতে বাধ্য নয়। এসব ব্যক্তিরা দাবী

www.pathagar.com

করে যে, তারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর সপক্ষে বিস্তারিত যুক্তি উত্থাপন করে। দুর্ভাগ্যক্রমে তারা কিছু মানুষকে বোকা বানাতেও সফল হয়েছে। বিশেষত পশ্চিমে, তারা নতুন ধর্মান্তরিতদের প্রভাবিত করে থাকে – ইসলাম সম্বন্ধে যাদের প্রাথমিক জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। তাদেরও কাজগুলো বিস্তারিত ঘেঁটে দেখলে কারো মনে হতে পারে যে, তাদের যুক্তিগুলো সম্পূর্ণ রূপে অগ্রাহ্য করার মত নয়।[৩]

৩)মুসলিমদের একাংশের উপর কিছু চিন্তা ধারার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যার ফলে, সাধারণভাবে আধুনিক যুগ এবং বিশেষভাবে পশ্চিমের সাথে ইসলামকে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিভাত করতে তারা সুন্নাহ্‌র ভূমিকাকে খাটো করে দেখতে চান[৪]।

যারা সুন্নাহ্‌কে পুরোপরি প্রত্যাখ্যান করেন, তাদের চেয়ে এই শ্রেণীর লোকদের যুক্তিতর্কগুলো সূক্ষ্ম ও বিস্তারিত হয়ে থাকে। প্রায়শই সাধারণভাবে তারা সুন্নাহর সার্বিক গ্রহণযোগ্যতা সমর্থন করে থাকেন,

---

[৩] সর্ব প্রথম এরকম দলের উৎপত্তি হয় পাক-ভারত উপমহাদেশে। আরব বিশ্বে শক্ত ভিত তৈরী করতে না পারলেও, তাদের চিন্তাধারা পরবর্তীতে মিশরেও ছড়িয়ে পড়ে। দুর্ভাগ্যবশত, এখন পশ্চিমে এধরনের দল দেখা যায়। তাদের ইতিহাস সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে এবং তাদের যুক্তির খন্ডন সম্বন্ধে জানতে দেখুন: *Al-Quraaniyoon wa Shubahaattuhum Haul al-Sunnah* - Khaadim Hussain Ilaahi Bakhsh

[৪] সুন্নাহর উপর আধুনিকতাবাদীদের আক্রমণ সম্বন্ধে সবাই কমবেশী জানেন। এই আক্রমণের উদ্দেশ্য হচ্ছে মূলত ইসলামকে তার ব্যবহারিক দিকগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন করে কেবলমাত্র তাত্ত্বিক পর্যায়ের এক প্রতীকী ধর্মে পরিণত করা – আজকের খ্রীষ্টধর্মের বেশীর ভাগের অবস্থা যেমন ঠিক তেমন। S.M.Yusuf তার *An Essay on the Sunnah: Its Importance, Transmission Development and Revision* বইতে বলেন: *"আমাদের নিজেদের সময়ের তথাকথিত আধুনিকতা, যার ধ্বজাধারীরা এর সংজ্ঞার ব্যাপারে অদ্ভুত নীরবতা অবলম্বন করে থাকেন – সেই আধুনিকতা আসলে নতুন পরিচ্ছদে সুন্নাহর উপর সেই সনাতন আক্রমণ – তফাতটা শুধু এই যে, এখন তার সাথে রয়েছে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও শিল্প ও প্রযুক্তির ইন্ধন। এমতাবস্থায় মনেই হতে পারে যে, কেবলমাত্র যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলার শর্তে, ধর্মকে টিকে থাকতে দিয়ে এক বিশাল দয়া দেখানো হয়েছে।..... আধুনিকতা প্রায়োগিক ইসলামের সাথে যুদ্ধে রত – এর রীতি-নীতি এবং এর প্রতিষ্ঠান সমূহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রত।"*

www.pathagar.com

অথচ দেখা যাবে কোন একটি নির্দিষ্ট হাদীস – যেটাকে মেনে চলা তাদের জন্য কষ্টকর মনে হয় – সেটাকে প্রত্যাখ্যান করতে তারা সচেষ্ট হন। এছাড়া কোন একটা সংশ্লিষ্ট অভিব্যক্তির বিষয়ে গবেষণায় লিপ্ত হবার প্রবণতাও তাদের মাঝে পরিলক্ষিত হয়, যে সম্বন্ধে তাদের শ্রোতাদের পর্যাপ্ত জ্ঞান নাও থাকতে পারে যেমন 'মুতাওয়াতির' ও 'আহাদ' হাদীস সংক্রান্ত বির্তক।

৪)সবশেষে ওরিয়েন্টালিষ্টগণ, মিশনারীগণ ও তাদের মত যারা ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চায় তারা রাসূল (সা.)-এঁর সুন্নাহ্‌র উপর তাদের আক্রমণ জারী রেখেছে। এসব মানুষেরা ইসলামের সুন্নাহ্‌র গুরুত্ব পরিপূর্ণরূপেই উপলব্ধি করে। সাধারণত ও সার্বিক পর্যায়ে সুন্নাহ ও হাদীস সম্বন্ধে আপামর মুসলিম জনসাধারণের জ্ঞানের স্বল্পতা, ইসলামকে আক্রমণ করার ব্যাপারে তাদের জন্য একটা পথ খুলে দেয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এ সমস্ত আলোচনা বিস্তারিত ও খুঁটিনাটিসমেত হয়ে থাকে, কখনো সেসব কোন থিসিস অথবা পান্ডিত্যপূর্ণ নিবন্ধের আকারে প্রকাশ করা হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে, বিশেষত কিছু মিশনারীদের প্রচেষ্টা দেখতে পাওয়া যায় যে, তাদের প্রদর্শিত যুক্তি নির্ভেজাল প্রতারণা ও মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত।
[আল্লাহর অশেষ রহমতে প্রফেসর মুস্তফা আজামী ওরিয়েন্টালিস্ট এবং তাদের অনুসারীদের অনেক আক্রমণের সমুচিত জবাব দিয়েছেন। বিস্তারিতের জন্য দেখুন On Schacht`s OrDgin of Mohammedan Jurisprudence - Mustafa Al- Azami]

উপরোক্ত বিষয়গুলো অথবা ভুল ধারণাগুলো যাদের উপর কোন মন্দ প্রভাব ফেলে না, তাদের জন্যও আমাদের এই কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু ভূমিকা পালন করতে পারে। **প্রথমত**, এটা তাদের রাসূল (সা.)-এঁর সুন্নাহ্‌র গুরুত্ব ও তার সাথে লেগে থাকার প্রয়োজনীয়তার কথা

www.pathagar.com

স্মরণ করিয়ে দিতে পারে। এমনিতে যে কেউ সুন্নাহ্ পালন করার বাধ্যবাধকতা সম্বন্ধে সচেতন থাকলেও, রাসূলের (সা.) আদেশ মেনে চলা ও তাঁর উদাহরণ অনুসরণ করার ব্যাপারে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা.) কি দারুণ গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তা কখনো কখনো ভুলে গিয়ে থাকতে পারেন। সুতরাং একবার মনে করিয়ে দেয়া হলে এবং এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কুর'আনের আয়াতগুলো এবং হাদীসসমূহ আর একবার পড়লে, তা হয়তো যে কোন ব্যক্তির কাছে ব্যাপারগুলোকে প্রাণবন্ত করে তুলতে পারে এবং সুন্নাহ্ অনুসরণ করার ব্যাপারে তার সংকল্প দৃঢ়তর হতে পারে। যেমনটা আল্লাহ্ কুর'আনে বলেন:

وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾

"এবং তাদের স্মরণ করিয়ে দাও, নিশ্চিতই স্মরণ করানো থেকে বিশ্বাসীরা লাভবান হয়।" (সূরা যারিয়াত, ৫১:৫৫)

দ্বিতীয়ত, সুন্নাহ্ ও হাদীস সম্বন্ধে আরো বেশী জানা এবং আরো বিস্তারিত ভাবে শিক্ষা লাভ করার ব্যাপারে এটা একটা অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করতে পারে। আবারও, যে কেউ সাধারণভাবে সুন্নাহ্র অবস্থানটা উপলব্ধি করে থাকতে পারেন, কিন্তু রাসূল (সা.)-কে মানার ও অনুসরণ করার ব্যাপারে আল্লাহর কথাগুলো তিনি যখন পুনরায় পড়বেন, তখন হয়তো সুন্নাহ্ ও হাদীস সম্পর্কে আরো বেশী জানার আকাঙ্খা তার মনে জেগে উঠবে; অনুপ্রাণিত ব্যক্তি হয়তো তখন কেবল বাহ্যিকভাবে হাদীস জেনেই ক্ষান্ত হবেন না বরং বিস্তারিত ভাবে তা অধ্যয়ন করে আল্লাহর কাছ থেকে আগত ওহীর এই গুরুত্বপূর্ণ রূপটি থেকে যতটুকু সম্ভব হেদায়েত লাভের চেষ্টা করবেন ইনশা'আল্লাহ্।

www.pathagar.com

তৃতীয়ত, এ ধরনের একটি প্রচেষ্টা (কাজ) যে কারো ঈমান বৃদ্ধিতে সহায়ক হতে পারে। নিশ্চিতই রাসূল (সা.)-এঁর সুন্নাহ্ অনুসরণ করে একজন মুসলিম অবশ্যই সেই পথটাই অনুসরণ করছেন, যেটা আল্লাহ্‌র কাছে পছন্দনীয়। এবং তা তাকে ইনশা'আল্লাহ্ পরকালে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও জান্নাতে নিয়ে যাবে।

চতুর্থত, একজন ব্যক্তি যদিও সুন্নাহ্‌র গুরুত্ব উপলব্ধি করেন এবং যদিওবা তার ভিতর পূর্বোল্লিখিত সংশয় না থেকে থাকে, তবুও তার মাঝে রাসূলের (সা.) সুন্নাহ্ সম্বন্ধে ছোটখাট ভুল বোঝাবুঝি থাকতে পারে।

অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায়, যারা সুন্নাহ্‌র অনুসরণে বিশ্বাসী, তাদের মাঝেও এমন কিছু ইস্যু বা প্রশ্ন থাকে, যে সম্বন্ধে তাদের ধারণা স্পষ্ট নয়। মতামতের যে বিচিত্র ধরন শুনতে ও দেখতে পাওয়া যায়, তা থেকেই বোঝা যায় যে, এসবের বশবর্তী হয়ে মানুষ কিভাবে বিভ্রান্ত হতে পারে। সুতরাং, আমাদের এ প্রচেষ্টা হয়তো কখনো কারো সেই বিভ্রান্তিগুলো দূর করতে পারে এবং সেজন্য হয়তো কোন ব্যক্তি দ্বীনের সঠিক ও সত্য উপলব্ধি সহকারে আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে সক্ষম হবেন।

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়
'সুন্নাহ্' ও 'হাদীস' –এই শব্দ গুলির অর্থ

প্রথমেই যে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত তা হচ্ছে, 'সুন্নাহ' ও 'হাদীস' এই শব্দগুলির সংজ্ঞা পরিস্কার ভাবে নির্ধারণ করা । ব্যাপারটা নির্দিষ্টভাবে 'সুন্নাহ্' শব্দের বেলায় বেশী গুরুত্বপূর্ণ । **আসলে সুন্নাহ্ শব্দটির ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োগই হচ্ছে 'সুন্নাহ্' ও এর গুরুত্বসম্বন্ধে বিভ্রান্তির এক প্রধান উৎস** । বিভিন্ন বিষয়ের স্কলাররা সুন্নাহ্ শব্দটিকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে এসেছেন । দ্বীনী জ্ঞানের প্রতিটি শাখা, তার প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী সবচেয়ে প্রযোজ্য উপায়ে শব্দটির সংজ্ঞা দিয়েছে এবং সেটিকে ব্যবহার করেছে। আর সেজন্যই সার্বিকভাবে ইসলামে সুন্নাহ্র অবস্থান সম্পর্কিত যে কারো ধারণা বেশ করুণ একটা পরিণতি লাভ করতে পারে, যদি কেউ সুন্নাহ্ সম্বন্ধে ভাবতে গিয়ে, এই দিকটাকে ধর্তব্যে না আনে ।

সুন্নাহ্ শব্দের অর্থসমূহ

যখন **সবচেয়ে সাধারণভাবে**, সাদামাটা **অর্থে সুন্নাহ শব্দটি ব্যবহৃত হয়**, তখন বুঝতে হবে যে, এ দ্বারা রাসূল (সা.)-এঁর **সার্বিক শিক্ষা ও জীবনের ধরনকে বোঝানো হচ্ছে** । কিন্তু সঠিক ভাবে বলতে গেলে, বলতে হবে যে, বিভিন্ন শ্রেণীর স্কলাররা বেশ ভিন্ন রকমের ধারণা দিতে শব্দটি ব্যবহার করেন। এটা এজন্য যে, জ্ঞানের বিভিন্ন শাখাগুলোর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ ভিন্ন । সাধারণভাবে যখন ব্যবহার হয়ে থাকে, তখন শব্দটির যে অর্থ - আর আক্বীদাহ, ফিকহ, উসূল ফিকহ্ ও হাদীসের স্কলাররা যখন বিশেষ অর্থে শব্দটি ব্যবহার করে

www.pathagar.com

থাকেন, তখন তার যে অর্থ দাঁড়ায় – যে কাউকে সুনির্দিষ্ট ভাবে এ দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে।

'সুন্নাহ্‌র' আভিধানিক অর্থ

'সুন্নাহ' শব্দটির (যার বহুবচন হচ্ছে সুনান) **আভিধানিক সংজ্ঞা** দিতে গিয়ে লেন [E.W.Lane] বলেন, **"কাজকর্মের বা আচরণের বা জীবনের একটা পথ, রাস্তা, নিয়ম বা রীতি, ভাল বা খারাপ যাই হোক, অনুমোদিত অথবা অননুমোদিত যাই হোক ... একটা পদ্ধতি যা পূর্ববর্তী প্রজন্মের লোকদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বা তারা যা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে এবং পরবর্তী প্রজন্মের লোকেরা যা করার চেষ্টা করেছে।"** [৫]

Lane যেমনটা দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, ব্যাপারটা একটা প্রশংসনীয় জীবনযাত্রা হতে পারে, আবার নিন্দনীয় জীবনযাত্রাও হতে পারে। আভিধানিকভাবে 'সুন্নাহ' শব্দটা এই দুটোর যে কোন একটা বোঝাতে ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু সাধারণ অভিব্যক্তিতে শব্দটিকে এক প্রশংসনীয় জীবনযাত্রা বোঝাতেই ব্যবহার করা হয়, আর তাই, যদি কখনো নেতিবাচক ভাবে ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়, তবে পটভূমি ব্যাখ্যা করে বা অতিরিক্ত বিশেষণ ব্যবহার করে ব্যাপারটা পরিস্কার করে দেওয়া হয়।

রাসূল (সা.)-এঁর বক্তব্যে শব্দটির আভিধানিক ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। আসলে নিম্নলিখিত হাদীসটিতে 'সুন্নাহ' শব্দটি তার আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে:

---

[৫] দেখুন: Page#1438, Vol.1, *Arabic-English Lexicon* - E.W. Lane (Cambridge, England: Islamic Text Society, 1984)

www.pathagar.com

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহর বর্ণনায় এসেছেঃ বেদুইনদের একটা দল আল্লাহর রাসূলের (সা.) কাছে এসে হাজির হয় যারা ছিল পশমী বস্ত্র পরিহিত। রাসূল (সা.) তাদের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা ও তারা যে অভাবতাড়িত সে ব্যাপারটা খেয়াল করলেন। তিনি তখন লোকজনকে দান খয়রাত করার তাগিদ দিলেন, কিন্তু তাঁর চেহারায় রাগের চিহ্ন দেখার পূর্ব পর্যন্ত তারা বেশ গড়িমসি করছিল। তারপর আনসারদের একজন একপাত্র রূপা নিয়ে এসে হাজির হলেন। তারপর আরেকজন আসলেন। তাদের দেখাদেখি অন্যরাও [দান সামগ্রী নিয়ে} আসলেন, তখন রাসূল (সা.)-এঁর চেহারায় সন্তুষ্টি ফুটে উঠল। আল্লাহর রাসূল (সা.) তখন বললেন , ***“যে কেউ ইসলামে কোন ভাল প্রথা (সুন্নাহ্) প্রচলিত করবে, তারপরে যার উপর অন্যেরা আমল করবে, তখন তার নামে পরবর্তী আমলকারীর মতই একটি নেকি লিপিবদ্ধ হবে – তাদের যে কারো অর্জিত নেকির কোন কমতি হওয়া ছাড়াই। আর যে কেউ যদি ইসলামে কোন মন্দ প্রথার (সুন্নাহ্) প্রচলন করে এবং তারপর যদি লোকেরা সেটার উপর আমল করে, তবে তার নামেও আমলকারীর সমান পরিমাণ গুনাহ লিপিবদ্ধ হবে – তাদের দুজনের কৃত-কর্মের গুনাহের কোন কমতি ছাড়াই ।’ ”*** (সহীহ্ মুসলিম)

বিভিন্ন শ্রেণীর স্কলাররা সুন্নাহর যে সব সংজ্ঞা দিয়েছেন, সে আলোচনায় যাবার আগে এ বিষয়টা খেয়াল করা উচিত যে, কুর’আনে ‘সুন্নাত আল্লাহ’ বা আল্লাহর নিয়ম সম্বন্ধে বলা হয়েছে । আল্লাহ বলেন:

“ইতিপূর্বে যারা অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে এটাই ছিল আল্লাহ্র রীতি (বা নিয়ম), আর তুমি আল্লাহ্র রীতিতে (নিয়মে) কখনই কোন পরিবর্তন পাবে না। ”(সূরা আল-আহযাব, ৩৩:৬২; সূরা আল-ফাত্হ, ৪৮:২৩; সূরা আল-ইসরা, ১৭:৭৭)

www.pathagar.com

'আল্লাহর সুন্নাহ' বলতে এখানে তাঁর সিদ্ধান্ত, আইন, আদেশসমূহ এবং তাঁর নির্ধারণসমূহ বোঝানো হয়েছে যেগুলো বদলায় না এবং যেগুলো সব সময় সকল জনগোষ্ঠীর উপর প্রযোজ্য – যেমন পূর্ববর্তী ঐ সমস্ত জনগণকে ধ্বংস করার সুন্নাহ, যারা কিনা অনবরত আল্লাহর ওহী অনুযায়ী জীবন যাপন করতে অস্বীকার করেছিল।

বিভিন্ন শাখা প্রশাখা ব্যতিরেকে, যে অর্থে সবাই সুন্নাহ শব্দটির ব্যবহার করে থাকেন, সেটা হচ্ছে কুর'আনের পাশাপাশি শব্দটি যখন উল্লেখ করা হয়, অর্থাৎ যখন কেউ বলেন **'কুর'আন ও সুন্নাহ'** অথবা "আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ' । এই অর্থে যখন "সুন্নাহ" শব্দটি ব্যবহার করা হয়, তখন আমরা বুঝি যে, এই শব্দ দ্বারা রাসূল (সা.)-এঁর মাধ্যমে প্রাপ্ত দিকনির্দেশনাকে বোঝানো হচ্ছে, যা কুর'আনের মাধ্যমে প্রাপ্ত দিকনির্দেশনার অতিরিক্ত।

ফিক্হ্ শাস্ত্রবিদদের বা ফকীহদের ব্যবহারে 'সুন্নাহর' সংজ্ঞা

এখানে আমরা দ্বীনী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় প্রাপ্ত সুন্নাহ্র যত সংজ্ঞার কথা আলোচনা করবো, তার মাঝে ফিক্হ শাস্ত্রবিদরা যে অর্থে 'সুন্নাহ' শব্দটিকে ব্যবহার করে থাকেন, সেটাই আভিধানিক অর্থে 'সুন্নাহ' শব্দটির সবচেয়ে নিকটবর্তী। তবে 'সুন্নাহ' শব্দটির এই ব্যবহার অর্থাৎ - **'প্রশংসনীয় এক কর্মপদ্ধতি'** - এই অর্থে এর ব্যবহার, আসলে বিভ্রান্তির এক উৎসে পরিণত হয়েছে।

[ইসলামিক আইনের একটা উৎস হিসাবেও ফিক্হ শাস্ত্রবিদরা 'সুন্নাহ' শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন। এরকমটা যখন করা হয়, তখন আসলে উসূলীরা যে অর্থে শব্দটি ব্যবহার করেন, তাদের কাছ থেকে সে অর্থটা তখন ধার নেয়া হয়। আমরা এই পর্যায়ে কেবল ফিক্হ শাস্ত্রবিদদের

www.pathagar.com

বা ফক্বীহ্দের নিজস্ব জগতে সুন্নাহ শব্দটির যে সংজ্ঞা রয়েছে, সেটা নিয়ে আলাপ করবো ইনশা'আল্লাহ্।]

বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ফিক্হ শাস্ত্রবিদরা কোন একটা সুনির্দিষ্ট কাজের ফতোয়া নিয়ে গবেষণা করে থাকেন। সাধারণ ভাবে যে কোন কাজকে নিম্নলিখিত পাঁচটি শ্রেণীর একটিতে ফেলা হয়ঃ অবশ্যকরণীয়, পছন্দনীয়, অনুমোদিত, অপছন্দনীয় ও নিষিদ্ধ। এছাড়াও যে কোন কাজ শুদ্ধ ও সিদ্ধ অথবা পরিত্যাজ্য ও অকার্যকর হতে পারে ।

পছন্দনীয় কাজ বোঝাতে স্কলাররা অগণিত শব্দ ব্যবহার করে থাকেন। সে সব শব্দের মাঝে "মানদুব" ও "মুস্তাহাব" এর মত শব্দগুলো রয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিটি শব্দের সামান্য ভিন্ন অর্থ রয়েছে। তবে নিঃসন্দেহে "প্রশংসনীয় শ্রেণীর কর্মকান্ড" বোঝাতে সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত অভিব্যক্তির একটি হচ্ছে 'সুন্নাহ'। সুতরাং,উদাহরণস্বরূপ ফকীহ্রা বলবেন যে, ফজরের ফরজ সালাতের আগে দুই রাকাত সালাত হচ্ছে 'সুন্নাহ'! এর অর্থ হচ্ছে এই যে, ***"ঐ দুই রাকাত সালাত ফরজ বা অবশ্যকরণীয় নয়। তথাপি তাদের মর্যাদা বা পুরস্কার এমন এক পর্যায়ের যে, তা তাদেরকে নিছক অনুমোদিত কাজের চেয়ে অধিকতর মর্যাদাসম্পন্ন অবস্থান দেয়।"***

সাধারণ ভাবে ফিক্হশাস্ত্রবিদরা এ সমস্ত কর্মকান্ড - যেগুলোকে তারা 'পছন্দনীয় ' বা 'সুন্নাহ' বলে অভিহিত করে থাকেন, সেগুলোকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করে থাকেন, যেমনঃ

১) সুন্নাহ হচ্ছে এমন একটি কাজ, যা সম্পাদন করাটা আইন দ্বারা উৎসাহিত করা হয়; তবুও আইন সেগুলোকে অবশ্যকরণীয় বা প্রয়োজনীয় বলে ঘোষণা করে না।

www.pathagar.com

২) একটা 'সুন্নাহ' কাজ হচ্ছে এমন একটা কাজ, যা সম্পাদন করলে কোন ব্যক্তি পুরস্কৃত হবে, কিন্তু যা করতে ব্যর্থ হলে সে শাস্তি পাবে না -অথবা- অন্য কথায় বলতে গেলে, সে যদি কাজটা না করে, সেজন্য তাকে দোষারোপ বা নিন্দা করা যাবে না। উত্তর আফ্রিকার মালিকী ও হাম্বালীদের মাঝে এটা হচ্ছে, সুন্নাহর একটা বহুল প্রচলিত সংজ্ঞা ।

৩) 'সুন্নাহ' কাজ হচ্ছে এমন একটা কাজ, যা সম্পাদন করতে কাউকে অনুরোধ করা হয়, কিন্তু জোর দিয়ে বলা হয় না – পূর্বাঞ্চলীয় (উত্তর আফ্রিকা ছাড়া বাকী অঞ্চলের) মালিকী এবং শাফি'ঈদের মাঝে সুন্নাহর এই সংজ্ঞা প্রচলিত ।

৪) একটা সুন্নাহ কাজ হচ্ছে এমন একটা কাজ, যা রাসূল (সা.) লাগাতার ভাবে সম্পাদন করেছেন যদিও কখনো কখনো তিনি দৃশ্যত কোন কারণ ছাড়াই সেগুলো করা থেকে বিরত থেকেছেন। হানাফীরা এই সংজ্ঞাটি দিয়ে থাকেন। [হানাফীরা অবশ্য এই শ্রেণীর সুন্নাহকে "সুন্নাতে গায়ের মুয়াক্কাদা" বলে থাকেন ।]

এই ধরনের সংজ্ঞাগুলোতে মনে হয় ফিক্হশাস্ত্রবিদরা সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত আইনী সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তবে একটা সাধারণ ধারণা দিতে কাউকে হয়তো আইনী সংজ্ঞার কড়াকড়ির গন্ডি ছাড়িয়ে যেতে হতে পারে। সম্ভবত "পছন্দনীয়" কর্মকান্ডগুলিকে এমন সব কর্মকান্ড বলে বর্ণনা করা উচিত, যেগুলো সমাধা করলে কেউ একজন পরিপূর্ণ মুসলিম হবে এবং যে কেউ যদি তার ইসলামকে ও ঈমানকে সম্পূর্ণ করতে চায়, তবে ঐ কাজগুলোকে বেশী বেশী সমাধা করবে – সেগুলোকে ফরজ কাজের মর্যাদা দান না করেই। উপরন্তু এটা কখনোই ভুললে চলবে না যে, 'সুন্নাহ' কাজগুলো নিশ্চিতই আল্লাহর কাছে প্রিয় এবং সেগুলো আল্লাহর নিকটবর্তী হবার একটা উপায়।

www.pathagar.com

ঐ সমস্ত কাজ যেগুলোকে কেবল পছন্দনীয় বা 'সুন্নাহ' বলে মনে করা হয়, সেগুলোর ব্যাপারে আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা উচিত। **যুমাইরিয়া** বলেন :

"ফিক্‌হশাস্ত্রবিদদের ব্যবহারে 'সুন্নাহ' বলে যা কিছুকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে সেগুলোর ব্যাপারে কেউ কেউ ঢিলেঢালা মনোভাব পোষণ করেন । তাদের ঢিলেঢালা মনোভাব এই দাবীর উপর প্রতিষ্ঠিত যে, 'সুন্নাহ' কাজ হচ্ছে সে সব কাজগুলো যেগুলো করার জন্য কেউ পুরস্কৃত হবে অথচ না করার জন্য কেউ শাস্তি লাভ করবে না। একই সময়ে স্কলাররা এমন বহু হাদীস যেগুলো যে কাউকে সুন্নাহর অনুসরণ করতে ও সেগুলোর সাথে লেগে থাকতে উৎসাহিত করে, সেগুলোর উপর ভিত্তি করে বলেছেন যে, কেউ যদি প্রথাগত ও ঢালাওভাবে সুন্নাহর কর্মকাণ্ডগুলি পরিত্যাগ করে, তবে সে সেজন্য শাস্তি প্রাপ্ত হবে। সাহাবীগণ আগ্রহভরে ঐ সমস্ত কাজ সমাধা করতেন, যেমন ভাবে তারা অবশ্যকরণীয় কাজগুলো করতেন।[৬] *আল-লাখনোয়ী তার "তুহফা আল আখইয়ার" বইতে এ ব্যাপারে বেশ কিছু উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ফিক্‌হশাস্ত্রবিদরা যে অবশ্যকরণীয় ও সুন্নাহ্‌র ভিতর পাথর্ক্য করে থাকেন সেটা সুনির্দিষ্ট ঘটনার বেলায় প্রযোজ্য, কিন্তু সুন্নাহর কর্মকাণ্ডকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করার বেলায় প্রযোজ্য নয়।"*[৭]

---

[৬] **"সাহাবীগণ আগ্রহভরে ঐ সমস্ত (পছন্দনীয় অর্থে সুন্নাহ্‌) কাজ সমাধা করতেন, যেমন ভাবে তারা অবশ্যকরণীয় কাজগুলো করতেন"** - কথাগুলো এভাবে বললে একটু বাড়িয়ে বলা হবে। কারণ, একটা পছন্দনীয় কাজকে অবশ্যকরণীয়ের মত করে দেখা এবং নিজের ও অন্যের জন্য সেটাকে সেরকম করে দেখার ব্যাপারে জেদ ধরাটা নিজেই তখন একটা বিদ'আত হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং উদ্ধৃতির কথাগুলো থেকে আমাদের যা বুঝতে হবে, তা হচ্ছে এরকম যে, সাহাবীগণ পছন্দনীয় পর্যায়ের (বা recommended) সুন্নাহ্‌ কাজগুলো করাটা খুবই পছন্দ করতেন এবং তা ছেড়ে দিতে চাইতেন না - যদিও তারা জানতেন যে, **ওগুলো অবশ্যকরণীয় নয়।**

[৭] দেখুন: Page#93, *Madkhal li-Diraasah al-Aqeedah al-Islamiyyah* - Uthmaan ibn Jumuah Dhumairiyyah.

www.pathagar.com

ফিক্‌হশাস্ত্রবিদদের মাঝে সুন্নাহর আরেকটি প্রচলিত ব্যবহার হচ্ছে নব্য প্রথা বা বিদ'আতের বিপরীতে সুন্নাহকে উল্লেখ করা। এই অর্থে সুন্নাহ বলতে এমন যে কোন কিছু বোঝানো যেতে পারে যা শরীয়াহ দ্বারা অনুমোদিত, সেক্ষেত্রে যা কিছু কুর'আন, রাসূল (সা.)-এঁর কর্মকান্ড অথবা এমনকি সাহাবীদের সামষ্টিক কর্মকাণ্ড থেকে গৃহীত, এই সব কিছুই সুন্নাহর ভিতর অন্তর্ভুক্ত হবে। উদাহরণস্বরূপ ফিক্‌হশাস্ত্রবিদরা একটা বিবাহ - বিচ্ছেদকে তালাক আস-সুন্নাহ্ বলে অভিহিত করতে পারেন, যার অর্থ দাঁড়াবে সুন্নাহ্ মোতাবেক বিবাহ্-বিচ্ছেদ ঘটেছে, যার বিপরীতে যেটা সম্পূর্ণরূপে সুন্নাহ্ মোতাবেক হয়নি, সেটাকে তারা তালাক আল-বিদ'আহ্ বলে অভিহিত করবেন। কখনো কখনো একটা কাজ সম্পূর্ণরূপে সুন্নাহ মোতাবেক করা না হয়ে থাকলেও সেটা আইনত সিদ্ধ বলে বিবেচিত হয়, কিন্তু সেই কাজ করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সঠিক পন্থা অবলম্বন না করে একটা ভুল করেছে বলেই বিবেচিত হবে। আর সেজন্য তারা দুই ধরনের কাজের ভিতর পার্থক্য করে থাকেন।

হাদীসের স্কলাররা সুন্নাহ শব্দটির যে সংজ্ঞা দিয়ে থাকেন

হাদীসের স্কলারদের পাঠ্যসূচী বা গবেষণার বিষয় হচ্ছে, রাসূল (সা.) সম্বন্ধে যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে, তার সবকিছু। তারা ঐ ধরনের তথ্যের সবকিছু সংগ্রহ করতে চান, যাতে তারা নির্ধারণ করতে পারেন যে, সেগুলোর কোনটি শুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য এবং সেগুলোকে যেন অনির্ভরযোগ্য ও অগ্রহণযোগ্য সূত্র থেকে যা কিছু এসেছে, সেগুলো থেকে পৃথক করে দেখা যায়। সুতরাং, প্রাথমিকভাবে তারা এমন যে কোন কিছুর উপরই মনোনিবেশ করেন, যা রাসূল(সা.) সম্বন্ধে বলা হয় বা তাঁর কাছ থেকে এসেছে বলে বলা হয়। একজন কল্পনা করতে পারে – এমন সকল তথ্যই রাসূল (সা.)-এঁর ব্যাপারে প্রজন্ম থেকে

www.pathagar.com

প্রজন্মে হস্তান্তরিত ও লিপিবদ্ধ হয়ে এসেছে, মানবজাতির ইতিহাসে যার আর কোন নজির নেই ।

হাদীসের স্কলারদের বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য দ্বারা 'সুন্নাহ' শব্দটি তাদের পরিভাষায় যে ভাবে সংজ্ঞায়িত হয় তা প্রভাবান্বিত হয়েছে। বাস্তবে তারা যেভাবে 'সুন্নাহ' শব্দটি সংজ্ঞায়িত করেন, সেটা হচ্ছে সব কয়টি সংজ্ঞার মধ্যে সবচেয়ে ব্যাপক অর্থবহ – রাসূল (সা.) সম্পর্কে যা কিছু আমাদের কাছে এসেছে, তার সব কিছুই যার অন্তর্ভুক্ত। হাদীস শাস্ত্রের আলেমদের সংজ্ঞাকে সাধারণভাবে নিম্নলিখিত রূপে প্রকাশ করা যায়: *"রাসূল(সা.)-এঁর কাছ থেকে তাঁর বক্তব্য, কার্যকলাপ, অনুমোদন, শারীরিক বৈশিষ্ট্য অথবা জীবনবৃত্তান্ত সংক্রান্ত যা কিছু আমাদের কাছে এসেছে – তা নবুওয়্যত প্রাপ্তির আগের বা পরের ব্যাপার যাই হোক না কেন – তার সবকিছুই সুন্নাহ।"*[৮]

এই সংজ্ঞাকে প্রস্ফুটিত করতে উপরে উল্লিখিত প্রত্যেক শ্রেণীর তথ্যের উদাহরণ দেয়া প্রয়োজন: তাঁর বক্তব্যের একটা উদাহরণ হচেছ উমর (রা.) থেকে বর্ণিত নিম্নলিখিত হাদীসটি যেখানে রাসূল(সা.) বলেন ***"নিশ্চয়ই সকল কর্ম নিয়ত দ্বারা পরিচালিত এবং নিশ্চয়ই প্রতিটি মানুষ তাই পাবে, যা সে নিয়ত করেছিল। এভাবে, যে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের (সা.) জন্য হিজরত করেছিল, তার হিজরত ছিল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা.) জন্য; এবং যার হিজরত কোন জাগতিক লাভের জন্য অথবা কোন নারীকে বিবাহের জন্য ছিল, তার হিজরত হবে যে জন্য সে হিজরত করেছিল সেজন্য।"*** (বুখারী ,মুসলিম)

তাঁর কার্যকলাপের একটা উদাহরণ হচেছ আয়েশা (রা.) এর নিম্নলিখিত বর্ণনা: ***"যখন তিনি ফজরের দুই রাকাত নফল (সুন্নাত) সালাত নিজ গৃহে সম্পাদন করতেন, তারপর তিনি তাঁর ডান কাতে [কিছুক্ষণ] শুয়ে থাকতেন ।"*** (তিরমিজী, আলবানীর মতে সহীহ)

---

[৮] দেখুন: Page#15, *Al-Sunnah: Hujiyyatuhaa wa Makaanatuha fi-l-Islam wa al-Radd ala Munkireehaa* - Muhammad Luqman Al-Salafi.

www.pathagar.com

তাঁর নীরব সম্মতি বা অনুমোদনের উদাহরণ পাওয়া যাবে সহীহ মুসলিমের বর্ণিত হাদীসে যেখানে রাসূল (সা.) মাগরিবের সালাতের পূর্বে কখনো দুই রাকাত সালাত আদায় করেছিলেন কিনা – এই ব্যাপারে আনাস (রা.)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি [আনাস (রা.)] জবাব দেন *"তিনি আমাদের সালাত আদায় করতে দেখতেন, কিন্তু যেমন কখনো আমাদের তা করতে আদেশ করেননি, তেমনি আমাদের নিষেধও করেননি।"*

তাঁর আচরণবিধির একটি উদাহরণ হচ্ছে নিম্নলিখিত বর্ণনাটি: *"রাসূল (সা.) নিজ গৃহে অন্তরীণ কুমারী মেয়েদের চেয়েও বেশী লজ্জাশীল ছিলেন। তিনি যদি এমন কিছু দেখতেন যা তিনি পছন্দ করতেন না, তাহলে আমরা তা তাঁর চেহারায় ফুটে উঠা অভিব্যক্তি থেকে সনাক্ত করতে পারতাম।"* (বুখারী ও মুসলিম)

তাঁর শারীরিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অনেক বর্ণনা রয়েছে, তাঁর উচ্চতা ও চেহারা সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ উমর (রা.) বর্ণনা করেন যে, *রাসূল (সা.)-এঁর আনুমানিক {মাত্র} বিশটি পাকা চুল ছিল* (তিরমিজী, আলবানীর মতে সহীহ) আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে জাবির ইবনে সামুরার বর্ণনা – সেখানে বলা হয়েছে যে, *রাসূল (সা.)-এঁর চাপদাড়ি [মুখভর্তি] ছিল।* (মুসলিম)।

তাঁর জীবনবৃত্তান্ত সংক্রান্ত বর্ণনার মধ্যে রয়েছে, যখন তিনি খাদিজা (রা.)-কে বিবাহ করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল পঁচিশ বৎসর, তখন তাঁরা মক্কায় বসবাস করতেন এবং এটা ছিল তাঁর ওহী প্রাপ্তির পূর্বের ঘটনা। এই শ্রেণীর তথ্যের ভিতরে এই বর্ণনাও অন্তর্ভুক্ত যে, ওহী প্রাপ্তির পরে তিনি তের বছর মক্কায় অবস্থান করেন এবং তারপর মদীনায় হিজরত করেন।

আবারও উপরে উল্লিখিত সকল বর্ণনাগুলোই হাদীসের বিশেষজ্ঞরা 'সুন্নাহ' শব্দটি নিয়ে যা বোঝাতে চান, তার আওতাভুক্ত হবে; যদিও

www.pathagar.com

এর কিছু কিছু বিষয়ের সাথে ইসলামী আইনের কোন সম্পর্ক নাও থাকতে পারে। অথচ হাদীস-শাস্ত্র-বিশারদদের জন্য সেগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা ঐ সব স্কলাররা রাসূল (সা.)-এঁর কাছ থেকে বর্ণিত অথবা তাঁর সম্বন্ধে বর্ণিত সকল বিষয়েই আগ্রহী।

ইসলামের আইন তত্ত্বে 'সুন্নাহ' শব্দটির সংজ্ঞা

যারা ইসলামী আইনতত্ত্বের বিশেষজ্ঞ বা আইনতত্ত্ববিদ [আরবী: **উসূলী**], তাদের একটা লক্ষ্য হচ্ছে, কোন জিনিসটা শরীয়াহ আইনের একটা সূত্র বা ভিত্তি এবং কোন জিনিসটা তা নয় – সেটা নির্ধারণ করা। একজন **উসূলী** আসলে ঠিক সত্যিকার আইনটি নিয়ে ভাবিত নন। কিন্তু আইনের উৎসসমূহ ও পদ্ধতিসমূহ হচ্ছে উসূলীদের গবেষণার বিষয়। সুতরাং তাঁরা যখন "সুন্নাহ" শব্দটির সংজ্ঞা দেন, তখন তাঁরা এই দৃষ্টিকোণ থেকে তা দিয়ে থাকেন। তাই, যখন এমন একটা তথ্য পাওয়া যায় যে, রাসূল (সা.) সম্পর্কে কোন কিছু বর্ণিত হয়েছে বা তাঁর কাছ থেকে কোন বর্ণনা এসেছে, তখন তাঁরা চেষ্টা করেন এসব বর্ণনার কোনগুলো অথরিটি বা দলিল হিসাবে গ্রহণযোগ্য এবং কোনগুলো মুসলিমদের জন্য অনুসরণযোগ্য উদাহরণ তা নির্ধারণ করতে; এবং যেসব তথ্য বা বর্ণনা এই শ্রেণীভুক্ত নয়, তা থেকে শুদ্ধ বর্ণনাগুলোকে পৃথক করে দেখাতে। তাঁদের সংজ্ঞা হাদীস বিশারদদের সংজ্ঞার চেয়ে নিশ্চিতভাবেই ভিন্ন হবে, কেননা তাঁদের সংজ্ঞার পরিসর হাদীস বিশেষজ্ঞদের পরিসরের চেয়ে অনেক ছোট।

ইসলামী আইনতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাপ্ত, "সুন্নাহ"র সবচেয়ে প্রচলিত সংজ্ঞা এরকম: **কুর'আন ছাড়া নবী (সা.)-এঁর কাছ থেকে কথা, কাজ বা নীরব অনুমোদন এসবের মাধ্যমে যা কিছু আমাদের কাছে এসেছে।** তাঁর কথার মাঝে তিনি যা আদেশ করেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন, অনুমোদন করেছেন, যা অনুমোদন করেন নি বা নিষেধ করেছেন তার সবই অন্তর্ভুক্ত। তাঁর কার্যকলাপকে ইসলামী আইনের একটা ভিত্তি বলে জ্ঞান করা হয়, কেননা মুসলিমদের আদেশ করা

হয়েছে তাঁকে এক অনুসরণযোগ্য উদাহরণ বলে গণ্য করার জন্য। তাঁর নীরব সম্মতিও ইসলামী আইনের একটা ভিত্তি, কেননা নিজ উপস্থিতিতে একটা খারাপ বা ভুল কিছু ঘটতে দেখে চুপ করে থাকাটা নবী (সা.)-এঁর জন্য সঠিক হতো না; তাই তাঁর নীরবতা তাঁর অনুমোদনের সাক্ষ্য দেয়, আর তাঁর অনুমোদনের নিহিতার্থ হচ্ছে এই যে, কাজটি শরীয়াহ অনুযায়ী শুদ্ধ।

এই সংজ্ঞায় উসূলীরা স্পষ্টতই কুর'আনকে বাদ দিয়ে গেছেন – কিন্তু হাদীস কুদসী সুন্নাহর এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। তাঁকে "নবী (সা.)" বলে সম্বোধন করে তাঁরা তাহলে নবুয়ত লাভের পূর্বে তিনি যা বলেছেন, করেছেন অথবা অনুমোদন করেছেন – সে সবকে বাদ দিয়ে থাকেন। ঐসব ব্যাপারগুলো ইসলামী আইনের কোন ভিত্তি বলে গৃহীত হয় না।

উপরের সংজ্ঞায় যদিও রাসূল (সা.)-এঁর কাজ বা কর্মকান্ডের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে ইসলামী আইনতত্ত্বের বিশেষজ্ঞরা অর্থাৎ উসূলীরা তা দ্বারা আসলে কেবল কিছু নির্বাচিত কাজ বা কর্মকান্ড বুঝিয়ে থাকেন। অর্থাৎ রাসূল (সা.)-এঁর এমন কিছু কর্মকান্ড রয়েছে, যেগুলো অন্যদের জন্য অনুসরণযোগ্য মনে করা হয় না। উদাহরণস্বরূপ এমন বর্ণনা রয়েছে যে, রাসূল (সা.)-এঁর ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁর সামান্য নাক ডাকত। এখানে লক্ষ্য করুন যে, হাদীসের স্কলাররা সুন্নাহ শব্দটির যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, সেই অনুযায়ী এই বর্ণনাটিও সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত হতো। কিন্তু এই কাজটির যেহেতু কোন আইনী গুরুত্ব নেই – এই অর্থে যে কোন মুসলিমকে তা অনুসরণ করতে হবে না – তাই ইসলামী আইনে সুন্নাহর যে সংজ্ঞা এটা তার অন্তর্ভুক্ত হবে না। উপরন্তু এমন কিছু আইন ছিল, যা কেবল রাসূল (সা.) এঁর উপর প্রযোজ্য ছিল এবং মুসলিমদের জন্য যা অনুসরণীয় নয়। এই শ্রেণীর আইন বা অনুশাসনের একটি উদাহরণ হচ্ছে তাঁর বারজনের অধিক স্ত্রী গ্রহণের ব্যাপারটি। এটা কেবল রাসূল (সা.)-এঁর জন্য অনুমোদিত ছিল, কিন্তু তারপর আর কারো জন্যই নয়। হাদীস

www.pathagar.com

স্কলারদের সংজ্ঞা অনুযায়ী এ ব্যাপার 'সুন্নাহর' অন্তর্ভূক্ত হবে। কিন্তু সঠিকভাবে বলতে গেলে, ইসলামী আইনের সংজ্ঞা অনুযায়ী তা সুন্নাহ বলে পরিগণিত হবে না, কেননা ঐ কাজে রাসূল (সা.)-কে অনুসরণ করাটা কারো জন্য অনুমোদিত নয়।

"সুন্নাহ্" শব্দটি ব্যবহার করার বেলায় ফিক্‌হ্ শাস্ত্রবিদ এবং উসূলী দের মাঝে যে পার্থক্য দেখা যায়

জামাল জারাবযো তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে বলেন, **বিভিন্ন পটভূমিতে এবং বিভিন্ন বিভাগে 'সুন্নাহ' শব্দটি যেভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তার ভিতর পার্থক্য নির্ণয় করতে না পারাটা সুন্নাহর মর্যাদা নিয়ে দ্বিধা-সংশয়ের একটা প্রধান কারণ।** সুনির্দিষ্ট ভাবে ফিক্‌হশাস্ত্রবিদরা যেভাবে 'সুন্নাহ' শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন, তা থেকে অনেকেরই এমন ধারণা হয়েছে এবং যা অনেকে স্পষ্টই বলে থাকেন : ***"যা কিছু কুর'আন থেকে এসেছে, তা অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবে। আর কেউ যদি সুন্নাহ প্রয়োগ করে তবে তা ভাল, কিন্তু তা অবশ্যকরণীয় নয়।"*** কেউ কেউ এমন ধারণাও প্রকাশ করেছেন যে, কেবলমাত্র কুর'আনই কোন কিছুকে ফরজ বা অবশ্যকরণীয় বলে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, আর সুন্নাহ শুধুমাত্র কোন কিছুকে পছন্দনীয় বলে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। সে জন্য এই ভুল বোঝাবুঝি দূর করতে, কিছু উদাহরণ দেবার প্রয়োজন রয়েছে। প্রথম উদাহরণটা আমরা কুর'আনে আল্লাহর বাণী থেকে নেব :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ...

www.pathagar.com

"হে মু'মিনগণ ,তোমরা যখন একে অন্যের সাথে নির্ধারিত সময়ের জন্য কারবার কর তখন তা লিখে রেখো ...." (সূরা বাকারা, ২; ২৮২)

বেশির ভাগ স্কলারদের মতেই, এখানে যে লেনদেন লিখে রাখার কথা বলা হয়েছে তা পছন্দনীয় হিসাবে বলা হয়েছে , কিন্তু তা ফরজ বা অবশ্যকরণীয় হিসাবে নয়। তাই এ ধরনের একটা লেনদেন লিখে রাখার ব্যাপারটাকে ফিকহ্শাস্ত্রবিদরা একটা "সুন্নাহ" অর্থাৎ, "ফরজ নয় এমন পছন্দনীয় কাজ" বলে বিবেচনা করে থাকেন – যদিও এই কাজের উৎস হচ্ছে কুর'আন ।

আরেকটা উদাহরণ আসছে একই বাক্যের পরবর্তী অংশ থেকে যেখানে আল্লাহ বলেনঃ

وَأَشْهِدُوٓا۟ إِذَا تَبَايَعْتُمْ...

"তোমরা যখন পরস্পরের মধ্যে বেচাকেনা কর তখন সাক্ষী রাখ...." (সূরা বাকারা, ২:২৮৩)

কুর'আনের এই আদেশ এমন একটা কাজের আদেশ যা কিনা পছন্দনীয় কিন্তু ফরজ বা অবশ্যকরণীয় নয়। সুতরাং উল্লিখিত কাজের সূত্র যদিও বা কুর'আনের আয়াত, তবুও তার মানে এই নয় যে, কাজটি ফরজ বা অবশ্যকরণীয় ।

অপর পক্ষে কেউ চাইলে দাড়ি রাখার ব্যাপারটাকে একটা উদাহরণ হিসাবে নিতে পারে। কুর'আনে দাড়ি রাখা সংক্রান্ত কোন স্পষ্ট নির্দেশনা নেই, তবু তা সুন্নাহ বা রাসূল (সা.)-এঁর উক্তিসমূহের আওতায় আসে। যেমন রাসূল (সা.) বলেছেনঃ *"মোচ ছোট করে ছাঁট এবং দাড়ি রাখ (দাড়িকে ছেড়ে দাও) ।"*(বুখারী) । রাসূল(সা.)-এঁর এই উক্তি এবং আরো অনেক বক্তব্য থেকে বেশীর ভাগ স্কলারই দাড়ি রাখাকে ফরজ বা ওয়াজিব মনে করেন। এই ক্ষেত্রে যদিও কেউ দাড়ি

www.pathagar.com

রাখার কাজটিকে কেবল মাত্র "সুন্নাহ্" বা নবীর বক্তব্যের মাঝে দেখতে পান। কিন্তু ফিক্হশাস্ত্রবিদরা "সুন্নাহ্" শব্দটি যে অর্থে ব্যবহার করে থাকেন, ব্যাপারটা সেই পর্যায়ের নয় , বরং এই কাজটির ব্যাপারে বিধান হচ্ছে যে তা অবশ্যকরণীয় বা ফিকহ্শাস্ত্রবিদদের ভাষায় "ওয়াজিব"।

এ ধরনের আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে রমজান মাসের শেষে যে যাকাত {ফিতরা} দেওয়া হয়ে থাকে। বুখারী ও মুসলিমের নথিতে ইবন ওমরের (রা.) বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূল(সা.) রমজান মাসের শেষে যাকাত আল-ফিত্‌র আদায় করাটা মুসলিমদের জন্য অবশ্যকরণীয় করে দিয়েছেন। এই বর্ণনা এবং এরকম আরো অন্যান্য বর্ণনার ভিত্তিতে (স্কলারদের) ইজমা রয়েছে যে, যাকাত আল-ফিত্‌র ওয়াজিব। কুর'আনে যাকাত আল-ফিত্‌র সম্বন্ধে কোন কথাই নেই। অথচ এ ব্যাপারে (স্কলারদের) ইজমা হচ্ছে যে, এটা ওয়াজিব ।

সারকথা হচ্ছে , কোন একটা কাজ সম্বন্ধে আইনী অনুশাসনের ব্যাপারে ঐ কাজটির উৎস বা নথিপত্র প্রাসঙ্গিক নয় – তা সে কাজটা ফরজ বা ওয়াজিব হোক আর পছন্দনীয় (ফিকহ্শাস্ত্রবিদরা যেটাকে'সুন্নাহ্' বলে থাকেন) যাই হোক না কেন। কুর'আনের একটি আয়াত কোন কাজের বর্ণনা দিয়ে থাকতে পারে, তথাপি সে কাজটা কেবলমাত্র "সুন্নাহ্" বলে পরিগণিত হতে পারে। অপর পক্ষে রাসূল (সা.)-এঁর একটা কথা যা এমনিতে কেউ "সুন্নাহ" বলে অভিহিত করতে পারতো, তা থেকেও এটা নির্ধারিত হয়ে যেতে পারে যে কাজটা অবশ্যকরণীয় - অর্থাৎ ফরজ বা ওয়াজিব। এই প্রসঙ্গে প্রায় সবাই যে ভুলটা করে থাকেন, তার উৎস হচ্ছে এই বাস্তবতা যে, "সুন্নাহ্" শব্দটি এখানে দুই ধরনের নিহিতার্থ বা দুটো ভিন্ন শাখার নিজস্ব সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত।

www.pathagar.com

আক্বীদাহ্ বিশেষজ্ঞদের মতে "সুন্নাহ্" শব্দটির সংজ্ঞা

হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর প্রাক্কালে আক্বীদাহ্র (বিশ্বাস ও ঈমান বিষয়ক) বিশেষজ্ঞরা "সুন্নাহ" শব্দটিকে ঈমানের ভিত্তি বা বিষয়াবলী, সুপ্রতিষ্ঠিত বা অবশ্যকরণীয় কাজ, যে সমস্ত বিষয়ে বিশ্বাস আনতে হবে সেসব এবং ইসলামের সুনির্দিষ্ট বিধান ইত্যাদি বোঝাতে ব্যবহার করতে শুরু করেন। এই অভিব্যক্তি, অর্থাৎ "সুন্নাহর" এই ব্যবহার ইসলামের ভিতর উপদলের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পেতে শুরু করলো, ততই জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকলো। কোন কোন স্কলার নতুন নতুন উৎপথগামী উপদলগুলোর ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে ঈমানের বিষয়গুলোকে পৃথক করে দেখাতে এবং সেগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করতে "সুন্নাহ" শব্দটিকে ব্যবহার করতেন। **ইবন রজব** বলেন: *"পরবর্তী সময়ের অনেক স্কলারই (প্রথম দুই তিন প্রজন্মের পরবর্তী সময়ের), নির্দিষ্ট ভাবে, যা কিছু (সঠিক) বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত তা বোঝাতে 'সুন্নাহ' শব্দটি ব্যবহার করতেন। কেননা সেটাই হচ্ছে দ্বীনের ভিত্তি এবং কেউ যখন সেটার বিরোধিতা করে, তখন সে একটা বিপজ্জনক অবস্থানে রয়েছে।"*

কেউ কেউ 'সুন্নাহ' শব্দটিকে খুব সমন্বিত অর্থবহ একটা উপায়ে ব্যবহার করেছেন যেন ঈমানের সকল আবশ্যক উপাদানগুলো এর মাঝে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় – এই ব্যবহারটা গ্রহণযোগ্য, কেননা যা কিছু ঈমানের উপাদান বা যা কিছু দিয়ে ঈমান গঠিত তার সবকিছুই রাসূল (সা.) নিজে বিশ্বাস করেছেন, অনুশীলন করেছেন অথবা প্রচার করেছেন । উদাহরণস্বরূপ কেউ কেউ এভাবে সুন্নাহর সংজ্ঞা দিয়ে থাকেন: ***"রাসূল (সা.) এবং তাঁর সাহাবীগণ যে হেদায়েতের উপর***

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠিত ছিলেন (তার সবকিছুই জ্ঞান, বিশ্বাস, উক্তি বা বক্তব্য এবং কার্যকলাপ) ।[৮]

এই সংজ্ঞা অনুযায়ী সাহাবীদের আমল ও বিশ্বাস সুন্নাহর অংশ বলে গণ্য করা হয়, কেননা নবী (সা.) তাঁদেরকে যে পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছিলেন, তাঁরা সেটাই অনুসরণ করতেন – এই ব্যাপারটা পরবর্তী প্রজন্মগুলোর কিছু মানুষের বৈশিষ্ট্যের চেয়ে আলাদা, যারা রাসূলের (সা.) পদ্ধতির বিরুদ্ধে গিয়ে তাদের নিজস্ব পদ্ধতিসমূহ উদ্ভাবন করেছিলেন ।

আক্বীদাহ্ বিশেজ্ঞদের জন্য কখনো কখনো "সুন্নাহ" শব্দটি উৎপথগামিতা বা বিদ'আতের বিপরীত হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । এরকম ক্ষেত্রে কেউ বলে যে, *"অমুক মানুষটি সুন্নাহর উপর রয়েছে (অথবা সুন্নাহ অনুসরণ করছে) ।"*

এর অর্থ দাঁড়ায় এরকম যে - বিশ্বাস, সাধারণভাবে পদ্ধতি ও আচরণের নিরিখে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটি রাসূল (সা.) যে পন্থা প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন এবং তাঁর সাহাবী ও তাঁদের অনুসারীদের জন্য রেখে গেছেন, সেটিই অনুসরণ করে চলেছেন । আবার একথাটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এভাবে যখন "সুন্নাহ" শব্দটি ব্যবহৃত হয়, তখন সাহাবীরা রাসূল (সা.)-এঁর কাছ থেকে যা সরাসরি শিখেছিলেন, তার ধারাবাহিকতা হিসাবে যে জীবনযাত্রা ও বিশ্বাস তাঁরা জীবনে ধারণ করেছিলেন, তার সবকিছুকেই বোঝায় [তার সবকিছুকেই অন্তর্ভুক্ত করে] । কোন ব্যক্তি যদি দ্বীনের উপলব্ধি ও অনুসরণের বেলায় সাহাবীদের পথ অনুসরণ

---

[৮] দেখুন: Page#13, *Mabaahith fi AqeedahAhl al-Sunnah wa al-Jamaahwa Muwaqif al-Harakaat al-Islaamiyyahal-Muaasirah Minha* -Nasir al-Aql. বেশীরভাগ ক্ষেত্রে এই সংজ্ঞাটা চালু হয়, সাহাবী ও তাবেয়ীদের সময়কাল পার হয়ে যাবার পরে । তবে, কোন কোন ক্ষেত্রে আগের প্রজন্মের কাউকে কাউকে এই অর্থেও "সুন্নাহ্" শব্দটা ব্যবহার করতে দেখা যায়! যেমন, ইবন উমর (রা.) এমন বলেছেন বলে উদ্ধৃতি পাওয়া যায়: **"যে কেউ, যে সুন্নাহ্ ত্যাগ করে, সে ধর্মদ্রোহিতা করলো!"**

www.pathagar.com

করতে অস্বীকার করে, তবে সে কার্যত সুন্নাহ্ থেকেই মুখ ফিরিয়ে নিলো।

অপরপক্ষে যখন কেউ বলে যে **"অমুক বিদ'আতের উপর রয়েছে"** তখন বুঝতে হবে যে, তার এমন কিছু বিশ্বাস বা পদ্ধতি রয়েছে, যা ইসলামের শুদ্ধ শিক্ষার পরিপন্থী। যাঁরা রাসূল (সা.)-এঁর পথ অনুসরণ করেন তাঁরা আহলুস সুন্নাহ বা সুন্নাহ্র জনগোষ্ঠী বলে পরিচিত। ঐসব মানুষ যারা অগণিত ভিন্ন পথ অনুসরণ করে থাকেন, তাদের আহলুল বিদ'আহ বা উৎপথগামী জনগোষ্ঠী বলে অভিহিত করা হয়। সুতরাং, **"সুন্নাহ্" অর্থ হচ্ছে দ্বীনের সঠিক বিশ্বাস ও উপলব্ধি।**[১০] **আবু আল কাসিম আল আসবাহানী** বলেন, *"কেউ সুন্নাহ্র উপর রয়েছেন অথবা কেউ আহলুস সুন্নাহ বলতে বোঝায় যে, তিনি ওহীর মাধ্যমে যা এসেছে এবং (সাহাবী ও অন্যান্যদের কাছ থেকে) আমাদের কাছে যা হস্তান্তরিত হয়েছে, সেই সব কর্মকান্ড এবং বিশ্বাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছেন। এটা এজন্য যে, কেউ যখন আল্লাহর সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ এবং তাঁর রাসূলের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ অবস্থায় থাকেন, তখন সম্ভবত সুন্নাহ তিরোহিত হয়।"*[১১]

শাওয়াত উল্লেখ করেন যে, নিম্নলিখিত হাদীসটিতে "সুন্নাহ্" কথাটি এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে রাসূল (সা.) বলেন, ***"যে সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে আমার কেউ নয়।"***(বুখারী ও মুসলিম)

---

[১০] স্পষ্টতই, ইসলামে উৎপথগামী বিশ্বাস বা দলের উৎপত্তি হবার আগে এধরনের পার্থক্য করা হতো না। আরো নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে, উসমান (রা.) যখন নিহত হলেন, তারপর থেকে এই ধরনের পার্থক্য করা শুরু হলো - যখন মুসলিমরা বিভিন্ন দল বা ফিরক্বায় বিভক্ত হতে শুরু করলো।

[১১] দেখুন: Page#384-5, Vol.2, *Al-Hujjah fi Bayaan al-Muhijjah wa Sharh Aqeedah Ahl al-Sunnah* - Abu al-Qaasim Ismaaeel al-Asbahaani

www.pathagar.com

রাসূল (সা.) আরো বলেন: *"নিশ্চিতই তোমাদের ভিতর যারা বেঁচে থাকবে তারা অনেক বিভেদ দেখবে, সুতরাং আমার সুন্নাহ এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহর সাথে লেগে থেকো, তোমরা সেটাকে দাঁত দিয়ে কামড়ে থেকো । এবং নতুনভাবে উদ্ভাবিত বিষয়সমূহ এড়িয়ে চলো। নিশ্চিতই প্রতিটি উদ্ভাবনই হচ্ছে পথভ্রষ্টতা।"* (আহমাদ ,দাউদ, তিরমিযী ,হিব্বান, আবি আমিন,আল বাইহাকি, আল-হাকিম ইত্যাদিতে শব্দের সামান্য তারতম্য সহকারে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এ হাদীসটি সহীহ বলে গণ্য করা হয় ।)

ইসলামের প্রথম যুগের স্কলারদের অনেকের বক্তব্যেই সুন্নাহর এই অর্থটা ফুটে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ(রা.) বলেন, *"সুন্নাহর অনুশীলনে কারো মধ্যপন্থী হওয়াটা বিদআতের উপর চরম বিশ্বস্ত হওয়ার চেয়ে শ্রেয়।"*[১২] মুহাম্মদ ইবনে শিহাব আল যুহরী বলেন, *"আমাদের যেসব স্কলার গত হয়েছেন তাঁরা বলতেন, 'সুন্নাহর সাথে লেগে থাকা হচ্ছে নাজাত লাভ।'"*[১৩]

প্রথম যুগের স্কলারদের কেউ কেউ সুন্নাহর এই সংজ্ঞাকে আরো এক ধাপ সামনে নিয়ে যান এবং রাসূল (সা.) যেসব দিকনির্দেশনা নিয়ে আসেন এবং সাহাবীদের কাছে হস্তান্তর করেন এবং সাহাবীরা যা পর্যায়ক্রমে তাঁদের অনুসারীদের কাছে হস্তান্তর করেন – তা দ্বীনের মৌলিক ব্যাপারই হোক বা নির্দিষ্ট কোন বিষয় সংশ্লিষ্ট ব্যাপারেই হোক, তার সবকিছুর ব্যাপারেই তাঁরা 'সুন্নাহ' শব্দটি প্রয়োগ করতেন। 'সুন্নাহ' হচ্ছে সিরাতুল মুস্তাকিম বা সরল পথ – এর সাধারণ ব্যাপারগুলো এবং বিস্তারিত সকল খুঁটিনাটি সমেত। **বাস্তবে এভাবে যখন "সুন্নাহ" শব্দটি ব্যবহার করা হয় তখন তা ইসলামের সমার্থক হয়ে যায়।** **আল-আক্ল**-এর মতে ইসলামের প্রথম যুগের স্কলারদের অনেকের উদ্ধৃতিতেই "সুন্নাহর" এই অর্থটা ফুটে উঠে যেমন, আবু

[১২] দেখুন: Page#24, *Hujiyyat al-Sunnah* - Al-Hussain Shawaat

[১৩] দেখুন: Page#24, *Hujiyyat al-Sunnah* - Al-Hussain Shawaat

www.pathagar.com

বকর (রা.) থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়, *"সুন্নাহ হচ্ছে আল্লাহর সুদৃঢ় হাতল।"*[১৪]

হাদীস শব্দটির অর্থ

আভিধানিক ভাবে 'হাদীস 'শব্দটির অর্থ হচ্ছে :

নতুন , সাম্প্রতিক , নতুন ভাবে অস্তিত্বলাভকারী , প্রথম বারের মত , আগে যা ছিল না -তথ্য , একটা তথ্য বিশেষ, মেধা, ঘোষণা ...একটা জিনিস বা ব্যাপার , যা নিয়ে কথা বলা হয় , যা বলা হয় ,অথবা বর্ণনা করা হয় ...[১৫]

কুর'আন এবং হাদীস দুটোতেই, শব্দটি একটি ধর্মীয় যোগাযোগ, একটা সাধারণ কাহিনী, একটা ঐতিহাসিক কাহিনী, এবং একটা ঘটমান কাহিনী বা কথোপকথন বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।[১৬]

পারিভাষিকভাবে একটা হাদীস হচ্ছে মূলত রাসূল (সা.)-এঁর যে কোন বর্ণনা – তাঁর কথা, কাজ এবং নীরব সম্মতি, আচরণ, শারীরিক বৈশিষ্ট্য অথবা জীবনবৃত্তান্ত সংক্রান্ত যে কোন বর্ণনা। অন্য কথায় হাদীসের স্কলাররা যেভাবে সুন্নাহর সংজ্ঞা দিয়ে থাকেন, সেই অনুযায়ী সুন্নাহ সংক্রান্ত যে কোন বর্ণনাই হচ্ছে হাদীস।

---

[১৪] দেখুন: Page#26, *Mafhoom Ahl al-Sunnah wa al-Jam'aah `Ind Ahl al-Sunnah wa al-Jam'aah* - Naasir al-Aql.

[১৫] দেখুন: Page#529, Vol.1, *Arabic Language Lexicon* - E.W.Lane (Published by Islamic Text Society, Cambridge, England. 1984)

[১৬] দেখুন: Page#12, *Studies in Hadith Methodology and Literature* - Mustafa Muhammad Azami

www.pathagar.com

যে কোন হাদীসই দুইটি উপাদান দ্বারা গঠিত:

১) ইসনাদ বা বর্ণনাকারীদের ধারা , এবং

২) মতন বা হাদীসের বক্তব্য/ভাষ্য (text) । এই অংশদ্বয়ের উভয়কেই বেশ কিছু শর্ত পূরণ করতে হয় – যখন কোন একটা হাদীসকে গ্রহণ করা হয় এবং সেটাকে সত্য বলে গণ্য করা হয় ।

সাধারণভাবে হাদীসকে পাঁচটি মৌলিক শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়:

ক) সহীহ বা শুদ্ধ

খ) হাসান বা ভাল হাদীস

গ) যয়ীফ বা দুর্বল হাদীস

ঘ) যয়ীফ জিদ্দান বা খুবই দুর্বল হাদীস

এবং

ঙ) মাওদু বা জাল হাদীস ।[১৭]

আসলে এই সবকটিকে আরো মৌলিক পর্যায়ে কেবল দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় । **গৃহীত হাদীস** (সহীহ বা হাসান) এবং **প্রত্যাখ্যাত** হাদীস (যয়ীফ , যয়ীফ জিদ্দান এবং মাওদু) । **ইসলামিক আইনে সূত্র বা দলিল হতে হলে একটা হাদীসকে, অবশ্যই সহীহ বা হাসান পর্যায়ের হতে হবে** । যে কোন একটি হাদীস নিজগুণে **সহীহ বা হাসান বলে পরিগণিত হতে হলে** তাকে নিম্নলিখিত **পাঁচটি শর্ত পূরণ করতে হবে:**

---

[১৭] মওদু বা জাল হাদীস হচ্ছে, হাদীস বলে চালিয়ে দেয়া এমন একটি বর্ণনা - যা কিনা সূত্র ধরে পেছনে গেলে একজন জালকারী পর্যন্ত পৌঁছায় । হাদীসের আলোচনা করতে গিয়ে, অনেক স্কলারই এই শ্রেণীর বর্ণনাকে হাদীস বলেই গণ্য করেন না ।

www.pathagar.com

১) ধারাবাহিকতার সূত্র বা ইসনাদ নিরবচ্ছিন্ন হতে হবে। অন্যভাবে বলতে গেলে, প্রত্যেক পর্যায়ের বর্ণনাকারীকে সরাসরি তার পূর্ববর্তী সূত্রের কাছ থেকে হাদীসটি লাভ করতে হবে – যার বরাত দিয়ে তিনি তা বর্ণনা করেছেন। এবং এভাবে পিছনে যেতে যেতে তা রাসূল (সা.) পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে। এই ধারাবাহিক সূত্রের মাঝে কোথাও যদি কোন বর্ণনাকারী সূত্রের অনুপস্থিতি থাকে, তবে ধরে নিতে হবে যে সূত্রের ধারাবাহিকতা নিরবচ্ছিন্ন নয় এবং তাই তা অগ্রহণযোগ্য ।

২) সূত্রের ধারাবাহিকতায় প্রত্যেক বর্ণনাকারীকে অবশ্যই গ্রহণযোগ্য তাকওয়া, ন্যায়পরায়ণতা ও চরিত্রের অধিকারী হতে হবে, অন্য কথায় প্রত্যেক বর্ণনাকারীকে নৈতিক দিক দিয়ে অবশ্যই সুস্থ হতে হবে। **পরহেজগার নন এমন ব্যক্তিরা এ ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য নন – কেননা তারা যে পরহেজগার নন সেটা প্রতীয়মান করে যে, তারা আল্লাহকে যেভাবে ভয় করা উচিত, সেভাবে করেন না।** আর তাই নবী (সা.)-এঁর বক্তব্যসমূহ বর্ণনা করার ব্যাপারে তারা যে চূড়ান্ত যত্নশীল হবেনই, সে ব্যাপারে তাদের উপর আস্থা রাখা যায় না। সূত্রের ধারায় যদি কেবল একজন বর্ণনাকারীও এই গুণগত মানদন্ডে উত্তীর্ণ না হন, তবে সে হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে ।

৩) শুধু নৈতিক বৈশিষ্ট্যই এখানে যথেষ্ট নয়। হাদীস বর্ণনাকারীকে অবশ্যই দক্ষ হতে হবে এবং হুবহু বর্ণনায় সমর্থ হতে হবে। যদি এমন জানা যায় যে, কেউ হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে অনেক ভুল করেন – তার স্মৃতি থেকেই হোক আর লেখা থেকে হোক – তবে তার হাদীস গ্রহণ করা হবে না।

৪) একটা হাদীসের ইসনাদ ও মতন দুটোই এমন হতে হবে যে, অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী সূত্র থেকে যা বর্ণনা করা হয়েছে, তার সাথে যেন তারা বিরোধপূর্ণ না হয়।

www.pathagar.com

৫) যখন নানাভাবে পর্যবেক্ষণ করার পরে একটি হাদীস বর্ণনা করা হয়, তখন ব্যাপারটা যেন এমন হয় যে, ঐ হাদীসের ইসনাদ বা মতনে কোন ভুলভ্রান্তি বা খুঁত দেখা না যায়।

উপরোক্ত শর্তগুলোর একটিও যদি পূরণ না হয় তবে হাদীসটিকে দুর্বল (যয়ীফ) অথবা অত্যন্ত দুর্বল (যয়ীফ জিদ্দান) বলে প্রত্যাখ্যান করা হবে। (দুর্বলতার মাত্রার উপর নির্ভর করে) যেসব হাদীসকে যয়ীফ বা দুর্বল বলে চিহ্নিত করা হয় – সেগুলোর পক্ষে পর্যাপ্ত সমর্থনকারী সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া গেলে, সেগুলোকে হাসানের পর্যায়ে উন্নীত করা যেতে পারে । যেসব হাদীসকে যয়ীফ জিদ্দান বলে চিহ্নিত করা হয়, সেগুলোর দুর্বলতার মাত্রা বা প্রকৃতি, সেগুলোকে কোন কিছু সমর্থনকারী প্রমাণ হিসাবে ব্যবহৃত হওয়া অথবা অন্য কিছু দ্বারা সমর্থিত হওয়া থেকে বারণ করে। আর তাই এগুলোকে (যয়ীফ জিদ্দান হাদীসসমূহকে) কখনোই হাসান পর্যায়ে উন্নীত করা উচিত নয়। অবশ্য জাল হাদীস একদমই ভিন্ন একটা শ্রেণী বলে বিবেচিত হয় এবং সেগুলো কখনোই কোন অবস্থায় ইসলামী আইনের কোন সূত্র বলে বা ইসলামী আইনে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।

সুন্নাহ ও হাদীসের মাঝে সম্পর্ক

এখন যখন সুন্নাহ ও হাদীসের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এবং তা নিয়ে আলোচনাও সম্পন্ন হয়েছে, তখন সুন্নাহ এবং হাদীসের মাঝে সম্পর্ক নির্ণয় করা যেতে পারে । বাস্তবে সুন্নাহ হচ্ছে নবীর মূল বক্তব্য, কাজ অথবা নীরব অনুমোদন - তিনি যা সত্যি সত্যি করেছেন, বলেছেন বা অনুমোদন করেছেন । এখানে ‘দুর্বল সুন্নাহ’ বা “প্রত্যাখ্যাত সুন্নাহ” বলে কিছু নেই। কিন্তু ঐ সত্যিকার সুন্নাহ রাসূল (সা.)-এঁর কাছ থেকে আসা বিভিন্ন বর্ণনায় লিপিবদ্ধ রয়েছে, যেগুলো নিয়ে হাদীসের ভান্ডার গঠিত। আমরা কেবলি যেমনটা দেখলাম, প্রতিটি বর্ণনাই শুদ্ধ বা সঠিক নয় - বরং কিছু বর্ণনা এমনকি নির্ভেজাল জালিয়াতি। অন্য কথায়ঃ গোটা হাদীস সাহিত্য রাসূল (সা.)-এঁর সুন্নাহকে উপস্থাপন

www.pathagar.com

করে না। কেবলমাত্র গ্রহণযোগ্য হাদীসসমূহই রাসূল (সা.)-এঁর সত্যিকার সুন্নাহকে উপস্থাপন ও চিত্রায়ন করে।

এ বিষয়ে ইবন তাইমিয়্যা লেখেন :

"যে সুন্নাহ অবশ্যই অনুসরণ করা উচিত, যা অনুসরণ করার জন্য কেউ প্রশংসিত হয়, অথবা যার বিরুদ্ধাচারণ করার জন্য তিরস্কৃত হয় - তা হচ্ছে বিশ্বাসের ব্যাপারে, ইবাদতের ব্যাপারে এবং দ্বীনের বাকী কর্মকান্ডের ব্যাপারে রাসূল(সা.)- এঁর সুন্নাহ্ । এবং সেসব সুন্নাহ সম্বন্ধে জানার একমাত্র উপায় হচ্ছে ঐ সমস্ত হাদীসের জ্ঞান - যেগুলো তাঁর কাছ থেকে এসেছে বলে নিশ্চিত।"[১৮]

এ ব্যাপারে আলবানী বলেছেন :

"যেসব সুন্নাহর [ইসলামিক] আইনে সেরকম গুরুত্ব রয়েছে, সেগুলো হচ্ছে হাদীসবিশারদ এবং এর বর্ণনাকারীদের মতে যেগুলো শুদ্ধ পদ্ধতি ও প্রসিদ্ধ, সুস্থ ইসনাদের মাধ্যমে রাসূল (সা.)-এঁর কাছ থেকে আমাদের কাছে এসেছে বলে নিশ্চিত। কুরআনিক তাফসীরের বিভিন্ন পুস্তকে, ফিক্হের বিভিন্ন বইয়ে, উপদেশের বিভিন্ন বইয়ে, অন্তরকে কোমল করা ও শাসন করার লক্ষ্যে লিখিত গল্পের বইয়ে - ইত্যাদিতে যেসব পাওয়া যায় এগুলো সেসব নয়। ঐসব বইয়ে অনেক দুর্বল, প্রত্যাখ্যাত এবং জাল হাদীস রয়েছে, যার কিছু কিছু এমন যেগুলোর সাথে ইসলামের কোন সম্পর্কই নেই... জ্ঞানী ব্যক্তিগণ, বিশেষত যাদের মতামত ও বক্তব্য জনসাধারণদের মাঝে ছড়ায়, তাদের জন্য এটা অবশ্যকরণীয় যে, কোন হাদীসের সত্যতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিত

---

[১৮] দেখুন: Page# 387, Vol. 3, *Majmoo Fatawaa Shaikh al-Islaam ibn Taimiyyah* - Ahmad ibn Taimiyyah

www.pathagar.com

না হওয়া পর্যন্ত তারা যেন সেই হাদীসের ভিত্তিতে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন না করেন।"[১৯]

একবার যখন ইসলামে সুন্নাহর ভূমিকা ও গুরুত্বের ব্যাপারটা পরিস্কার হয়ে যাবে - যেমনটা আমরা এই বইয়ের মাধ্যমে হবে বলে আশা করছি - হাদীসের গুরুত্ব তখন যে কারো কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আমাদের জানতে হবে নবীর (সা.) সুন্নাহ্ কি ছিল। নবীর (সা.) বক্তব্যসমূহ পেতে হলে কোথায় খোঁজ করতে হবে তাও আমাদের জানতে হবে! রাসূল (সা.)-এঁর পূর্বে যেসব রাসূলগণ গত হয়েছেন, তাঁদের বক্তব্যসমূহের যে পরিণতি ঘটেছিল [ছড়িয়ে ছিটিয়ে হারিয়ে গিয়েছিল] আল্লাহর অশেষ রহমতে তেমনটা না হয়ে আল্লাহ্ মুসলিমদের জন্য তাঁর শেষ নবীর (সা.) প্রকৃত বক্তব্য ও কর্মকান্ডসমূহের বর্ণনা সংরক্ষণ করেছেন। নবীর (সা.) বক্তব্য, কর্মকান্ড এবং এমনকি তাঁর শারীরিক বৈশিষ্ট্য - সবকিছুই হাদীস-সাহিত্য বলে পরিচিত সাহিত্যের ভান্ডারে ধারণকৃত অবস্থায় রয়েছে। কার্যত তাঁর মহান জীবনের কোন কিছুই হারায় নি। তিনি কিভাবে নামাজ পড়তেন, রোযা রাখতেন, দৈনন্দিন জীবনে তাঁর সাহাবীদের সাথে অথবা স্ত্রীদের সাথে কিরকম আচরণ করতেন - এর সবকিছুই একজন মুসলিম চাইলে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানতে পারেন। তিনি কিভাবে খেতেন, পান করতেন এবং বসতেন তাও চাইলে তিনি কল্পনায় দেখতে পারেন। মানব সৃষ্টির শুরু থেকে নিয়ে এই পর্যন্ত আর যে কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের বেলায় এ ধরনের অলৌকিক ও পূর্ণ বর্ণনার আর কোন নজির নেই।[২০]

---

[১৯] দেখুন: Page# 13-14, *Manzalat al-Sunnah fi al-Islam* - Muhammad Nasir al-Deen al-Albaani

[২০] রাসূল (সা.)-এঁর নবুয়ত যে সত্য, আর তিনি যে শেষ নবী - যার পরে আর কোন নবী আসবেন না - এটা হচ্ছে সে সবেরও একটা নির্দশন!

www.pathagar.com

'সুন্নাহর কর্তৃত্ব' এই অভিব্যক্তিতে 'কর্তৃত্ব ' ও 'সুন্নাহ' শব্দগুলির অর্থ

ইসলামী আইনতত্ত্ব অনুযায়ী আল্লাহ্ হচ্ছেন একমাত্র আইনদাতা [আইন রচনাকারী]। এই অধিকারটা কেবলই তাঁর এবং সৃষ্টির আর কারোরই অন্য মানুষের উপর কোন আইনকানুন চাপিয়ে দেওয়ার কোন অধিকার নেই যতক্ষণ না সেটা এমন কিছু হয়, যা আল্লাহর প্রেরিত ওহীর আওতাধীন ও অনুমোদিত। আল্লাহ্ বলেনঃ

إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

"আদেশ (এবং শাসন) কেবলি আল্লাহর" (সূরা ইউসুফ, ১২:৪০, ১২:৬৭)

কিন্তু আল্লাহর আইন ও শাসন বিভিন্ন মাধ্যম বা সূচক দ্বারা জানা যায়। কুর'আন বা আল্লাহর বাণী যেমন তাদের একটি । রাসূল (সা.)-এঁর সুন্নাহও সেরকম আরেকটি মাধ্যম। আরবী ভাষায় 'হুজ্জাহ্'(অথরিটি) শব্দটির অর্থ হচ্ছে "একটা নির্দেশনা, সুনির্দিষ্ট প্রমাণ"। 'সুন্নাহর কর্তৃত্ব' এই অভিব্যক্তিতে একটা বিশেষ অর্থে যখন ব্যবহৃত হয়, তখন এর অর্থ দাঁড়ায় যে, সুন্নাহ হচ্ছে ইসলামী আইনের একটা বৈধ প্রমাণ যা থেকে কেউ আল্লাহ্র অনুশাসন সম্বন্ধে নিশ্চিত হবে। এর অর্থ এও দাঁড়ায় যে, সুন্নাহ্ যা নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাকাটাও আল্লাহর ইবাদতের একটা অংশ। উপরন্তু এর অর্থ দাঁড়ায় যে, যা দিয়ে সুন্নাহ গঠিত, যে কাউকে অবশ্যই তাতে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে এবং যে কারো জীবনের সব ক্ষেত্রে সুন্নাহ্ যে দাবী রাখে - সে অনুযায়ী কাজ করতে হবে।[২১]

---

[২১] দেখুনঃ Page#236, *Hujiyyat al-Sunnah* - Al-Hussain Shawaat

www.pathagar.com

এই অভিব্যক্তিতে সুন্নাহ্ শব্দটি ঠিক কি অর্থ ধারণ করে, তাও সুনির্দিষ্ট ভাবে সনাক্ত করার প্রয়োজন রয়েছে। নীচে, এক নম্বর ছকে, ইতিপূর্বে আলোচিত বিভিন্ন সংজ্ঞাগুলো পর্যালোচনা করা হয়েছে। মূলত এই অভিব্যক্তিতে সুন্নাহ শব্দটি যে অর্থ প্রকাশ করে, তা ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ বা উসূলীদের সংজ্ঞা অনুযায়ী সুন্নাহ্র যে অর্থ, সেটি (যার ভিতর মোটামুটি ভাবে আক্বীদাহ্ বিশেষজ্ঞদের দেয়া সংজ্ঞা সংযোজিত রয়েছে)। তবে সুন্নাহ্র উদ্ধৃতিটা যে একটা গ্রহণযোগ্য হাদীস থেকে আসতে হবে সেই শর্তটা এখানেও প্রযোজ্য ।

অন্য কথায় বলতে গেলে এ দ্বারা আমরা নবীর (সা.) বক্তব্য, নির্বাচিত কার্যকলাপ, নীরব অনুমোদন এবং সাধারণ দিক নির্দেশনা বুঝব - যেগুলো নবী (সা.)-এঁর কাছ থেকে সাহাবীদের কাছে হস্তান্তরিত হয়েছে এবং নির্ভরযোগ্য হাদীসে (সহীহ ও হাসান) সংরক্ষিত রয়েছে।

www.pathagar.com

কোন শাখার 'আলেম	শাখার মূল বিবেচ্য বিষয়	সুন্নাহ্‌র সংজ্ঞা	মন্তব্য
ফক্বীহ্‌	কর্ম বা আমলের শ্রেণীবিভাগ অথবা মর্যাদা - তা ফরজ, ওয়াজিব, মুস্তাহাব অথবা মুবাহ্‌ যাই হোক না কেন!	একটা কাজ যা কি না ওয়াজিব এবং মুবাহের মাঝখানে অবস্থিত। একটা পছন্দনীয় কাজ; একটা কাজ যা করলে কেউ পুরস্কৃত হবে কিন্তু না করলে সে শাস্তি পাবে না।	সুন্নাহ্‌র ক্ষমতা/ কর্তৃত্ব/মর্যাদা নিয়ে কথা বলতে গেলে এই সংজ্ঞায় সুন্নাহ্‌ বলতে যা বোঝায় তার তাৎপর্য নেই।
মুহাদ্দিস	রাসূল (সা.)-এঁর জীবন সম্বন্ধে যে কোন বর্ণনা - উদ্দেশ্য হচ্ছে কোন বর্ণনাগুলো সহীহ্‌ আর সহীহ্‌ না তা নির্ধারণ করা।	রাসূল(সা.) থেকে যা কিছু আমাদের কাছে এসেছে - তাঁর কথা, কাজ, নীরব সম্মতি, আচরণ, শারীরিক বৈশিষ্ট্য অথবা জীবনী - নবুয়তের আগের না পরের সেই বিবেচনা ছাড়াই।	এই সংজ্ঞা খুবই বিস্তারিত এবং এর ভিতরে এমন কিছু বিষয় রয়েছে, যেগুলো ঠিক কর্তৃত্বের ধারণার ভিতর অন্তর্ভুক্ত নয়।
উসূলী	ইসলামী আইনের ব্যাপারে কোন বিষয়টা দলিল এবং কিভাবে সেই দলিল ব্যবহার করে আইন প্রণয়ন করতে হবে।	নবী(সা.)-এঁর কাছ থেকে কথা, কাজ অথবা নীরব অনুমোদন হিসেবে - কুর'আন ছাড়া আর যা কিছু আমাদের কাছে এসেছে।	আমরা যখন "সুন্নাহ্‌র কর্তৃত্বের" কথা বলি, তখন এটাই হচ্ছে সুন্নাহ্‌র সঠিক অর্থ।
আক্বীদাহ্‌ বিশেষজ্ঞ	একজন মুসলিমের কি কি বিষয় বিশ্বাস করার কথা এবং তার সাথে সম্পৃক্ত বিষয়সমূহ।	ঈমানের ভিত্তি, ফরজ, ওয়াজিব বিষয়সমূহ, আক্বীদাহ্‌র বিষয় সমূহ এবং ইসলামের সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলী।	এই সংজ্ঞাটি খুবই সংকীর্ণ - সুন্নাহর সংজ্ঞার ভিতর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে এমন অনেক বিষয় এই সংজ্ঞার বাইরে থেকে যায়।

১ নম্বর ছক

www.pathagar.com

এই অধ্যায়ে 'সুন্নাহ' অভিব্যক্তিটির সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। গুরুত্ব দেয়ার মত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়ের একটি হচ্ছে "The Authority of the sunnah" অথবা "দলিল হিসাবে সুন্নাহর গ্রহণযোগ্যতা [বা মর্যাদা]" এরকম একটা বাক্যাংশে 'সুন্নাহ্' শব্দটির যে নিহিতার্থ রয়েছে, তার সাথে ফিকহশাস্ত্রবিদরা যে অর্থে শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন, তা যেন গুলিয়ে ফেলা না হয়। তাঁদের (ফিক্হশাস্ত্রবিদ) ব্যবহারে শব্দটি ('সুন্নাহ্') যে কোন একটি নির্দিষ্ট কাজকে অবশ্যকরণীয় এবং অনুমোদিত এই দুইয়ের মাঝামাঝি কোন একটা অবস্থানে অবস্থিত বলে বুঝানো হয় - অর্থাৎ কাজটা পছন্দনীয়। **শব্দটির এই ব্যবহার 'সুন্নাহ' শব্দটির আভিধানিক অর্থের অনেক কাছাকাছি, এবং "Authority of the sunnah" বা "দলিল হিসাবে সুন্নাহ গ্রহণযোগ্যতা বা মর্যাদা" এই অভিব্যক্তিতে 'সুন্নাহর' যে অর্থ তার সাথে নিশ্চিতভাবেই এর কোন সম্পর্ক নেই।**

আবার "The Authority of the sunnah" বা "দলিল হিসাবে সুন্নাহর গ্রহণযোগ্যতা বা মর্যাদা" এই অভিব্যক্তিতে সুন্নাহ্র যে অর্থ, তার চেয়ে হাদীস বিশেষজ্ঞরা সুন্নাহ্র যে সংজ্ঞা দিয়ে থাকেন, তার অর্থ অনেক ব্যাপক। [সুতরাং হাদীস বিশেষজ্ঞদের মতে সুন্নাহর যে অর্থ, সেটাকে এই অভিব্যক্তির বেলায় প্রয়োগ করা যাবে না]। এটা এই জন্য যে, **হাদীস বিশেষজ্ঞরা তাদের সুন্নাহর সংজ্ঞায় এমন সমস্ত দিক অন্তর্ভুক্ত করে থাকেন, আইন প্রণয়নের বেলায় যেগুলোকে কোন ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা যায় না** - যেমন ওহী প্রাপ্তির আগে রাসূল (সা.)-এঁর জীবনের কাজকর্মগুলো।

www.pathagar.com

উসূলীদের দ্বারা দেয়া সুন্নাহর সংজ্ঞা হচ্ছেঃ রাসূল (সা.)-এঁর বক্তব্য, কর্মকান্ড এবং নীরব অনুমোদন। এই সংজ্ঞা বাস্তবে আক্বীদাহ্ বিশেষজ্ঞরা সুন্নাহর যে সংজ্ঞা দিয়ে থাকেন, সেটাকে ধারণ করে। "দলিল হিসাবে সুন্নাহর গ্রহণযোগ্যতা ও গুরুত্ব" নিয়ে যখন আমরা আলোচনা করি, তখন আমাদের মাথায় সুন্নাহ্র এই সংজ্ঞাটাই কাজ করে।

নির্ভরযোগ্য বা সহীহ্ হাদীসের সাহিত্যে সুন্নাহ্ সংরক্ষিত রয়েছে। সুতরাং কেউ যদি জানতে চায় যে, সুন্নাহ কি? তাহলে তাকে নির্ভরযোগ্য বা সহীহ্ হাদীসের সাহিত্যের শরণাপন্ন হতে হবে। তাই আমরা যখন বলি "The Authority and the Importance of the Sunnah " বা "দলিল হিসাবে সুন্নাহ্র মর্যাদা ও গুরুত্ব" তখন তা আসলে সরাসরি "The Authority and Importance of the Authentic Hadeeth" বা "দলিল হিসাবে সহীহ্ হাদীসের ভিত্তি ও গুরুত্ব " বোঝায়।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

দলিল হিসাবে সুন্নাহর মর্যাদা ও গুরুত্ব প্রতিষ্ঠায় প্রমানসমূহ

ভূমিকা

সুন্নাহ্‌র গুরুত্ব সম্বন্ধীয় প্রমাণকে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়:

ক)কুর'আন থেকে প্রমাণসমূহ
খ)খোদ সুন্নাহ্‌ থেকে প্রমাণসমূহ
গ)রাসূল (সা.) এঁর সাহাবীদের বক্তব্য থেকে জড়ো করা প্রমাণ
এবং
ঘ)ইসলামের নেতৃস্থানীয় স্কলারদের সিদ্ধান্ত।[২২]

স্পষ্টতই কেউ যদি সুন্নাহর গুরুত্বকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকারই করে, তবে তাকে সুন্নাহর গুরুত্ব বোঝাতে হাদীসশাস্ত্রকে একটা প্রমাণের সূত্র হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না। তখন তার পরিবর্তে ইসলামে সুন্নাহর মর্যাদা কতটুকু তা প্রমাণ করতে কুর'আনের শরণাপন্ন হতে হবে। কুর'আনে এমন বহু আয়াত রয়েছে, যেগুলো সুন্নাহর গুরুত্ব নির্দেশ করে। আসলে এমন অনেক আয়াত রয়েছে, যেগুলো স্পষ্টত নির্দেশ করে যে, **আল্লাহয় যে বিশ্বাস করে, তার জন্য সুন্নাহ অনুসরণ করাটা**

[২২] এখানকার শেষোক্ত দু'টো দলিল এককভাবে বা কেবল নিজগুণে কোন কিছুর প্রমাণ হতে পারে না - যতক্ষণ না সেগুলোর ব্যাপারে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

www.pathagar.com

অবশ্যকরণীয় বা ফরজ ।[২৩] এইসব আয়াতের অনেকগুলোই এমন ভাবে ব্যাপারটার উপর গুরুত্ব আরোপ করে যে, বিবেকসম্পন্ন কোন ব্যক্তির পক্ষে দলিল হিসেবে সুন্নাহর গ্রহণযোগ্যতা ও এর গুরুত্ব বোঝাতে আয়াতগুলোর ব্যবহার অস্বীকার করা সম্ভব নয়। এই অধ্যায়ের প্রথম অংশে কেবল কুর'আনের কিছু সংশ্লিষ্ট আয়াত নিয়েই আলোচনা করা হবে।

নবীর সুন্নাহর সাথে সম্পৃক্ত কুর'আনের আয়াত সমূহ

কুর'আনে বহু জায়গায় নবীর সুন্নাহর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলা হয়েছে [২৪] । আসলে তাদের সংখ্যা এতই বেশী যে, তাদেরকে আবার ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, অথবা সুন্নাহ্ অনুসরণ করার জন্য আদেশসমূহের শ্রেণীর নিরিখেও বিভক্ত করা যায়। সুতরাং আয়াতগুলোকে তাদের উপযুক্ত শ্রেণীতে বিন্যস্ত করে আলোচনা করা হবে।

রাসূলের (সা.) প্রতি আনুগত্য হচ্ছে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য

আল্লাহ্ তাঁর নবীর কাছে প্রেরিত অহীতে বলেনঃ

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَآ أَرْسَلْنَـٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿٨٠﴾

---

[২৩] ইবন তাইমিয়্যা দেখিয়েছেন যে, কুর'আনে ৪০টিরও বেশী জায়গায় সুন্নাহ্র মর্যাদা নিশ্চিত করা হয়েছে। দেখুনঃ Page# 93, Vol. 19, *Majmooat al-Fatawaa ibn Taimiyyah* - Ibn Taimiyyah

[২৪] আমরা এখানে কিছু আয়াত তুলে দিচ্ছি, কিন্তু সব নয়।

www.pathagar.com

"কেউ রাসূলের আনুগত্য করলে, সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করলো এবং কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে, আপনাকে আমরা তাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে পাঠাইনি।" (সূরা নিসা, ৪:৮০)

এই আয়াতে আল্লাহ্ পরিস্কার ভাবে বলে দিচ্ছেন যে, রাসূলের (সা.) প্রতি আনুগত্য, আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের চেয়ে কমকিছু নয়। আয়াতটি এতই পরিস্কার যে, একে অন্য কোন ভাবে ব্যাখ্যা করার উপায় নেই।

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে রাসূল (সা.) নিজে বলেন : ***"যে আমাকে মানে সে আল্লাহকে মানে, যে আমাকে অমান্য করে সে আল্লাহকে অমান্য করে।"*** নবীর সুন্নাহ্ অথবা আদেশ অনুসরণ না করা আর আল্লাহর আদেশ মোতাবেক কাজ না করা একদম একই কথা। **ইবন কাসীর** বলেন যে, নবীর কাজ হচ্ছে কেবল বাণীটুকু পৌঁছে দেয়া এবং তারপর এটা ব্যক্তির উপর নির্ভর করে - সে সেই বাণী গ্রহণ করলো না প্রত্যাখ্যান করলো। যে তাঁর বাণী অনুসরণ করে, সে নাজাত লাভ করবে। সুতরাং যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের (সা.) আনুগত্য করে, সে হেদায়েত লাভ করে ; যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে না সে নিজের ক্ষতি করে, আর কারো নয়। আল-শাওকানী বলেন, এই আয়াত প্রমাণ করে যে, নবীর কাছ থেকে যা কিছু আসে তার উৎস আসলে আল্লাহ্ই।[২৫]

আরেকটি আয়াতে নবী (সা.)-এঁর কাছে আনুগত্যের শপথকে আল্লাহ তাঁর নিজের কাছে আনুগত্যের শপথ বলে বর্ণনা করেন:

---

[২৫] দেখুন: Page#489, Vol.1 *Fath al-Qadeer* - Muhammad ibn Ali al-Shaukaani

www.pathagar.com

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَـٰهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٠﴾

"যারা আপনার হাতে বাই'আত করে, তারা তো আল্লাহরই হাতে বাই'আত করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে। অতঃপর যে তা ভঙ্গ করে, তা ভঙ্গ করার পরিণাম তারই, এবং যে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার পূর্ণ করে তিনি [আল্লাহ] অবশ্যই তাকে মহা পুরস্কার দেন।" (সূরা ফাতহ, ৪৮:১০)

এখানে আল্লাহ বর্ণনা করছেন যে, রাসূল (সা.)-এঁর কাছে বাই'আত দেয়া আর আল্লাহর কাছে বাই'আত দেয়া একই কথা। এর পরিষ্কার নিহিতার্থ হচ্ছে এই যে, রাসূলের (সা.) আনুগত্য আর আল্লাহর আনুগত্য একই।

আল্লাহ নবীর আনুগত্য করার আদেশ দেন এবং তাঁকে অমান্য করার ব্যাপারে সতর্ক করে দেন

আল্লাহ কুর'আনে বলেন :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَـٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

"হে মু'মিনগণ, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস কর, তবে আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং তাদের, যারা

www.pathagar.com

তোমাদের মধ্যে কর্তৃত্বের অধিকারী । কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা আল্লাহ ও রাসূলের কাছে উপস্থিত কর। এটাই শ্রেয় এবং পরিণামে এটাই প্রকৃষ্টতর।" (সূরা নিসা, ৪:৫৯)

কুর'আনের এই একটি আয়াত থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বেরিয়ে আসে। **প্রথমত**, লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে আল্লাহ্ এখানে **"আনুগত্য কর"** বলে একটা স্পষ্ট আদেশ দিয়েছেন । শুধু তাঁর ব্যাপারে নয় বরং রাসূল (সা.)-এঁর ব্যাপারেও - বলেছেন **"আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর "** ("কিন্তু যারা তোমাদের মধ্যে কর্তৃত্বের অধিকারী" এই অংশের পূর্বে ঐ একই ক্রিয়াপদ [আতিউ] বা আদেশ সরাসরি সংযুক্ত হয়নি)। এর ফলে রাসূল (সা.)-কে ***আনুগত্যের এক স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে*** অথচ ***অন্য যে কারো প্রতি আনুগত্যের সাথে কুরআন ও সুন্নাহর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়ার শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে*** ।

দ্বিতীয়ত , এর নিহিতার্থ হচ্ছে এই যে, এক ভাবে চিন্তা করলে রাসূল (সা.)-এঁর আনুগত্য আল্লাহর আনুগত্যের চেয়ে ভিন্ন কিছু। এটা সত্যি যে, আল্লাহর রাসূলের (সা.) প্রতি আনুগত্য আল্লাহরই প্রতি আনুগত্য। কিন্তু এখানে যা বলা হয়েছে তা হচ্ছে এরকম যে, আল্লাহর কথা বা কুর'আন থেকে তিনি যা উপস্থাপন করেছেন কেবল সেসব ব্যাপারেই রাসূল (সা.)-কে মেনে চলার চেয়ে এই আনুগত্য ভিন্ন কিছু। (কেউ কেউ যেমনটা দাবী করে থাকেন যে, **"রাসূলকে মানা"** কথাটার অর্থ হচ্ছে কুর'আনের অংশ হিসাবে তিনি আল্লাহর যেসব কথা আমাদের জানিয়ে গেছেন, শুধু সেসব মেনে চলা- এখানে সেসব বাকবিতন্ডার দ্বার চিরতরে রুদ্ধ করে দেয়া হয়েছে)।

তৃতীয়ত, যে কোন ব্যাপারে বিতর্ক দেখা দিলে, মুসলিমদের সেটাকে কেবলমাত্র দুটি কর্তৃত্বের উৎসের কাছে নিয়ে যেতে আদেশ করা

www.pathagar.com

হয়েছে - যেগুলো হচ্ছে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সা.)। সাহাবীগণ এবং তাদের পরবর্তী স্কলারগণ **'আল্লাহর কাছে নিয়ে যাওয়া '** বলতে **'আল্লাহর কিতাবের কাছে নিয়ে যাওয়া'** বুঝেছেন । আর **'আল্লাহর রাসূলের কাছে নিয়ে যাওয়া '** বলতে তাঁর জীবদ্দশায় সরাসরি তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়া এবং তাঁর জীবনাবসানের পর তাঁর **'সুন্নাহর কাছে নিয়ে যাওয়া'** বুঝানো হয়েছে । এখানে আরো লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাহকে একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে এবং **এই আয়াতে এমন কথা বলা হয়নি যে,** ***"ব্যাপারটা আল্লাহর কাছে উপস্থিত কর এবং সেখানে যদি কোন উত্তর না পাও, তবে তা আল্লাহর রাসূলের কাছে উপস্থিত কর"***।

চতুর্থত, আল্লাহ বলেন যে, সত্যিকার বিশ্বাসী হচ্ছে তারা, যারা তাদের বিতর্ক বা মতপার্থক্যকে কেবল আল্লাহর কাছে উপস্থিত করেন না বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা.) কাছে উপস্থিত করেন ।

পঞ্চমত, একজন বিশ্বাসী জানেন যে, গুরুত্বপূর্ণ জীবন হচ্ছে আখিরাতের জীবন। তাই যখন তিনি আল্লাহর মুখোমুখি দাঁড়াবেন সেই সময়ের জন্য এটাই শ্রেয় যে, একজন বিশ্বাসী যে কোন ঝগড়া, মীমাংসার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল - উভয়ের কাছে নিয়ে যাবেন এবং তিনি রাসূলের (সা.) সুন্নাহর মর্যাদা অস্বীকার করেন না ।

ষষ্ঠত, যে কারো উপলব্ধি করা উচিত যে, এই আয়াতে সকল প্রকারের মতবিরোধ বা ঝগড়াঝাঁটির কথা বোঝানো হয়েছে - তা ইবাদতের নিয়মাবলীর ব্যাপারে হোক , বা ব্যবসার ব্যাপারে হোক বা অন্যান্য পার্থিব বিষয়েই হোক। কোন কোন স্কলার বলে থাকেন যে, এই আয়াত রাসূল (সা.)-এঁর কোন কোন সহচরের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। নবীর (সা.) সময়কালের পূর্বে সরকারী কর্তৃত্বের ব্যাপারে আরবদের সত্যিকার কোন ধারণা ছিল না। আর সেজন্য তা থেকে

www.pathagar.com

ঝগড়াঝাঁটির উৎপত্তি হতো - সে প্রসঙ্গেই আল্লাহ বলেছেন যে, বির্তকিত বিষয়কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা.) কাছে উপস্থিত করাই হচ্ছে এর সমাধান।

"কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে" এই বাক্যাংশ সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে **ইবনুল কাইয়্যিম** (রহ.) বলেন যে, এই আরবী বাক্যাংশ অনির্দিষ্টতাসূচক। 'কোন বিষয়' শব্দটি, একটি শর্ত হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এ থেকে ব্যাপারটা সাধারণভাবে সকল বিষয়ে প্রযোজ্য বলে বোঝা যায়; অন্য কথায় বলতে গেলে ছোট অথবা বড় - তাদের দ্বীন সংক্রান্ত এমন যে বিষয়েই মুসলিমরা মতবিরোধ পোষণ করবে, তার সবকিছুকেই বোঝানো হচ্ছে [বা যে কোন কিছুকেই বোঝানো হচ্ছে] - তারা সেই বিষয়টিকেই আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাহ্‌র কাছে নিয়ে যাবে। এর নিহিতার্থ হচ্ছে ঐ বিষয়ে - যে কোন বিষয় - সমাধান অবশ্যই কুর'আন ও সুন্নাহর মাঝে খুঁজে পেতে হবে। এটা একটা অসম্ভব ব্যাপার যে, আল্লাহ্ মুসলিমদের সকল বিষয়ের সমাধানের জন্য এই দুটি উৎসের কাছে যেতে বলেছেন, অথচ, সেসবের মাঝে তাদের মতবিরোধের সমাধান পাওয়া যাবে না।[২৬]

সবশেষে **ইবনুল কাইয়্যিম** এই ব্যাপারটার দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, **"আল্লাহ ও রাসূলের কাছে উপস্থিত কর"**- কিন্তু "আল্লাহ্‌র কাছে এবং তাঁর রাসূলের কাছে উপস্থিত কর", এভাবে তিনি কথাটা বলেননি (অন্য কথায় 'কাছে' কথাটা কেবল একবারই ব্যবহৃত হয়েছে।) তিনি বলেন যে, বাক্যটা এভাবে গঠন করা হয়েছে কেননা আল্লাহর যে সিদ্ধান্ত, তাঁর রাসূলের

---

[২৬] ইবনুল কাইয়্যিম থেকে উদ্ধৃত, দেখুন: Page#301, *Hujjiyah al-Sunnah* - Abdul Ghani Abdul Khalique

www.pathagar.com

(সা.) সিদ্ধান্ত ঠিক তাই। আর আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) যে সিদ্ধান্ত নেন, তাই হচ্ছে আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত। সুতরাং কোন একটা বিষয়ে মতবিরোধ পোষণ করলে মুসলিমরা যখন তা সমাধান করার জন্য আল্লাহ্‌র (কিতাবের) কাছে নিয়ে যায়, তখন তারা কার্যত তা তাঁর রাসূলের (সা.) কাছেই নিয়ে যাচ্ছে - আবার যখন তারা কোন বিষয়কে রাসূলের (সা.) কাছে উপস্থিত করে, তখন তারা আসলে সেটাকে আল্লাহ্‌র কাছেই উপস্থিত করল। পবিত্র কুরআনে যে কেউ যে সমস্ত সূক্ষ্ম ও সুচারু অভিব্যক্তি দেখতে পায় এটা সেগুলোরই একটি।[২৭]

আরেকটি আয়াতে আল্লাহ্‌ বলেন,

وَأَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٣٢﴾

"তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমরা রহমত লাভ করতে পার।" (সূরা আলে ইমরান ৩:১৩২)

এই আয়াতে আল্লাহ্‌ বলছেন যে, যারা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের (সা.) আনুগত্য করছে, পরকালে তাদের উপর আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হবে।

"তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর" এই একই কথাগুলো সূরা আলে ইমরানের ৩২ নম্বর আয়াতে আবারও উল্লিখিত হতে দেখা যায়। এছাড়া "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর" এই অভিব্যক্তি কুর'আনে চারবার উচ্চারিত হয়েছে (৮:১,৮:২০ ৮:৪৬ এবং মুজাদালা ৫৮:১৩) । উদাহরণস্বরূপ আল্লাহ বলেন,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَوَلَّوْا۟ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ﴿٢٠﴾

---

[২৭] ইবনুল কাইয়্যিম থেকে উদ্ধৃত, দেখুন:Page#235, Vol.2 *Al-Dhau al-Muneer ala al-Tafseer* - Ali al-Saalihi

www.pathagar.com

“হে মু'মিনগণ , আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমরা যখন তাঁর কথা শ্রবণ করছো তখন তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না ” (সূরা আনফাল, ৮:২০)

ইবনে কাসীর বলেন যে, উপরোক্ত আয়াতের শেষ অংশের অর্থ হচ্ছে, *“অর্থাৎ তোমরা যখন জান যে, তিনি কিসের দিকে তোমাদের আহবান করছেন, তার পরে [মুখ ফিরিয়ে নিও না] ।”*[২৮]

অন্য কথায়, একবার যখন কোন মুসলিম জানবে যে, [কোন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে] রাসূল (সা.) কি বলেছেন, তখন তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া অথবা তা অবজ্ঞা করা তার কাছ থেকে কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয় ।

সব শেষে, “আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর” এই অভিব্যক্তিটি পবিত্র কুর'আনে আরো পাঁচবার উচ্চারিত হতে দেখা যায় (সূরা নিসা ৪:৫৯, সূরা মায়িদা ৫:৯২, সূরা তাগাবুন ৬৪:১২) । এই অভিব্যক্তির ব্যবহারের উদাহরণ হচ্ছে :

قُلْ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا۟ ۚ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَٰغُ ٱلْمُبِينُ ﴿٥٤﴾

“বল , আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর, অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে তার উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য সেই দায়ী এবং তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরাই

[২৮] দেখুন: Page#574, *Tafseer al-Quran al-Adheemal-Maroof bi Tafseer ibn Katheer* - Ismaeel Ibn Katheer

www.pathagar.com

দায়ী; এবং তোমরা তার আনুগত্য করলে তোমরা সৎপথ খুঁজে পাবে, আর রাসূলের কাজ তো কেবল স্পষ্টভাবে [বাণী] পৌঁছে দেয়া ।"
(সূরা নূর , ২৪:৫৪)

আর এক জায়গায় এই অভিব্যক্তিটি ব্যবহার করা হয় এভাবে:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوٓا۟ أَعْمَـٰلَكُمْ

"হে মু'মিনগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর, আর তোমাদের কাজ বিনষ্ট [নিষ্ফল] করে দিও না ।"
(সূরা মুহাম্মাদ,৪৭:৩৩)

আল-কুরতুবী এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুকাতিলের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, *"যদি তোমরা রাসূলকে অমান্য কর, তবে তোমরা তোমাদের কৃতকর্মকে বিনষ্ট করে দিলে ।"*[২৯]

সুতরাং, পবিত্র কুর'আনের নয়টি আয়াতে আল্লাহ্ পরিস্কারভাবে কেবল তাঁর নিজের প্রতি আনুগত্যের আদেশই দেননি বরং তাঁর রাসূলের প্রতি আনুগত্যের আদেশও দিয়েছেন ।

"হে বিশ্বাসীগণ" বা **"তোমরা যারা ঈমান এনেছো"** বলে, স্পষ্টতই বিশ্বাসীদের সম্বোধন করা হয়েছে এর অনেক কয়টিতে। এর অর্থ হচ্ছে রাসূলকে (সা.) মেনে চলার ও অনুসরণ করার এই আদেশ কেবল নবীর জীবদ্দশার সময়কাল ও তাঁর সাহাবীদের মাঝে সীমিত নয় । বরং যে কেউ যে নিজেকে বিশ্বাসী বলে দাবী করে, তার বেলায়ই এই আদেশ প্রযোজ্য ।

---

[২৯] দেখুন: Page#255, Vol.16, *Al-Jaami al-Ahkaam al-Qur'an* - Abu Abdullah al-Qurtubi.

www.pathagar.com

<u>আজকের দিনে কোন ব্যক্তি যদি বলে যে, তার জন্য নবীকে (সা.) অনুসরণ করাটা জরুরী নয় , কেননা নবীর (সা.) আনুগত্য করাটা কেবল তাঁর জীবদ্দশায় প্রযোজ্য ছিল, তবে কার্যত সে এ কথাই বলছে যে সে, "যারা ঈমান এনেছে" তাদের অন্তর্ভুক্ত নয় - যাদেরকে আল্লাহ্ এই আয়াতগুলোতে সম্বোধন করেছেন। সে যদি যারা ঈমান এনেছে তাদের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে থাকে, তাহলে সে অবশ্যই কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত ।</u>

আল সালাফী ও উসমানী উল্লেখ করেন যে , কুর'আনে এমন কোন স্থান নেই যেখানে আল্লাহ্ রাসূলের (সা.) প্রতি আনুগত্যের স্পষ্ট উল্লেখ না করে কেবল তাঁর নিজের প্রতি আনুগত্যের আদেশ দিয়েছেন ।

একইভাবে, রাসূলের (সা.) অবাধ্যতার ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা ছাড়া আল্লাহ তাঁর নিজের প্রতি অবাধ্যতার ব্যাপারেও সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন নি । [৩০]

এর নিহিতার্থ হচ্ছে এই যে, রাসূলের (সা.) আনুগত্যের মাধ্যম ছাড়া সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্‌র প্রতি কোন আনুগত্য থাকতে পারে না - অর্থাৎ আল্লাহ্ তাঁর নবীর (সা.) কাছে ওহী দ্বারা যে পথ-নির্দেশনা প্রেরণ করেছেন, তার মাধ্যম ছাড়া। আসলে কিভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত ও আনুগত্য করতে হবে সেটা জানার এটাই হচ্ছে একমাত্র পথ ।

যদিও এমন কোন আয়াত নেই, যেখানে আল্লাহ নবীর (সা.) প্রতি আনুগত্যের আদেশ না করে কেবল তাঁর নিজের প্রতি আনুগত্যের

---

[৩০] দেখুনঃ Page#34, *Al-Sunnah: Hujiyyatuhaa wa Makaanatuhaa fi-l-Islaam wa al-Raad ala Munkireehaa* - Muhammad Luqmaan al-Salaafi.

www.pathagar.com

আদেশ করেছেন, তবে যে কেউ এমন আয়াত দেখতে পাবে, যেখানে আল্লাহ তাঁর নিজের প্রতি আনুগত্যের উল্লেখ করা ছাড়াই কেবল নবীর (সা.) প্রতি আনুগত্যের আদেশ দিয়েছেন।

সুতরাং রাসূল (সা.)-এঁর আনুগত্য করাটা অবশ্যকরণীয় কিনা এ ধরনের সম্ভাব্য সকল বিভ্রান্তির পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ সূরা নূরে দেখতে পাওয়া যাবে আল্লাহ বলছেন:

وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

"তোমরা সালাত কায়েম কর , যাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য কর - যাতে তোমরা রহমত লাভ করতে পার ।" (সূরা নূর , ২৪:৫৬)

আল্লাহ আরো বলেন:

وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ

ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِۦ جَهَنَّمَ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

"কারো কাছে সৎপথ স্পষ্ট হওয়ার পরেও সে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মু'মিনদের পথ ছাড়া অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে সে যেদিকে ফিরে যায়, আমরা তাকে সেদিকেই যেতে দেব এবং তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবো। কত মন্দ সে আবাসস্থল ।" (সূরা নিসা ,৪:১১৫)

রাসূল (সা.)-এঁর প্রতি আনুগত্যের কথা সবসময় উল্লেখ করা হলেও, আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্যের কথা যে শুধু কখনো উল্লেখিত হয়েছে - এ ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উসমানী বলেন,

www.pathagar.com

"'নবীর প্রতি আনুগত্যের' প্রতি এত বেশী গুরুত্ব আরোপ করার কারণ হচ্ছে এই যে, 'নবীর প্রতি আনুগত্যের' মাধ্যম ছাড়া 'আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্যের' দাবী পূরণ করা সম্ভব নয়। আল্লাহ্‌ আলাদা আলাদা করে প্রতিটি ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বলে দেন না যে, তার কাছে তিনি কি চান - নবীর প্রতি আনুগত্যই হচ্ছে আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য এবং প্রথম ব্যাপারটার ভিতরে সবসময়ই দ্বিতীয় ব্যাপারটা অন্তর্ভুক্ত থাকে। আর সেজন্যই পবিত্র কুর'আন, কিছু কিছু আয়াতে কেবলমাত্র রাসূলের প্রতি আনুগত্যই করাকেই যথেষ্ট মনে করেছে, কেননা আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের একমাত্র বাস্তব উপায় হচ্ছে নবীর প্রতি আনুগত্য। অপর পক্ষে পবিত্র কুর'আন 'রাসূলের প্রতি আনুগত্যের' উল্লেখ ছাড়া কেবল 'আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের' ব্যাপারটা উল্লেখ করা যথেষ্ট মনে করে নি - 'রাসূলের প্রতি আনুগত্যকে' অবজ্ঞা করার সামান্যতম অজুহাতের সম্ভাবনা বাতিল করতে এবং সকল নিহিতার্থ সমেত 'রাসূলের প্রতি আনুগত্য' ছাড়া যে আসলে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়, সে ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ না রাখতে চেয়ে এমনটা করা হয়েছে।"[৩১]

এই আদেশের উপর আল্লাহ্‌ যে গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তা তার পুনরাবৃত্তি থেকেই স্পষ্ট। এ ব্যাপারে কোন মুসলিমের মনে কোন প্রকার সন্দেহ থাকার উপায় নেই যে, নবীর আনুগত্য করা এবং তাঁর অনুসরণ করা তার উপর ফরজ। আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলকে (সা.) যারা মেনে চলবে, তাদের পুরস্কারের বর্ণনা যেভাবে আল্লাহ্‌ বহু আয়াতে {(৪:১৩),(৪:৬৯),(২৪:৫২), (৪৮:১৭)} উল্লেখ করেছেন - তা থেকে ব্যাপারটা আরো গুরুত্ব লাভ করে ।

উদাহরণস্বরূপ আল্লাহ্‌ বলেন:

---

[৩১] দেখুন: Page#34, *The Authority of Sunnah* - Muhammad Taqi Usmani.

www.pathagar.com

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

"........কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করলে আল্লাহ তাকে জান্নাত প্রবেশ করাবেন - যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে এবং এটা মহা সাফল্য ।"(সূরা নিসা , ৪:১৩)

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّٰلِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُو۟لَٰٓئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٩﴾

"আর যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করলো, তারা - যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেনঃ নবী, সত্যনিষ্ঠ, শহীদ ও সৎকর্ম পরায়ণ - তাদের সঙ্গী হবে। এবং তারা কত উত্তম সঙ্গী ! " (সূরা নিসা ৪:৬৯)

এ ছাড়াও সত্যিকার বিশ্বাসীদের বৈশিষ্ট্যের একক অংশ হচ্ছে এই যে তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা.) আনুগত্য করে। এই সব ব্যক্তিরাই হচ্ছে তারা যারা আল্লাহর রহমত লাভের আশা করতে পারে। আল্লাহ বলেনঃ

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

www.pathagar.com

"মুসলিম নর ও মুসলিম নারী একে অপরের বন্ধু। তারা সৎকাজের আদেশ দেয় ও অসৎকাজের নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, এবং যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এদের উপর আল্লাহ্ তাঁর রহমত বর্ষণ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা তওবা, ৯:৭১)

কিন্তু এ ছাড়াও কুর'আনে তিন জায়গায় (৪:১৪, ৩৩:৩৬ এবং ৭২:২৩) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করার ভয়াবহ পরিণতির বর্ণনা দেয়া হয়েছে। **আল -সালাফী** দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, নবীকে (সা.) অমান্য করার খারাপ পরিণতির কথা সুনির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ করে, কেবল তাঁকে মান্য করার আদেশের চেয়ে অধিকতর গুরুত্ব সহকারে বিষয়টা উপস্থাপন করা হয়েছে।[৩২] সেরকম একটি আয়াত হচ্ছে:

وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَإِنَّ لَهُۥ نَارَ جَهَنَّمَ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ﴿٢٣﴾

"... যারা আল্লাহ ও রাসূলকে অমান্য করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন যেখানে তারা চিরকাল বসবাস করবে। " (সূরা জ্বিন, ৭২:২৩)

কেউ চাইলে অবশ্য এমন আয়াত খুঁজে পাবেন যেখানে যারা রাসূলকে (সা.) অনুসরণ ও মেনে চলতে অস্বীকার করেছিল, তাদের দুর্দশা ও অনুতাপের সুনির্দিষ্ট বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِى ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَـٰلَيْتَنَآ أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا۠ ﴿٦٦﴾

---

[৩২]দেখুন: Page#34, *Al-Sunnah: Hujiyyatuhaa wa Makaanatuhaa fi-l-Islaam wa al-Raad ala Munkireehaa* - Muhammad Luqmaan al-Salaafi.

www.pathagar.com

"যেদিন তাদের মুখমন্ডল আগুনে ওলট-পালট করা হবে সেদিন তারা বলবে , হায় , আমরা যদি আল্লাহকে মানতাম ও রাসূলকে মানতাম!" (সূরা আহযাব , ৩৩:৬৬)

يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَعَصَوُا۟ ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ﴿٤٢﴾

"যারা কুফরী করেছে এবং রাসূলের অবাধ্য হয়েছে তারা সেদিন কামনা করবে যদি তারা মাটির সাথে মিশে যেত । আর তারা আল্লাহ্র কাছ থেকে কোন কথাই গোপন করতে পারবে না ।" (সূরা নিসা, ৪:৪২)

আল্লাহর রাসূলের(সা.) বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা অথবা কেবল তাঁর প্রতি অবাধ্যতার মনোবৃত্তি নিয়ে আলোচনা করাও নিষিদ্ধ এবং একটা পাপকর্ম বলে বিবেচিত । পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ্ বলেন:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا تَنَـٰجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَـٰجَوْا۟ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَـٰجَوْا۟ بِٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩﴾

"হে মু'মিনগণ। তোমরা যখন গোপন পরামর্শ কর, সেই পরামর্শ যেন পাপাচার, সীমালংঘন ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ সম্পর্কে না হয় । তোমরা কল্যাণকর কাজ ও তাকওয়া অবলম্বনের পরামর্শ কর ও আল্লাহকে ভয় কর যাঁর কাছে তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে ।" (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮:৯)

www.pathagar.com

উপরের সব কিছু দেখে মনে হয় যে, কেবলমাত্র একজন মুনাফিক্ব অথবা ত্রুটিযুক্ত অসুস্থ ঈমানসম্পন্ন কেউই শুধু আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) যা বলেছেন, আদেশ করেছেন বা প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। বাস্তবিকই আল্লাহ্‌ যা নাযিল করেছেন এবং রাসূল (সা.) যা উপস্থাপন করেছেন, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়াটাকে আল্লাহ্‌ নিজেই মুনাফিক্বের একটা বৈশিষ্ট্য বলে বর্ণনা করেন। সূরা নিসার ৬১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্‌ বলেন:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿٦١﴾

"তাদের যখন বলা হয় আল্লাহ্‌ যা নাযিল করেছেন তার দিকে এবং রাসূলের দিকে এসো - তখন আপনি মুনাফিক্বদের, বিরক্তিতে আপনার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে দেখবেন।" (সূরা নিসা, ৪:৬১)

আল্লাহ্‌র রাসূলের (সা.) কাছ থেকে যেসব আদেশ নিষেধ আসে, যারা অব্যাহত ভাবে সেগুলোর বিরুদ্ধাচারণ করে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র আরেকটি সতর্কবাণী দেখতে পাওয়া যায়:

فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾

"সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা সতর্ক হোক যে, তাদের উপর বিপর্যয় নেমে আসবে অথবা তাদের উপর মর্মন্তুদ শাস্তি নেমে আসবে।" (সূরা নূর, ২৪:৬৩)

www.pathagar.com

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা.) থেকে যেসব আদেশ-নিষেধ আসে, সেগুলো মেনে চলা যে অবশ্যকরণীয়, তার প্রমাণ হিসাবে ফিক্হশাস্ত্রবিদরা এই আয়াতটিকে নির্দেশ করেন বলে **আল-কুরতুবী** উল্লেখ করেছেন। এই আয়াতে আল্লাহ্ যে কেউ, যে তার নবীর আদেশ না মানার সিদ্ধান্ত নেয়, তাদের এই ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছেন যে, তাদের উপর শাস্তি নেমে আসবে।[৩৩] আরেকটি আয়াতে আল্লাহ্ বলেন :

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَـٰٓئِكَةِ أَنِّى مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا۟ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ سَأُلْقِى فِى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلرُّعْبَ فَٱضْرِبُوا۟ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱضْرِبُوا۟ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴿١٢﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُّوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ۚ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿١٣﴾

"স্মরণ কর তোমাদের প্রতিপালক ফেরেশতাদের প্রতি প্রত্যাদেশ করলেন, 'আমি তোমাদের সাথে আছি, সুতরাং মু'মিনদের অবিচলিত রাখ। যারা কুফুরী করে আমি তাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করবো। সুতরাং তোমরা আঘাত কর তাদের প্রত্যেক আঙ্গুলের অগ্রভাগে।' এটা এজন্য যে তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে এবং কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কিরোধিতা করলে আল্লাহ্ তো শাস্তিদানে কঠোর।" (সূরা আনফাল ,৮:১২-১৩)

---

[৩৩] দেখুনঃ Page#322, Vol.12, *Al-Jaami al-Ahkaam al-Qur'an* - Abu Abdullah al-Qurtubi.

www.pathagar.com

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

"কিন্তু না, তোমার রবের কসম, তারা ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাস করে না যতক্ষণ না তারা তাদের সকল বিবাদ - বিসংবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ না করে এবং তুমি যে সিদ্ধান্ত দাও, তার ব্যাপারে মনে কোন অসন্তোষ পোষণ না করে এবং তারা পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ না করে।" (সূরা নিসা, ৪:৬৫)

এই আয়াতের নাযিল হওয়ার উপলক্ষ অথবা অন্তত এমন একটা পরিস্থিতি যেটার বেলায় এই আয়াতটি স্পষ্টতই প্রযোজ্য, তা সহীহ বুখারীতে এভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছেঃ

আল হাররায় একটি প্রাকৃতিক পাহাড়ী ঝর্ণার ব্যাপারে আনসারদের একজনের সাথে আল-যুবায়েরের ঝগড়া হয়। নবী (সা.) বলেন, ***"হে যুবায়ের, তোমার জমিতে সেচ দাও এবং তারপর এই পানিকে তোমার প্রতিবেশীর কাছে বয়ে যেতে দাও।"*** ঐ আনসার বললেন, ***"হে আল্লাহর রাসূল (সা.), এটা কি এ জন্য যে, সে আপনার জ্ঞাতি ভাই?"*** এ অবস্থায় নবীর (সা.) চেহারা (রাগে) লাল হয়ে উঠল এবং তিনি বললেন, ***"হে যুবায়ের, তোমার জমিতে সেচ দাও এবং তারপর সেই পানিকে ধরে রাখ যতক্ষণ না তা তোমার দেয়াল সমান উঁচু হয়। তারপর সেটাকে তোমার প্রতিবেশীর কাছে বয়ে যেতে দাও।"*** সুতরাং ঐ আনসার তাঁকে রাগান্বিত করলে পরে নবী(সা.) আল-যুবায়েরকে তাঁর পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে দিলেন। এর আগে নবী (সা.) এমন একটা আদেশ দিয়েছিলেন যেটা তাদের দুজনের পক্ষেই

www.pathagar.com

গিয়েছিল। আল-যুবায়ের বলেন, *"আমার মনে হয় না যে এই আয়াত: 'কিন্তু না তোমার রবের ...' [উপরে উদ্ধৃত ৪:৬৫] এ ছাড়া অন্য কোন প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছিল।"*

আল-শাওকানী দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ রাসূল (সা.)-কে সকল কর্মকান্ডের সিদ্ধান্তদানকারী হিসাবে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার ঈমান পরিপূর্ণ হয় না। উপরের আয়াতে ব্যবহৃত **'হারাজ'** (حَرَجًا) শব্দটি (যার অনুবাদ হিসাবে **'অসন্তোষ'** শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে) কোন কোন সূত্র মতে নবী (সা.) যে কোন সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকলে, তার প্রতি সন্দেহ পোষণ করার কথা বুঝিয়েছে। অন্যরা বলেন যে এটার অর্থ হচ্ছে **"পাপ"** - নবীর সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে তাদের অন্তরে ইচ্ছা পোষণ করা থেকে সৃষ্ট পাপ। উপরের আয়াতের শেষ অংশ এই অর্থ বহন করে যে, আল্লাহর রাসূল (সা.) যা বলেছেন এবং আদেশ করেছেন, সে ব্যাপারে একজন সত্যিকার মুসলিমের কোন সন্দেহই থাকবে না এবং সে কোন রকম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, যুক্তি-তর্ক অথবা মিথ্যা অজুহাত ছাড়া তার কর্তৃত্ব মেনে নেবে এবং নিজেকে সমর্পণ করবে। মোট কথা, একজন মুসলিম সত্যিকার অর্থে ততক্ষণ পর্যন্ত নিজেকে মুসলিম বলে দাবী করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার অন্তরে রাসূল (সা.)-এঁর সিদ্ধান্তসমূহকে এবং তাঁর জীবনব্যবস্থা ও সুন্নাহকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করবে (বা মেনে নেবে)।[৩৪]

এখানে আর একটা ব্যাপারের প্রতি মনোযোগ দেয়া বাঞ্ছনীয়, সেটা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ এই আয়াতটি শপথ দিয়ে শুরু করেন। শপথ দিয়ে শুরু করাটা কুর'আনে বেশ দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু এই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে আল্লাহ নবী (সা.)- এঁর প্রভু বা রবের নামে শপথ করেন।

---

[৩৪] দেখুন: Page#483, Vol.1 *Fath al-Qadeer* - Muhammad ibn Ali al-Shaukaani.

www.pathagar.com

কুর'আনে প্রাপ্ত অন্যান্য শপথের চেয়ে এটা অনেক বড় এবং এই বড় মাপের শপথ এবং এই বড় শপথের পর আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের অবহিত করেন যে, রাসূল(সা.)-এঁর কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে মেনে নেয়াটা তাদের জন্য অপরিহার্য। এই আয়াতের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে **ইবনে কাসীর** রাসূল (সা.)-এঁর একটি হাদীস উদ্ধৃত করেন যা এই আয়াতটির বিষয়বস্তুর উপর আরো গুরুত্ব আরোপ করে। সেখানে তিনি বলেন, ***"তোমাদের কেউই ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার ইচ্ছাগুলো আমি যা নিয়ে এসেছি তার কাছে সমর্পিত হয়।"***[৩৫]

আল্লাহ্ আরো বলেন:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَـٰلًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

"আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে আদেশ দিলে, কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন কোন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।" (সূরা আহ্যাব, ৩৩:৩৬)

যদি আল্লাহ অথবা তাঁর রাসূল (সা.) কোন একটা বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন, তাহলে একজন বিশ্বাসীর জন্য তখন আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের (সা.) নির্ধারিত সিদ্ধান্তের কাছে নিজেকে সমর্পণ করা ছাড়া আর কোন পথ থাকে না ।

[৩৫] দেখুন: Page#339, *Tafseer al-Quran al-Adheemal-Maroof bi Tafseer ibn Katheer* - Ismaeel Ibn Katheer (এই হাদীসটি আলবানীর মতে যঈফ বা দুর্বল, ইমাম নববীর মতে হাসান)

www.pathagar.com

আল-সুয়ুতী উপরে উদ্ধৃত আয়াতটি নাযিলের উপলক্ষ বর্ণনা করেছেন:
কাতাদার বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূল (সা.) যায়েদকে (রা.) বললেন জয়নাবকে (রা.) বিয়ে করার জন্য - কিন্তু তিনি [জয়নাব(রা.)] খোদ নবী (সা.)-কেই বিয়ে করতে চাইলেন। সুতরাং তিনি নবীর পছন্দকে মেনে নিতে অস্বীকার করলেন। তখন এই আয়াতটি নাযিল হয় এবং তিনি তাতেই সন্তুষ্ট হন এবং নবীর (সা.) সিদ্ধান্তের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেন। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এই একই ঘটনা আরো দুটো সনদের মাধ্যমে জানা যায়।[৩৬]

এই আয়াত নাযিলের পিছনের কারণ বা ঘটনা যে এটাই ছিল, সেটা প্রতিষ্ঠিত করতে **ইবনে কাসীর** আরো কয়েকটি সূত্রের উদ্ধৃতি দেন। এসব বর্ণনা যদি শুদ্ধ হয়ে থাকে, তবে এই আয়াত সম্বন্ধে কিছু দৃষ্টি আকর্ষণী বিষয় উল্লেখযোগ্য। **প্রথমত**, এই আয়াতটি নবী (সা.)-এঁর একটি সিদ্ধান্তের সাথে সংশ্লিষ্ট। [জয়নবকে (রা.) বিয়ে করার এই আদেশ বা অনুরোধ জানানোর কথা বলে রাসূল (সা.)-কে উদ্দেশ্য করে কোন কুরআনিক আদেশ নাযিল হয়নি; তথাপি নবীর (সা.) সিদ্ধান্তকে আল্লাহ তাঁর ও তাঁর রাসূলের কাছ থেকে আসা সিদ্ধান্ত বলে বর্ণনা করেন: **"আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে আদেশ দিলে ....."** ।

এখান থেকে স্পষ্টতই প্রমাণিত হয় যে, নবীর (সা.) আদেশসমূহ তাঁর নিজস্ব নয় বরং আল্লাহ্ই তাঁকে সেসব অনুপ্রাণিত করেছেন। **দ্বিতীয়ত**, এবং আরো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এই আয়াতটি বিয়ে এবং অন্তরের ব্যক্তিগত আকাঙ্খা সংক্রান্ত বিষয়ে নাযিল হয়। এখানে

---

[৩৬] আল-তাবারানীতে কাতাদাহ থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত। কাতাদাহ যেহেতু সাহাবী ছিলেন না, সেহেতু হাদীস হিসেবে এর সনদ বিচ্ছিন্ন বলতে হবে। ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত সংস্করণেও কিছু দুর্বলতা রয়েছে। কারো কারো মতে এই আয়াত অন্য একজন মহিলার ব্যাপারে নাযিল হয়। সে যাই হোক, তাতে উদ্ধৃত এই হাদীস থেকে লব্ধ শিক্ষার কোন পরিবর্তন হয় না।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ বলেছেন যে, কাউকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আদেশের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করতে হবে। সুতরাং রাসূল (সা.)-এঁর প্রতি আমাদের আনুগত্য এমনকি আমাদের জীবনের একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারগুলোতেও অবশ্যই প্রস্ফুটিত হতে হবে।

আল্লাহ্ মানুষকে তাঁর নিজের ও তাঁর রাসূলের বিচারের কাছে নিজেকে সমর্পণ করার আহবান জানান । আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা.) যা আদেশ করেছেন অথবা যা সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, তার কাছে আত্মসমর্পণ না করা বা সেটা মেনে না নেওয়া হচ্ছে এক রোগাক্রান্ত অন্তরের উপসর্গ। আল্লাহ্ বলেন:

وَإِذَا دُعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ
﴿٤٨﴾ وَإِن يَكُن لَّهُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُوٓا۟ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿٤٩﴾ أَفِى قُلُوبِهِم
مَّرَضٌ أَمِ ٱرْتَابُوٓا۟ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُۥ ۚ بَلْ أُو۟لَٰٓئِكَ
هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٥٠﴾ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ
وَرَسُولِهِۦ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا۟ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ
هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقْهِ
فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ ﴿٥٢﴾

"এবং যখন তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবার জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহবান করা হয়, তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়, আর যদি [তাতে] তাদের প্রাপ্য [কিছু] থাকে তাহলে তারা বিনীতভাবে রাসূলের কাছে ছুটে আসে। তাদের অন্তরে কি ব্যাধি

www.pathagar.com

আছে, না তারা সংশয় পোষণ করে , না তারা ভয় করে যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তাদের প্রতি জুলুম করবেন? বরং তারাই তো জালিম। মু'মিনদের উক্তি তো এরকম যে - যখন তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেওয়ার জন্য তাদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয়, তখন তারা বলে, 'আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম' আর তারাই তো সফলকাম। যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে তাঁর অবাধ্যতা থেকে সাবধান থাকে - তারাই সফলকাম।" (সূরা নূর , ২৪: ৪৮-৫২)

সূরা হাশরের সাত নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ বলেন:

وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۝٧

"রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা তোমরা গ্রহণ কর আর যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তো শাস্তিদানে কঠোর।" (সূরা হাশর, ৫৯:৭)

এই আয়াতটি সুনির্দিষ্ট ভাবে যুদ্ধের গনিমতের মালের কারণে নাযিল হয়েছিল । অন্য কথায়, *"গনিমতের মাল থেকে রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর এবং যা দেন না তা থেকে দূরে থাক"।* কোন 'আলেমই এব্যাপারে তর্ক জুড়ে দেননি যে, আয়াতটি যুদ্ধের গনিমতের মালের বেলায়ই প্রযোজ্য। **ইবন জুরায়েয** বলেন যে, এর অর্থটা বরং সাধারণ - রাসূল (সা.) যা তোমাদের আদেশ করেন তা অবশ্যই করতে হবে, তিনি তোমাদের জন্য যা নিষেধ করেন তা অবশ্যই এড়িয়ে চলতে হবে। **আল-শাওকানী** বলেন যে, এই আয়াতের কথাগুলো সাধারণভাবে প্রযোজ্য এবং আয়াত নাযিলের পিছনের ঘটনা আয়াতের অর্থকে সীমাবদ্ধ করে দেয় না। তিনি বলেন যে, এই

www.pathagar.com

আয়াত সাধারণভাবে প্রযোজ্য এবং নবী (সা.)-এঁর কাছ থেকে আসা সকল নিয়ম, আদেশ বা নিষেধের বেলায় তা প্রযোজ্য। [৩৭]

এই আয়াতে, **"এবং আল্লাহকে ভয় কর"** এই সাবধানবাণী উচ্চারিত হয়েছে যারা নবী কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখাকে সম্মান দেখায় না তাদের জন্য। **"আল্লাহতো শাস্তিদানে কঠোর"** - এই কথা দ্বারা আয়াতটির সমাপ্তি ঘটে। **শাওয়াত** বলেন যে, এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল (সা.) যা বলেন, তা যে মানে না, সে কাফির হয়ে যায়, কেননা এ ধরনের শাস্তির হুমকি কেবল মাত্র কাফিরের জন্যই হতে পারে। [৩৮]

রাসূল (সা.) কে অনুসরণ করাটা আল্লাহর ভালবাসা, সত্যিকার জীবন ও হেদায়েতের চাবিকাঠি

কুর'আনের আরেকটি আয়াতের বক্তব্য হচ্ছে:

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣١﴾

"বল, 'তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে ভালবাস, তবে আমাকে অনুসরণ কর। আল্লাহ্ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন'।" (সূরা আলে ইমরান,৩:৩১)।

যে সত্যি সত্যি আল্লাহকে ভালবাসে, সে এমন কর্মকান্ডের খোঁজ করবে যেগুলোর জন্য আল্লাহ তাকে ভালবাসবেন। এই আয়াত

---

[৩৭] দেখুন: Page#198, Vol.5, *Fath al-Qadeer* - Muhammad ibn Ali al-Shaukaani.
[৩৮] দেখুন: Page#283, *Hujiyyat al-Sunnah* - Al-Hussain Shawaat

www.pathagar.com

অনুযায়ী আল্লাহ্‌র ভালবাসা পেতে হলে, কাউকে কেবল রাসূল (সা.)-এঁর অনুসরণ এবং আনুগত্য করতে হবে। এবং তাহলেই আল্লাহ্‌ তাকে ভালবাসবেন এবং তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবেন।

আল শাওকানী লিখেছেন যে, "*আল্লাহকে ভালবাসা" এই কথাটার নিহিতার্থ হচ্ছে পরিপূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করার এবং আল্লাহ্‌ আদেশ করেন এমন যা কিছু তা করার আকাঙ্খা। এই পর্যায়ে তিনি আল-আজহারীর উদ্ধৃতি দেন যিনি বলেছেন: "একজন মানুষ কর্তৃক আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলকে(সা.) ভালবাসার অর্থ হচ্ছে যে, সে পূর্ণরূপে উভয়ের আনুগত্য করে এবং তার কর্মকান্ডে তাঁদের মেনে চলে।"*[৩৯]

এই প্রসঙ্গে ইবনে কাসীর আরো উল্লেখ করেন যে, *এই আয়াত এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে যে, যে কেউ দাবী করে যে সে আল্লাহ্‌কে ভালবাসে, অথচ রাসূল (সা.)-কে মেনে চলতে বা অনুসরণ করতে অস্বীকার করে - সে আসলে একজন মিথ্যুক।*[৪০]

কুর'আনে এমন আয়াতও দেখতে পাওয়া যায় যেখানে আল্লাহ্‌ বলেন:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱسْتَجِيبُوا۟ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

"হে মু'মিনগণ! রাসূল যখন তোমাদের এমন কিছুর দিকে আহবান করেন, যা তোমাদের জীবন দান করে, তখন আল্লাহ ও রাসূলের আহবানে সাড়া দাও .... ।" (সূরা আনফাল , ৮:২৪)

---

[৩৯] দেখুন: Page#338, Vol.1, *Fath al-Qadeer* - Muhammad ibn Ali al-Shaukaani.
[৪০] দেখুন: Page#236, *Tafseer al-Quran al-Adheemal-Maroof bi Tafseer ibn Katheer* - Ismaeel Ibn Katheer

www.pathagar.com

আল শাওকানী ব্যাখ্যা করেন যে, 'সাড়া দাও ' বলতে এখানে আল্লাহ ও রাসূল(সা.) যখন কোন আদেশ করেন তখন সেটা 'মেনে চলার' কথা বোঝানো হয়েছে। কুর'আন ও সুন্নাহর মাঝে ধারণকৃত শরীয়াহ হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা.) আহবান [আদেশ অথবা নিষেধ]। শরীয়াহ্ই এই পার্থিব অস্তিত্বকে একটা সত্যিকার অর্থ ও সত্যিকার জীবন দিয়ে থাকে। এই ডাকের প্রতি সাড়া না দেয়া এবং একে অবজ্ঞা করা হচ্ছে, আসলে, এক ধরনের মৃত্যু। **আল শাওকানী** দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, এই আয়াত এই ব্যাপারটা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের (সা.) পক্ষ থেকে সে যে আদেশই (অর্থাৎ আহবান) শুনতে পাক না কেন, প্রতিটি মুসলিমের জন্য সেটা মেনে চলাটা অবশ্যকরণীয় – যদিও বা সেই আদেশ তার নিজের আকাঙ্খা, মতামত অথবা জনপ্রিয় প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে যায়। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের (সা.) প্রতি যে কেউ কিভাবে সাড়া দেবে তা বুখারী কর্তৃক লিপিবদ্ধ আবু সাঈদ ইবন মুআল্লার গল্পে দেখতে পাওয়া যায়। আবু সাঈদ যখন সালাত আদায় করছিলেন তখন নবী (সা.) তাঁকে ডেকেছিলেন, কিন্তু তিনি সালাত সমাপ্ত না করা পর্যন্ত সেই ডাকে সাড়া দেননি। শেষ পর্যন্ত তিনি যখন নবীর (সা.) কাছে এলেন, তখন আল্লাহর রাসূল (সা.) উপরোক্ত আয়াতটি তাকে পড়ে শোনালেন এটা বুঝাতে যে, নবীর (সা.) আহবানে তার প্রতিক্রিয়া সঠিক ছিল না।[৪১]

উপরন্তু সত্যিকার অর্থে নবীর (সা.) উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁকে অনুসরণ করেই কেবল কেউ হিদায়াত লাভ করতে পারে। নীচের আয়াতে আল্লাহ্ তা স্পষ্ট করে দেন:

---

[৪১] দেখুন: Page#299-300, Vol.2, *Fath al-Qadeer* - Muhammad ibn Ali al-Shaukaani.

www.pathagar.com

قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِى لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ ۖ فَـَٔامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِىِّ ٱلْأُمِّىِّ ٱلَّذِى يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَـٰتِهِۦ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٨﴾

"বল, 'হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূল যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী: তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই। তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান। সুতরাং, তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ্‌র প্রতি ও বার্তাবাহক উম্মী নবীর প্রতি - যে আল্লাহ ও তাঁর বাণীতে ঈমান আনে এবং তোমরা তাঁকে অনুসরণ কর যাতে তোমরা সঠিক পথ পেতে পার।' "(সূরা আ'রাফ, ৭:১৫৮)

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে এই যে, এই আয়াতে কেন নবীর অনুসরণ করতে হবে তার একটা ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তাঁকে উম্মী নবী বলে সম্বোধন করেন। অন্য কথায় তিনি যে চমৎকার পথনির্দেশনা মানুষের কাছে উপস্থাপন করেছেন, তা তাঁর নিজের পড়াশুনা বা গবেষণালব্ধ নয়। বরং তা কেবলি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে ওহীর মাধ্যমে তাঁর কাছে এসে থাকতে পারে।

কৌশল (হিকমাহ্/হিকমত) নাযিল হওয়া

আল্লাহ্ বলেছেন:

لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٤﴾

www.pathagar.com

"আল্লাহ্ মু'মিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের নিজেদের মধ্য থেকে তাদের কাছে রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাঁর আয়াতসমূহ তাদের কাছে তিলাওয়াত করেন, তাদের পরিশুদ্ধ করেন এবং [তাদের] কিতাব ও হিকমাহ্[৪২] শিক্ষা দেন, যদিও তারা ইতিপূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিল।" (সূরা আলে ইমরান, ৩:১৬৪)

এটা অত্যন্ত সুন্দর একটি আয়াত, যা থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বেরিয়ে আসে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এখানে আমরা এ নিয়ে খুব বেশী আলোচনা করতে পারব না। এই আয়াতে একটা গুরুত্বপূর্ণ অভিব্যক্তি হচ্ছে **'তিনি তাদের কিতাব ও হিকমাহ্ শিক্ষা দেন'**। ***কুর'আনের অতিরিক্ত নবীর কাছে আর কি নাযিল করা হয়েছিল ?*** আল্লাহ্ বলেন:

وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿١١٣﴾

"... আল্লাহ্ আপনার প্রতি কিতাব ও হিকমত অবতীর্ণ করেছেন এবং আপনি যা জানতেন না তা আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন, আপনার প্রতি আল্লাহর মহা অনুগ্রহ রয়েছে।" (সূরা নিসা ৪:১১৩)

আল্লাহ্ আরো বলেন :

---

[৪২] হিকমাহ্ শব্দের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে প্রজ্ঞা। কিন্তু এই আয়াতসমূহে হিকমাহ্ বলতে কুর'আনের সাথে সাথে আর যা কিছু নাযিল করা হয়েছে - তা বোঝানো হচ্ছে। এখানে নবীর (সা.) সুন্নাহ্র কথা বলা হয়েছে বলে মনে করা হয় - আর তাই এটাকে অনুবাদ না করে "হিকমাহ্"ই রেখে দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِتَـٰبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

"... এবং মনে করে দেখ তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নিয়ামত ও কিতাব এবং হিকমত যা [তিনি] তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন, যা দ্বারা তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে জ্ঞানী।" (সূরা বাকারা , ২:২৩১)

আল-সালাফী দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, পবিত্র কুর'আনে হিকমত(হিকমাহ্) শব্দটি কখনোই কিতাব বোঝাতে ব্যবহার করা হয় না এবং কিতাব শব্দটিকেও কখনো হিকমত বোঝাতে ব্যবহার করা হয় না। এই দুটো শব্দ সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটো অভিব্যক্তি।[৪৩] উপরন্তু এই আয়াতগুলো থেকে যে প্রশ্নটা সরাসরি উঠে আসে সেটা হচ্ছে: নবীর (সা.) কাছে আর কি নাযিল হয়েছিল? **এর উত্তরে কেবলমাত্র বলা যেতে পারে যে, তা হচ্ছে সুন্নাহ**। এটা বিশ্বাসীদের উপর আল্লাহর রহমতের একটা অংশ যে, নবী (সা.) তাদের কিতাব (অর্থাৎ কুর'আন) এবং হিকমত (অর্থাৎ সুন্নাহ্) দুটোই শিক্ষা দিয়েছিলেন ।

সুন্নাহর অবস্থান/মর্যাদা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে **ইমাম শাফি'ঈ** নিম্নলিখিত আয়াতগুলোর উদ্ধৃতি দেন :

رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ .... ﴿١٢٩﴾

---

[৪৩] দেখুন: Page#53, *Al-Sunnah: Hujiyyatuhaa wa Makaanatuhaa fi-l-Islaam wa al-Raad ala Munkireehaa* - Muhammad Luqmaan al-Salaafi

www.pathagar.com

"(ইব্রাহিম বললেন) হে আমাদের প্রতিপালক ! তাদের মাঝ থেকে তাদের কাছে এক রাসূল প্রেরণ করুন যে আপনার আয়াতসমূহ তাদের কাছে তিলাওয়াত করবে, তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবে এবং তাদেরকে পবিত্র করবে ... ।" (সূরা বাকারা , ২:১২৯)

"যেমন আমরা তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের কাছে রাসূল প্রেরণ করেছি, যে আমাদের আয়াতসমূহ তোমাদের কাছে তিলাওয়াত করে, তোমাদেরকে পবিত্র করে এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয় এবং তোমাদের শিক্ষা দেয় এমন কিছু যা তোমরা জানতে না ।"(সূরা বাকারা, ২:১৫১)

هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِّيِّـۧنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٢﴾

"তিনি উম্মীদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়ে ছিলেন যে তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ আবৃত্তি করে; তাদেরকে পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমত; ইতিপূর্বে তো এরা ঘোর বিভ্রান্তিতে ছিল ।" (সূরা জুমুআ, ৬২:২)

وَٱذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِى بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكْمَةِ ... ﴿٣٤﴾

"আল্লাহর আয়াত ও হিকমতের কথা যা তোমাদের ঘরে পাঠ করা হয় তা তোমরা স্মরণ রাখবে .... ।" (সূরা আহযাব, ৩৩:৩৪)

এইসব আয়াত উদ্ধৃতি করার পর **ইমাম শাফি'ঈ** বলেন :

"সুতরাং আল্লাহ্ তাঁর কিতাবের কথা – যা কিনা কুর'আন – এবং হিকমাহ্‌র কথা বলেছেন এবং আমি কুর'আনের ব্যাপারে যাঁরা বিশেষজ্ঞ – যাঁদের আমি অনুমোদন করি – তাঁদের সম্বন্ধে শুনেছি যে, তাঁরা হিকমাহ বলতে আল্লাহর রাসূলের (সা.) সুন্নাহ বোঝেন। আল্লাহ নিজে যেমনটা বলেছেন এটা তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ; কিন্তু আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন! কেননা প্রথমে কুর'আনের কথা বলে তারপর হিকমাহ্‌র কথা বলা হয়েছে, তারপর আল্লাহ বলেছেন যে, মানুষকে কুর'আন ও হিকমাহ্ শিক্ষা দিয়ে আল্লাহ তাদের উপর তাঁর রহমত বর্ষণ করেছেন। তাই আল্লাহর রাসূলের (সা.) সুন্নাহ ছাড়া এখানে হিকমাহ্‌কে আর কোন কিছু বলে অভিহিত করাটা অনুমোদিত নয়। কেননা, এটা (হিকমাহ্) আল্লাহর কিতাবের সাথে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট এবং তাঁর রাসূলকে (সা.) মানার দায়িত্ব আল্লাহ মানুষের উপর অর্পণ করেছেন এবং রাসূলের (সা.) আদেশসমূহ মেনে চলাকে তাদের জন্য অবশ্যকরণীয় বলে নির্ধারণ করেছেন। তাই কুর'আন এবং তাঁর রাসূলের(সা.) সুন্নাহ কর্তৃক নির্ধারিত বিষয়গুলি ছাড়া আর কোন কিছুকে কর্তব্য বলে বিবেচনা করাটা বৈধ নয়। কেননা আমরা মাত্র যেমনটা বললাম - তাঁর রাসূলের (সা.) উপর বিশ্বাস যে তাঁর উপর বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত তা আল্লাহ্ নির্ধারণ করে দিয়েছেন।"[৮৮]

নবীর প্রতি সঠিক আদবের আদেশ তাঁর অবস্থান ও কর্তৃত্বের ইঙ্গিত দেয়

সূরা হুজুরাতে আল্লাহ্ বলেন :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُقَدِّمُوا۟ بَيْنَ يَدَىِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ
إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١﴾ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَرْفَعُوٓا۟ أَصْوَٰتَكُمْ فَوْقَ

[৮৮] দেখুন: Page#111-112, *Islamic Jurisprudence: Shafi'i's Risala* - Majid Khadduri.

www.pathagar.com

صَوْتِ ٱلنَّبِىِّ وَلَا تَجْهَرُوا۟ لَهُۥ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَٰلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٢﴾

"হে মু'মিনগণ, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সামনে তোমরা কোন বিষয়ে অগ্রণী হয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ সর্বশ্রোতা,সর্বজ্ঞ। হে মু'মিনগণ, তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বলো, তার সাথে সেভাবে উচ্চস্বরে কথা বলো না; কারণ তাতে তোমাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে।" (সূরা হুজুরাত , ৪৯:১-২)

আল কুরতুবী এই আয়াতগুলোর ব্যাখ্যায় বলেন:

"আল্লাহ্‌র উপস্থিতি অথবা তাঁর রাসূলের (সা.) বক্তব্য ও তাঁর ঐ সমস্ত কার্যকলাপসমূহ - তোমাদের দ্বীন ও তোমাদের পার্থিব জীবনের ব্যাপারে যেগুলো তোমাদের জন্য অনুসরণীয় - এ সবের বিপরীতে তোমরা তোমাদের বক্তব্য অথবা কর্মকান্ড উপস্থিত করো না। রাসূল (সা.) যেহেতু কেবল আল্লাহ যা আদেশ করেছেন, তাই আদেশ করে থাকেন – সেহেতু, যে কেউ যখন আল্লাহ্‌র রাসূলের (সা.) কথা অথবা কাজের উপর নিজের কথা ও কাজকে অগ্রাধিকার দেয়, সে আসলে আল্লাহর কথার উপরই নিজের প্রাধান্য দেয়।"[৪৫]

উপরোক্ত আয়াত দুটোর শেষাংশে যা বলা হচ্ছে, তা হচ্ছে এই যে, কেউ কেবল নবীর (সা.) স্বরের চেয়ে উচ্চতর স্বরে কথা বললেই তার আমলসমূহ বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। কেউ কেবল নবীর (সা.) কণ্ঠস্বরের চেয়ে উচ্চস্বরে কথা বললেই যদি এই পরিণতি হয়, তাহলে

---

[৪৫] দেখুন: Page#300, Vol.16, *Al-Jaami al-Ahkaam al-Qur'an* - Abu Abdullah al-Qurtubi.

www.pathagar.com

যে নবীর (সা.) কথা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাঁর আদেশ মেনে চলাকে অস্বীকার করে অথবা নবীর (সা.) কোন বক্তব্যের উপর নিজের মতামত ব্যক্ত করে, তার অবস্থা তাহলে কি হতে পারে ?

আরেকটি আয়াতে আল্লাহ্ বলেন:

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَإِذَا كَانُوا۟ مَعَهُۥ عَلَىٰٓ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا۟ حَتَّىٰ يَسْتَـْٔذِنُوهُ ... ﴿٦٢﴾

"মু'মিন তো তারাই যারা আল্লাহ্‌য় এবং তাঁর রাসূলে ঈমান আনে এবং রাসূলের সঙ্গে সমষ্টিগত ব্যাপারে একত্র হলে তাঁর অনুমতি ছাড়া সরে পড়ে না," (সূরা নূর , ২৪:৬২)

এই আয়াতের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে **ইবনুল কাইয়্যিম** বলেন:

"আল্লাহ [মু'মিনদের জন্য] এটা ঈমানের শর্ত করে দিয়েছেন যে, তারা যদি তাঁর সাথে থাকে, তবে তাঁর অনুমতি ছাড়া প্রস্থান করবে না। সুতরাং প্রথমে এবং সর্বাগ্রে করণীয় হচ্ছে যে, তারা তাঁর অনুমতি ছাড়া অন্য কোন বক্তব্য বা দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করবে না - আর কিসে তাঁর অনুমতি রয়েছে, তা তিনি যে শিক্ষা নিয়ে এসেছেন তা থেকেই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি যা শিক্ষা দিয়েছেন, তার সাথে যদি কোন কিছু সঙ্গতিপূর্ণ হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে তাতে তাঁর অনুমোদন রয়েছে।"[৪৬]

---

[৪৬] দেখুন: Page#51-52, Vol.1, *Ilaam al-Muwaqqieen an Rabb al-Alameen* - Muhammad Ibn al-Qayyim.

www.pathagar.com

আল্লাহর তরফ থেকে নবীর জন্য দিকনির্দেশনা

নবীর (সা.) সুন্নাহকে কুর'আনে যে হিকমাহ্ বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং তাও যে এক ধরনের ওহী - তা আমরা ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছি। রাসূল (সা.) কুর'আন ছাড়াও যে আল্লাহর কাছ থেকে ওহী ও দিকনির্দেশনা লাভ করতেন সে ব্যাপারে খোদ কুর'আনেই বহু প্রমাণ রয়েছে। তাঁর জন্য সেই দিকনির্দেশনা মেনে চলাটা অবশ্যকরণীয় ছিল এবং তিনি তাঁর অনুসারীদের কাছে সেগুলো পৌঁছে দিয়ে গেছেন । উদাহরণস্বরূপ আল্লাহ্ বলেন:

وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِى كُنتَ عَلَيْهَآ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَٰنَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٣﴾ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى ٱلسَّمَآءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ

" ...আপনি এযাবৎ যে কিবলা অনুসরণ করছিলেন, সেটাকে আমরা এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যেন কে রাসূলকে অনুসরণ করে এবং কে ফিরে যায় তা পরীক্ষা করা যায়। আল্লাহ্ যাদের সৎপথে পরিচালিত করেছেন তারা ছাড়া অন্যদের জন্য এটা (এই পরিবর্তন) নিশ্চয়ই কঠিন। আল্লাহ্ কখনোই তোমাদের ঈমানকে (অর্থাৎ তোমাদের সালাত) ব্যর্থ করে দিবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি দয়ায় পরিপূর্ণ, পরম দয়ালু। আকাশের দিকে আপনার বার বার তাকানোকে আমরা লক্ষ্য করি; সুতরাং আপনাকে অবশ্যই এমন কিবলার দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি যা আপনি পছন্দ করেন। অতএব আপনি মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরান... "(সূরা বাক্বারা , ২:১৪৩-৪৪)

www.pathagar.com

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে মক্কার দিকে কিবলা পরিবর্তনের পূর্বে জেরুজালেমের দিকে মুখ করে সালাত আদায়কারীদের কথা বলা হচ্ছে । এখানে আল্লাহ্ স্পষ্টই বলে দিচ্ছেন যে, সালাত আদায় করার পূর্ববর্তী দিকটিও (কিবলা) তিনিই নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। অথচ নবীর প্রতি জেরুজালেমের দিকে মুখ করে দাঁড়ানোর ওহী বা আদেশ কুর'আনের কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। সুতরাং নবী (সা.) আল্লাহর কাছ থেকে আরেক ধরনের ওহী লাভ করতেন, যার মাধ্যমে প্রাপ্ত বিধিনিষেধ, তাঁর এবং তাঁর অনুসারীদের জন্য মেনে চলা বাধ্যতামূলক ছিল। [৪৭]

সুন্নাহ যে আল্লাহ্র কাছ থেকে প্রাপ্ত বিষয়, তার প্রমাণ হিসেবে যেসব আয়াত উদ্ধৃত করা হয় তার ভিতর রয়েছে:

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴿٢﴾ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾

"তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্ত নয়, বিপথগামীও নয় এবং সে মনগড়া কথাও বলে না। এটা তো ওহী যা তার প্রতি নাযিল করা হয়।" (সূরা নাজম, ৫৩:২-৪)

যাহোক, **জামাল জারাবোযো** এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত না যে, সূরা নাজমের উপরোক্ত আয়াতগুলো সুন্নাহর গুরুত্ব বোঝাতে উপস্থাপন করা যাবে, কেননা আয়াতগুলো নবী (সা.) যা বলেছেন, তার সবকিছুর কথাই বলে নাকি কেবল কুর'আনের কথা বলে এ নিয়ে দ্বিমত রয়েছে। সূরা নাজমের এ আয়াতগুলো সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আল সাদী বলেন: *"সুন্নাহ যে আল্লাহ্র তরফ থেকে তাঁর রাসূলের*

---

[৪৭] দেখুন: Page#23-29, *The Authority of Sunnah* - Muhammad Taqi Usmani.

www.pathagar.com

(সা.) প্রতি নাযিল হয়েছে, এ আয়াত সেটাই নির্দেশ করে ।..... এবং আল্লাহ্ ও তাঁর আইন সম্বন্ধে তিনি যা বলেন, সে ব্যাপারে তাঁকে (ভুল করা থেকে) সুরক্ষা করা হয় - কেননা তাঁর কথাগুলো তাঁর ইচ্ছাপ্রসূত নয় বরং তাঁর কাছে যা নাযিল করা হয় তা থেকে উদ্ভূত ।" **আল-সাদী**, যার কুর'আনের তাফসীর সংক্ষিপ্ত – তিনি কখনো উল্লেখ করেন নি যে, অন্যান্য স্কলাররা এই ব্যাখ্যার সাথে একমত নন । **আল কাসিমী** দুটো মতের কথাই উল্লেখ করেন । (ক) উপরোক্ত আয়াতে "এটা তো ওহী ...." অংশে 'এটা' শব্দটা দিয়ে কেবল কুর'আনের কথা বোঝানো হয়েছে, এই মত এবং (খ) এটা বলে নবী (সা.) যা কিছু বলেছেন তার সব কিছু বোঝানো হয়েছে, এই মত – তিনি দুটোর কথাই উল্লেখ করেন । উপসংহারে তিনি বলেন যে, 'এটা' শব্দ দ্বারা যে কেবল কুর'আনের কথা বোঝানো হয়েছে এই মতটাই বেশী শক্তিশালী : *"এখানে যা সম্বন্ধে বলা হচ্ছে, তা হচ্ছে কুর'আন, যা পটভূমি থেকে বোঝা যায় । কেননা যে সমস্ত লোকজন (রিসালাত) অস্বীকার করছিল, তারা কুর'আন অস্বীকার করছিল"*। এ বিষয়ে **আল- রাজীর** আলোচনাই সবচেয়ে বিস্তারিত এবং তিনিও এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, এই আয়াতে কুর'আনের কথাই বলা হয়েছে । [৪৮] এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে যে, সুন্নাহও যে আল্লাহর কাছ থেকে অনুপ্রাণিত তা প্রমাণ করতে শেষোক্ত এ আয়াত দুটো অপরিহার্য নয়, পূর্বে উল্লেখিত হিকমাহ্ নাযিল হওয়া সংক্রান্ত আয়াতগুলোই ব্যাপারটা প্রমাণ করতে যথেষ্ট ।

---

[৪৮] দেখুন: Page#204, Vol.7, *Taiseer al-Kareem al-Rahman fi Tafseer Kalaam al-Mannan* - Abdur Rahman al-Saadi.

www.pathagar.com

নবী (সা.)-এঁর সুন্নাহ অনুসরণ করার গুরুত্বকে আল্লাহ্ বিভিন্ন উপায়ে স্পষ্টতই প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং তার উপর জোর দিয়েছেন। রাসূল(সা.)-এঁর আনুগত্যের আদেশ এবং তাঁর অনানুগত্যকে নিষেধ করে আল্লাহ তা করেছেন। রাসূল(সা.)-কে মেনে চলার প্রতিফল সম্বন্ধে সুসংবাদ ঘোষণা করে এবং নবীর (সা.) প্রতি অবাধ্যতার ফলাফল সম্বন্ধে সর্তক করে দিয়েও আল্লাহ্ তা পরিস্কার করে দিয়েছেন।

এ বিষয়ে নবী (সা.)-এঁর কিছু হাদীস সম্বন্ধে আলোচনার পর্যায়ে যাবার আগেই যে কারো উচিত উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে কি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল তা লিপিবদ্ধ করা। কেবলমাত্র কুর'আনের আয়াতের উপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি :

ক) স্বয়ং আল্লাহ মুসলিমদের আদেশ করেছেন নবীকে (সা.) অনুসরণ করতে এবং মেনে চলতে। এ ব্যাপারটা পরবর্তী সময়ের ফিক্হশাস্ত্রবিদদের নব্য আবিষ্কার যেমন নয়, তেমনি তা নিয়ে বিতর্ক বা মতামত প্রকাশের অবকাশ নেই।

খ)কেউ যদি এই দাবী করে যে, সে কুর'আন মেনে চলে তাহলে তাকে অবশ্যই নবী (সা.)-এঁর সুন্নাহ্ অনুসরণ করতে হবে, কেননা খোদ কুর'আনই নবী (সা.)-কে অনুসরণ করার ব্যাপারে মুসলিমদের আদেশ করে। সুতরাং সুন্নাহ্ অনুসরণ করার বাধ্য-বাধকতা অস্বীকার করে কুর'আন অনুসরণ করার দাবী করাটা অসঙ্গতিপূর্ণ।

গ) রাসূল (সা.)-কে অনুসরণ করাটা কেউ অস্বীকার করলে তার বিরুদ্ধে আল্লাহ্ কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন, অপরপক্ষে যারা

www.pathagar.com

নবীর (সা.) পথ অনুসরণ করে - তাদের বেলায় আল্লাহ হেদায়েত, করুণা ও ক্ষমার অঙ্গীকার করেছেন।

সুন্নাহর গুরুত্বের বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে যে সমস্ত আয়াত ব্যবহার করা হয়

কুর'আনের আলোকে সুন্নাহ্‌র গুরুত্বের উপর এই আলোচনার উপসংহার বর্ণনার আগে সুন্নাহর গুরুত্ব ও মর্যাদার বিপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করতে গিয়ে কুর'আনের যে সমস্ত আয়াত উদ্ধৃত হয়ে থাকে, সেগুলো নিয়ে আলোচনা করাটা প্রয়োজন। উপরে আমরা যে আলোচনা করেছি তা থেকে পাঠকের কাছে কুর'আনের বহু আয়াত দ্বারা সুন্নাহর মর্যাদা নিশ্চিতভাবেই প্রতিষ্ঠিত। ঐ সমস্ত আয়াতের মুকাবিলায় সুন্নাহর গুরুত্ব খর্ব করতে চাইলে উদ্ধৃত আয়াতগুলো অন্ততপক্ষে ঐ আয়াতগুলোর মতই সুনির্দিষ্ট হতে হবে [অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট ভাবে] সেগুলোকে সুন্নাহর বিরোধিতা করতে হবে।] উপরে উদ্ধৃত আয়াতগুলো যা প্রতিষ্ঠিত করেছে তা অস্বীকার করতে গিয়ে কিছু আয়াতের ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই যথেষ্ট হবে না। যারা সুন্নাহর বিরোধিতা করেন তারা সুন্নাহর বিরুদ্ধাচরণ করে কুর'আনের কোন সুনির্দিষ্ট বা স্পষ্ট আয়াত উপস্থাপন করতে পারেন না। তার পরিবর্তে বরং তারা এমন দু'একটি আয়াতের শরণাপন্ন হন যেগুলোকে সম্ভবত তাদের অবস্থান সমর্থন করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। তারা কেবল যে সমস্ত আয়াতগুলোকে ব্যবহার করতে পারেন সেগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ:

مَّا فَرَّطْنَا فِى ٱلْكِتَـٰبِ مِن شَىْءٍ ... ﴿٣٨﴾

" ..কিতাবে আমরা কোন কিছুই বাদ দিই নি ...." (সূরা আল আন'আম, ৬:৩৮)

www.pathagar.com

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ تِبْيَٰنًا لِّكُلِّ شَىْءٍ

"...আমরা তোমার কাছে সবকিছু ব্যাখ্যা করে একখানি কিতাব নাযিল করেছি....." (সূরা নাহল, ১৬:৮৯)

এই আয়াতগুলো থেকে যে যুক্তি উত্থাপন করা হয়, সেটা হচ্ছে এই যে, খোদ কুর'আনেই সকল প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ধারণকৃত রয়েছে। সত্যি বলতে কি সবকিছুই স্পষ্টভাবে ও বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করা রয়েছে। অন্য কোন সূত্রের শরণাপন্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ এর অর্থ দাঁড়াবে এই যে, কুর'আনে কোন কিছুর অভাব রয়েছে – আর সেক্ষেত্রে এই আয়াতগুলো যা বলছে তার বিরোধিতা করা হবে। সুতরাং কুর'আনের বাইরে যে কোন কিছুই তাহলে বাহুল্য - মুসলিমদের দ্বারা যা অনুসরণ করার কথা নয়, আর নিশ্চিতই যা ইসলামী আইনের কোন ভিত্তি হতে পারে না।

এ ধরনের যুক্তির জবাব বেশ সোজাসাপটা। উদাহরণস্বরূপ সূরা আল-আন'আমের যে আয়াতটি উদ্ধৃত করা হয়েছে সে আয়াতটি সম্পূর্ণ পড়া উচিত। সম্পূর্ণ আয়াতে বলা হচ্ছে :

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا طَٰٓئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِى ٱلْكِتَٰبِ مِن شَىْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾

"ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন কোন জীব নেই, অথবা, নিজ ডানার সাহায্যে উড়ে এমন কোন পাখি নেই যারা কিনা তোমাদের মত একটি সম্প্রদায়ভুক্ত নয়; কিতাবে আমরা কোনকিছুই বাদ দিই নি। অতঃপর নিজ প্রতিপালকের সামনে তাদের সকলকে একত্র করা হবে।" (সূরা আল আন'আম, ৬:৩৮)

www.pathagar.com

এই আয়াতের একটি ব্যাখ্যা হচ্ছে এ রকম যে, আয়াতে উল্লিখিত **'কিতাব'** কথাটা কুর'আন বোঝাতে বলা হয়নি, বরং শেষবিচারের দিন পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে, তা যে সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ রয়েছে, এখানে তার কথা বলা হয়েছে।[৪৯] অন্যভাবে বলতে গেলে - ঐ ফলকে সকল সৃষ্টির আয়ু এবং রিজিক সংক্রান্ত সকল তথ্য লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং কিছুই তা থেকে বাদ পড়ে নি। এই তাফসীর অনুযায়ী এই আয়াতের অর্থ নিম্নলিখিত আয়াতের খুব কাছাকাছি দাঁড়ায়।

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِى كِتَـٰبٍ مُّبِينٍ ۝٦

"ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর। তিনিই তাদের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত; সুস্পষ্ট কিতাবে সবকিছুই আছে।" (সূরা হুদ,১১:৬)

যাহোক , অপেক্ষাকৃত কম গ্রহণযোগ্য হলেও, [সূরা আল-আন'আমের] ঐ আয়াতের আরেকটি ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে কিতাব বলতে সেখানে কুর'আনই বোঝানো হয়েছে।[৫০] এই ব্যাখ্যা যদি বা গ্রহণ করা হয়ও, তবু তার অর্থ এই নয় যে, সুন্নাহ কোন দলিল নয় এবং মুসলিমদের জন্য তা অনুসরণ করাটা বাধ্যতামূলক নয়। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা যেমনটা ব্যাখ্যা করবো - সালাত, যাকাত, রোজা এবং শরীয়াহর অন্যান্য কার্যকলাপের বিস্তারিত যে কুর'আনে [স্পষ্ট] করে বলা হয় নি একথাটা স্বীকার করতেই হবে। সুতরাং বাস্তবতার

---

[৪৯] ইবন আব্বাসের সূত্র থেকে এই ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন ইবন আবি তালহা। ক্বাতাদাহ্ ও ইবন যায়েদের মতও এটাই ছিল। উপরন্তু এই আয়াতের তফসীরে আল-বাগাওয়ী কেবল এই অর্থটাই উল্লেখ করেছেন। দেখুনঃ Page#142, Vol.3, *Tafseer al-Baghawi:Maalim al-Tanzeel* - Al-Husain al-Baghawi.

[৫০] Page#26, Vol.3, *Zaad al-Maseer fi Ilm al-Tafseer* - Abdul Rahmaan ibn al-Jauzi

www.pathagar.com

নিরিখে এই ব্যাখ্যা মেনে নিতে হলে সেটাকে নিম্নলিখিত অর্থবোধক বলে ধরে নিতে হবে যেমনটা আল জাওযী বলেছেন :

“এটা হচ্ছে একটা সাধারণ ঘোষণা [নির্দিষ্ট ঘোষণা নয়] যার পেছনে একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে। যার অর্থ দাঁড়ায় : তোমাদের যা কিছু প্রয়োজন হবে তেমন কিছুই আমরা বাদ দিয়ে যাই নি - সেগুলো সবই কিতাবে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে হয় সুস্পষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমে, না হয় সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মাধ্যমে অথবা ইঙ্গিত দিয়ে।”[৫১]

অন্য কথায়, হয় বিস্তারিতভাবে অথবা বিস্তারিত জানতে চাইলে কোথায় খুঁজতে হবে সেই দিকনির্দেশনা সহকারে এই কিতাবে সবকিছুই উল্লেখ করা হয়েছে। আর সেজন্যই সালাত, রোজা ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ এই কিতাবে নেই। কিন্তু কিতাবখানা বলে দেয়, একজন বিশ্বাসী কোথায় সেগুলো পাবেঃ নবী (সা.)-এঁর সুন্নাহর মাঝে। এভাবে বুঝলে ঐ আয়াতটি সুন্নাহর কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে কোন যুক্তি হিসাবে উপস্থাপিত হবার নয়, বরং সুন্নাহর অপরিহার্যতা প্রকাশ করা আরেকটি আয়াত।

যেমনটা আমরা দেখলাম, সুন্নাহর কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় যে আয়াতটি ব্যবহার করা হয়, সেটি হচ্ছে :

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ تِبْيَٰنًا لِّكُلِّ شَىْءٍ

“...আমরা তোমার কাছে সবকিছু ব্যাখ্যা করে একখানি কিতাব নাযিল করেছি.....” (সূরা নাহল, ১৬:৮৯)

---

[৫১] Page#26, Vol.3, *Zaad al-Maseer fi Ilm al-Tafseer* - Abdul Rahmaan ibn al-Jauzi

www.pathagar.com

এই আয়াতের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে **ইবন কাসীর** বলেন যে, অতীতে যা হয়ে গেছে ও ভবিষ্যতে যা ঘটবে, কি হালাল ও কি হারাম এবং পার্থিব এই জীবন ও আখিরাতের মঙ্গলের জন্য মানুষের যা প্রয়োজন সে সম্বন্ধে যাবতীয় লাভজনক জ্ঞান কুর'আনে রয়েছে।[৫২] এটা যে সত্য, সে ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু কুর'আনে আল্লাহ কি পন্থায় এসব জ্ঞান দান করেছেন সেটা নিয়েই প্রশ্ন। এটা স্পষ্ট যে ইবাদত, আইন এবং জীবন সম্বন্ধে খোদ কুর'আনে সব কিছু বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে আল্লাহ্ জ্ঞান দান করেন নি। তার পরিবর্তে বরং সত্যিকার দিকনির্দেশনা লাভ করার জন্য একজন বিশ্বাসীর যা কিছু প্রয়োজন কুর'আন সেগুলো বলে দেয়। তার মাঝে সুন্নাহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যেমনটা রয়েছে আরো অনেক কিছু – যেমন সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা ইত্যাদি। আবারও, সুন্নাহর কর্তৃত্বের বিরুদ্ধাচরণ করতে গিয়ে যুক্তি দেখাতে এই আয়াত ব্যবহার করা যায় না, কেননা যে কারো জীবনে যা কিছুর প্রয়োজন রয়েছে, কুর'আন সব কিছু উল্লেখ করে এবং যে কারো জীবনে যা কিছু প্রয়োজন রয়েছে, তার একটা অংশ হচ্ছে রাসূল (সা.)-এঁর সুন্নাহ অনুসরণ করা। এই অধ্যায়ে ইতিপূর্বে আমরা যেমন দেখিয়েছি, কুর'আন নিজেই বহু বহু আয়াতে এই সত্যতাকে পরিস্কার করে দিয়েছে।

---

[৫২] দেখুন: Page#751, *Tafseer al-Quran al-Adheemal-Marcof bi Tafseer ibn Katheer* - **Ismaeel Ibn Katheer**

www.pathagar.com

উপরোক্ত আয়াতগুলো, যেগুলো রাসূলকে (সা.) মেনে চলার প্রয়োজনীয়তা এবং তাঁর সুন্নাহ্‌র গুরুত্ব সম্বন্ধে নির্দেশনা দেয় সেগুলো ছাড়াও নবী নিজেই তাঁর নিজের সুন্নাহ্‌র গুরুত্ব সম্বন্ধে পরিস্কার ভাবে বলে গেছেন এবং তাঁর সুন্নাহ্ পরিত্যাগের ব্যাপারে সতর্ক করে গেছেন। আমরা যখন একবার এই ব্যাপারটা প্রতিষ্ঠিত করেছি যে, খোদ কুর'আনই মুসলিমদের সুন্নাহ্ অনুসরণ করতে বলে, ইসলামে সুন্নাহ্‌র গুরুত্ব বোঝাতে এবং সুন্নাহ্ অনুসরণ করার বাধ্যবাধকতা বোঝাতে এখন নিশ্চয়ই অতিরিক্ত প্রমাণ হিসাবে নবীর (সা.) নিজের বক্তব্যের ব্যবহার সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। নবীর (সা.) হাদীস থেকে নীচে আমরা সে ধরনের ঘোষণার কিছু উদাহরণ তুলে দিলাম।

রাসূল (সা.) বলেন ; ***"আমি যেন তোমাদের কাউকে বিছানায় হেলান দেওয়া অবস্থায় দেখতে না পাই এবং [দেখতে না পাই যে] এমন একটা সময় আসুক যে, তার কাছে আমার কোন একটি আদেশ বা নিষেধ উপস্থাপন করা হয় আর সে তা সম্বন্ধে বলে, 'আমি তা জানি না, আমরা কেবল আল্লাহর কিতাবে যা পাব তাই অনুসরণ করব।'"*** [৫৩]

একই ধরনের আরেকটি হাদীসে রাসূল (সা.) গৃহপালিত গাধার মাংস নিষিদ্ধ করেন এবং বলেন : ***"শীঘ্রই এমন একটি সময় আসবে যখন একজন মানুষকে তার বিছানায় হেলান দেওয়া অবস্থায় পাওয়া যাবে এবং যাকে আমার একটা হাদীস সম্পর্কে বলা হবে এবং [তখন] সে বলবে, 'তোমাদের ও আমাদের মাঝে কিতাব রয়েছে। আমরা***

---

[৫৩] আল বাইহাকি, আল শাফি'ঈ, আল হুমাদী, আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবন মাজাহ্ প্রমুখ সূত্রে বর্ণিত - আলবানীর মতে সহীহ্।

www.pathagar.com

সেখানে যা অনুমোদিত পাই তা অনুমোদন করি। আর সেখানে যা নিষিদ্ধ দেখতে পাই তা নিষিদ্ধ করি ।' কিন্তু আসলে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) যা নিষিদ্ধ করেছেন, তা আল্লাহ্‌ যা নিষিদ্ধ করেছেন তার মতই ।" [৫৪] এই দুটো হাদীসে রাসূল (সা.) মুসলিমদের ঐ সমস্ত লোকজনের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছেন, যারা নবীর (সা.) সুন্নাহকে অস্বীকার করবে এবং দাবী করবে যে, তাদের জন্য কেবল কুর'আনের বিধি-নিষেধ অনুযায়ী জীবন যাপন করাই প্রয়োজনীয় ।

দ্বিতীয় হাদীসে তিনি বলেছেন যে, তিনি যা কিছুকে অবৈধ বলে ঘোষণা করেন, সেটাকে আল্লাহ্‌ কোন কিছুকে অবৈধ করার মতই দেখতে হবে। শেষের হাদীসটিতে আমরা এমন একটি আইন - যা কেবল তাঁর কাছ থেকে আসে এবং যা সকল মুসলিমকে অবশ্যই মেনে চলতে হবে তার একটি উদাহরণ দেখতে পাই - যেখানে রাসূল (সা.) গাধার মাংস খাওয়াকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। কুর'আনের কোথাও এ ধরনের কোন নিষেধ নেই, কিন্তু খোদ কুর'আন থেকেই আমরা জানি যে, নবীর সেটাকে অবৈধ ঘোষণা করাটাই যথেষ্ট; **কুর'আনে অবৈধ ঘোষণা করা হয়নি** - কেবল এই যুক্তিতেই কেউ এটাকে বৈধ মনে করতে পারে না।

যে কারো উচিত এই ব্যাপারটা খেয়াল করা যে, যারা সুন্নাহ অনুসরণ করতে অস্বীকার করে, তাদেরকে নবী(সা.) কোন ভাষায় বর্ণনা করেছেন। **'যে বিছানায় বা গদিতে হেলান দিয়ে আছে'**- এর নিহিতার্থ হিসাবে 'আলেমরা বুঝেছেন যে, এখানে এমন কারো কথা বলা হচ্ছে যে কিনা **"বিলাসিতা ও বিদআতের ব্যাপারে আগ্রহী, যে ঘরে বসে থাকে এবং জ্ঞান ও হাদীসের ব্যাপারে অনুসন্ধান করা থেকে বিরত থাকে।"** [৫৫] এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, নবী(সা.) ঐ

---

[৫৪] আল বাইহাকি, আহমাদ, তিরমিযী, ইবন মাজাহ প্রমুখ সূত্রে বর্ণিত - আলবানীর মতে সহীহ্‌।
[৫৫] Page#629, Vol.2 , *Sharh al-Teebi ala Mishkaat al-Masaabeeh* - Al-Husain al-Teeby

www.pathagar.com

সুনির্দিষ্ট শব্দাবলী সহকারে একটা নির্দিষ্ট ধারণা দিতে চেয়েছেন। যে ধারণা ইতিবাচক কিছু নয়, এটা হচ্ছে এমন সব ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্য যারা সুন্নাহ্ অনুসরণের বাধ্যবাধকতার কাছে নিজেদের সমর্পণ করতে অস্বীকার করে এবং এই মিথ্যা দাবী করে যে, তারা কুর'আন অনুসরণ করে চলেছে। কিছু মানুষ কেন সুন্নাহ অনুসরণ করাটাকে অস্বীকার করে তারও একটা ইঙ্গিত এখানে পাওয়া যায় - অলসতাবশত এবং সহজ জীবন ও বিলাসিতার আকাঙ্খাবশত। **কুর'আনের সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয়গুলো কেউ অনুসরণ করছে, এই দাবী করে কেউ যেসব এড়িয়ে যেতে পারত, সুন্নাহ্ সেসব খুঁটিনাটি বিষয় মেনে চলার দাবী রাখে। ত্যাগ স্বীকার করা, শিক্ষালাভ ও পরিশ্রম করার ব্যাপারে তাদের অনীহার জন্যই তারা সুন্নাহ্ থেকে পালিয়ে বেড়ায়।**

আল্লাহর রাসূল বলেন (সা.); ***"নিশ্চয়ই আমাকে কিতাব দেয়া হয়েছে এবং তার সাথে তার সদৃশ কিছু দেয়া হয়েছে ...... ।"***[৫৬]

বদর আল বদর বলেন ,

"এই হাদীসের দুই ধরনের অর্থ হতে পারে:

ক) আল্লাহর রাসূলকে (সা.) এক বাতেন (লুক্কায়িত, গুপ্ত, অপ্রকাশিত) ওহী দান করা হয়েছে, যা তিলাওয়াত করা হয় না, ঠিক যেমন তাঁকে প্রকাশ্য ওহী দান করা হয়েছে যা কিনা তিলাওয়াত করা হয়ে থাকে।

খ)এর আরেকটা অর্থ এমন হয় যে, তাঁকে কিতাবখানি দেওয়া হয়েছে, যা কিনা একটা ওহী যা তিলাওয়াত করা হয় এবং তাঁকে এর ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে, অর্থাৎ, তাঁকে কিতাবখানি ব্যাখ্যা করার অনুমতি দেওয়া

---

[৫৬] আবু দাউদ থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত।

www.pathagar.com

হয়েছে যার সাধারণ ও সুনির্দিষ্ট প্রয়োগ রয়েছে এবং কুর'আনে উল্লেখ করা হয়নি এমন বিষয়ে তিনি বিধিনিষেধ যুক্ত করতে পারেন। এদিক থেকে আদেশ করার ব্যাপারে তাঁর দায়িত্ব এবং সে আদেশ মানার ব্যাপারে অন্যদের কর্তব্য কুরআনের স্পষ্ট তিলাওয়াত থেকে প্রাপ্ত বিধিনিষেধ মেনে চলার মতই অবশ্যকরণীয়।[৫৭]

আমরা আগে হিকমাহ্‌র কথা সম্বলিত যেসব আয়াত উদ্ধৃত করেছিলাম, তার সাথে মিলিয়ে এই হাদীসটি পড়তে পারি। নবী (সা.)-কে কেবল কিতাবই দান করা হয়নি বরং তার সাথে সাথে তাঁকে আরেক ধরনের ওহী প্রেরণ করা হয়েছিল যা হচ্ছে হিকমাহ্ অথবা সুন্নাহ – **ইমাম শাফি'ঈর** এই মতকে এই হাদীসটি সমর্থন করে। **হাসান বিন আতিয়া** বলেন, *"জিবরাইল (আ.) রাসূল (সা.)-এঁর কাছে এমনভাবে সুন্নাহ্ নাযিল করেন, যেভাবে তিনি তাঁর কাছে কুর'আন নাযিল করতেন। তিনি তাঁকে এমনভাবে তা শিক্ষা দেন, যেমনভাবে তাঁকে কুর'আন শিক্ষা দিতেন।"* **ইবনে হাজম, ইমাম মালিক** থেকে বর্ণনা করেন : *"নবীকে (সা.) যদি কিছু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হতো, তবে তিনি আকাশ থেকে ওহী লাভ না করা পর্যন্ত তার উত্তর দিতেন না।"*[৫৮]

রাসূল (সা.) নিজে বিদায় হজ্জের সময় বলেছেন : ***"আমি তোমাদের মাঝে দুটো বিষয় রেখে যাচ্ছি , যার সাথে লেগে থাকলে তোমরা কখনোই বিপথগামী হবে না: আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ।"*** (মালিক, আল-হাকিম, আল-বাইহাকি - আলবানীর মতে সহীহ্)। একই হাদীসের আরেকটি বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি বলেন, ***"হে মানবজাতি , আমি যা বলি শোন এবং সেই অনুযায়ী***

---

[৫৭] *Miftaah al-Jannah fi al-Ihtijaaj bi al-Sunnah* - Jalaal al-Deen al-Suyooti - এই বইয়ের Page#22 তে, বদর আল বদরের মন্তব্য।
[৫৮] Page#176, Vol 1, *Al-Ihkaam fi Usool a'-Ahkaam* - Ali ibn Hazm

www.pathagar.com

জীবনযাপন কর।"(হাসান সনদে আল-বাইহাকিতে বর্ণিত)। এই হাদীসগুলো এবং এই ধরনের আরো হাদীস বহু সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। আর তাই এগুলোর নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এই হাদীসে রাসূল (সা.) মুসলিমদের এক পরিস্কার উপদেশ দিয়ে গেছেন। তারা যদি কখনো বিপথগামী না হতে চায়, তবে তাদেরকে কেবল আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর নবীর (সা.) সুন্নাহ অনুসরণ করতে হবে। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে এই যে, তিনি বিদায় হজ্বের সময় এই উপদেশ দিয়েছিলেন যখন তিনি জানতেন যে, তাঁর মৃত্যু আসন্ন এবং তাঁর চারিপাশে যারা একত্রিত হতেন, সেরকম হাজার হাজার সঙ্গীর জন্য এটা ছিল তাঁর বিদায়ী উপদেশ। (আরও লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, যদি তাঁর সুন্নাহ কেবল তাঁর জীবদ্দশায়ই অনুসরণ করার ব্যাপার হয়ে থাকতো, তবে তিনি তাঁর অনুসারীদের সেটা বলে যেতেন [যে তাঁর মৃত্যুর পরে কারো তাঁর অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই]। তা নাহলে বাণী পৌঁছে দেয়ার তাঁর যে মিশন - পরিপূর্ণরূপে তাঁর তা সম্পাদন করা হতো না। কিন্তু তার পরিবর্তে এমন একটা সময় যখন তিনি জানতেন যে, তাঁর মৃত্যু আসন্ন, তখন তিনি আল্লাহ্‌র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহর সাথে লেগে থাকার গুরুত্বের কথা পুনরুল্লেখ করলেন।)

রাসূল (সা.) বলেন : ***"যে কোন কর্মকান্ডেরই এমন একটা সময় থাকে যখন সেটা অতি উৎসাহে সম্পন্ন করা হয়, আবার প্রতিটি কর্মকান্ডেরই স্থবিরতার একটা কাল থাকে। কেউ যখন তার স্থবিরতাকে আমার সুন্নাহর সীমার ভিতরে রাখে, তখন বুঝতে হবে যে, সে সঠিক দিক নির্দেশনা প্রাপ্ত; আর যে সে সীমার বাইরে চলে যায়, সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।"*** (আহমাদ, ইবন হিব্বান ও অন্যান্য - আলবানীর মতে সহীহ্)। এই হাদীসে আল্লাহ্‌র রাসূল(সা.) যা বলতে চেয়েছেন তা হচ্ছে এই যে, ভাল আমল বা নফল ইবাদত ইত্যাদি করার সময় যে কেউ নিম্নতম যেটুকু করবে তা যেন রাসূলের (সা.) সুন্নাহ্‌র

www.pathagar.com

সীমারেখার বাইরে না চলে যায় - তাহলে সেসব ব্যক্তিরাই সত্যিকার হেদায়েত লাভ করবে এবং আখিরাতে নাজাত প্রাপ্ত হবে। প্রায়ই দেখা যায় কিছু মানুষ কোন একটা ভাল কাজ করার ব্যাপারে কোন একটা নির্দিষ্ট সময়ে খুবই উৎসাহী থাকে, এবং তারপরে সেই উৎসাহ কমে যায় এবং তাদের ভাল কাজের সংখ্যাও কমতে থাকে। সুন্নাহ্ অনুযায়ী নিম্নতম যা করণীয় - কারো কর্মকান্ড যদি তারও বাইরে চলে যায়, তাহলে তা থেকে সে ধ্বংসের পথে যাবে (উদাহরণ স্বরূপ কোন ব্যক্তি জামাতে সালাত আদায় করাটা একেবারেই ত্যাগ করল)। এই হাদীস অনুযায়ী হেদায়েত পেতে হলে, যে কোন ব্যক্তিকে সবসময় নবী মুহাম্মাদ(সা.)-এঁর সুন্নাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সীমার মধ্যে অবস্থান করতে হবে। আসলে এমনকি অতি উৎসাহী হওয়ার সময়ও যে কোন ব্যক্তির এমন সাবধান থাকা উচিত যেন সে নবী (সা.) কর্তৃক নির্ধারিত সীমার মধ্যেই থাকে। কারণ তাঁর সুন্নাহর মানদন্ডেই সকল কর্মকান্ডের বিচার হয়ে থাকে। এভাবে দুই প্রান্তেই অর্থাৎ অতি-উৎসাহ ও নিরুৎসাহ - দুটো অবস্থায়ই মুসলিমকে সুন্নাহর ভিতরে থাকতে হবে। যারা সুন্নাহকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেন, অথবা, দ্বীনের ব্যাপারে নতুন নতুন ধারণা সংযোজিত করে যারা নবীর (সা.) সুন্নাহ্র সাথে নতুন ব্যাপার যোগ করার চেষ্টা করেন – উভয় শ্রেণীর জন্যই এটা একটা স্পষ্ট সতর্কবাণী ।

এবার আমরা দেখাবো নীচের উদ্ধৃত হাদীসে আল্লাহর কিতাব দ্বারা বিচার করা বলে, রাসূল (সা.) আসলে তাঁর নিজের বিচার করাকে বুঝিয়েছেন।

আবু হুরায়রা (রা.) এবং যায়েদ বিন খালিদ জুহানীর (রা.) বর্ণনায় এসেছে যে, দুইজন লোক নিজেদের ভিতর ঝগড়াঝাঁটি করে "বিচারের জন্য " রাসূল (সা.)-এঁর কাছে আসে। একজন বলল, ***"হে আল্লাহর রাসূল (সা.), আমাদের ভিতর আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী মীমাংসা করে***

www.pathagar.com

দিন।" অপরজন যে কিনা অধিকতর বুদ্ধিমান ছিল সে বললো, "হ্যাঁ ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.), আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী মীমাংসা করে দিন এবং আমাকে কথা বলার অনুমতি দিন।" আল্লাহর রাসূল (সা.) তাকে কথা বলতে দিলেন। সে বললো ,"এই লোকটি আমার ছেলেকে নিয়োগ দিয়েছিল এবং সে (আমার ছেলে) তার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, লোকে বললো যে, আমার ছেলে পাথর বর্ষণে নিহত হবার যোগ্য। আমি লোকটিকে একশ ভেড়া ও একটি ক্রীতদাসী দিলাম আমার ছেলের হয়ে তার মুক্তিপণ হিসাবে; আমি তারপর জ্ঞানীজনদের জিজ্ঞাসা করলাম এবং তারা বললেন যে, আমার ছেলেকে একশ দোররা মারা উচিত এবং একবছরের জন্য নির্বাসিত করা উচিত। এবং লোকটির স্ত্রীকে তার কৃতকর্মের শাস্তি স্বরূপ পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা উচিত।" রাসূল (সা.) বললেন; "আমি তোমাদের ভিতর আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী [বিচারের] সিদ্ধান্ত দেব। তোমার ভেড়া ও ক্রীতদাসী তোমার সম্পত্তি; তুমি সেগুলো ফিরিয়ে নাও, ছেলেটিকে একশ দোররা মারা উচিত এবং তাকে একবছরের জন্য নির্বাসিত করা হবে।" তিনি তখন উনায়েস আসলামীকে বললেন অপর লোকটির স্ত্রীর কাছে যেতে এবং দেখতে যে সে তার অপরাধ স্বীকার করে কিনা – সেক্ষেত্রে তিনি যেন তার রজমের ব্যবস্থা করেন। স্ত্রীলোকটি তার দোষ স্বীকার করেছিল এবং তাকে তখন পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা হয়েছিল। (বুখারী, মুসলিম)।

এক বৎসর নির্বাসনের সাথে এই একশ দোররা মারার বিচার কুর'আনে কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না, তবু নবী (সা.) এটাকে আল্লাহর *'কিতাব অনুযায়ী সিদ্ধান্ত'* বলে উল্লেখ করেছেন। এটা এজন্য যে, নবী (সা.)-এঁর আদেশসমূহ ইসলামিক আইনে কার্যকর করার দিক দিয়ে বিচার করলে কুর'আনের সমপর্যায়ের (যেহেতু দুটোই আল্লাহর কাছ থেকে ওহী হিসাবে এসেছে)। স্বয়ং আল্লাহ্র কাছ থেকে কুর'আনে রাসূল (সা.)-এঁর বিধান দেওয়ার যে কর্তৃত্বের কথা বলা হয়েছে, এটা তারই ফলশ্রুতি।

www.pathagar.com

এ সংক্রান্ত ব্যাপারে বুখারীতে নিম্নলিখিত হাদীসটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে:

আল্লাহর রাসূল (সা.) যখন ঘুমিয়েছিলেন তখন তাঁর কাছে কয়েকজন ফেরেশতা এলেন। কিছু ফেরেশতা বললেন, "তিনি ঘুমিয়ে আছেন (সুতরাং তাঁকে সেরকমই থাকতে দাও)।" অন্যরা উত্তর করলেন, "তাঁর চক্ষু ঘুমিয়ে আছে কিন্তু তাঁর অন্তর সজাগ রয়েছে।" তাঁরা বললেন, "তোমাদের সহচর হচ্ছেন এমন" এবং আরো একটা সাদৃশ্য দেখালেন। তাঁরা বললেন, "তাঁর ব্যাপারটা হচ্ছে এমন এক ব্যক্তির মত যে একটা ঘর বানায় ও খাবারপূর্ণ একটা দস্তরখানা বিছায় ও অন্যদের খেতে ডাকে। যারা তার ডাকে সাড়া দেয়, তারা ঘরে ঢোকে এবং সেই দস্তরখানা থেকে তারা খায়। যারা তার ডাকে সাড়া দেয় না তারা ঐ ঘরে ঢোকে না অথবা দস্তরখানা থেকে খাবারও খায় না।" ফেরেশতাদের কেউ কেউ বললেন, "তাঁকে এর ব্যাখ্যা দাও।" অন্যরা বললেন, "তিনি ঘুমিয়ে আছেন।" এর জবাবে অন্যেরা বললেন, "তিনি ঘুমিয়ে আছেন কিন্তু তাঁর অন্তর সজাগ আছে।" এভাবে তারা তাঁর কাছে হেঁয়ালীটা ব্যাখ্যা করে বলতে গিয়ে বললেন, "ঘরটা হচ্ছে মুহাম্মাদ (সা.)। যে কেউ যখন মুহাম্মাদের (সা.) আনুগত্য করলো, সে স্পষ্টতই আল্লাহরই আনুগত্য করলো আর যে মুহাম্মাদের (সা.) অবাধ্যতা করলো সে নিশ্চিতই আল্লাহর অবাধ্যতা করলো। এবং মুহাম্মাদ (সা.) হচ্ছেন মানবতার জন্য এক নিয়ামক।"

এই হাদীসে যারা সুন্নাহকে অস্বীকার করেন অথবা সুন্নাহর প্রতি স্বল্প গুরুত্ব দিয়ে থাকেন, তারা যে ভুলটা করে থাকেন সেটা যে কেউ দেখতে পাবেন। কোন ব্যক্তি যেমন অপর কাউকে খাবারের নিমন্ত্রণ জানায়, ঠিক তেমনি নবী মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর নিখুঁত উদাহরণ, আদেশসমূহ ও নিষেধসমূহ সহকারে মুসলিমদের জন্য পথটা পরিষ্কার করে দিয়েছেন এবং তাদের জান্নাতের পথে আহবান করেছেন। এই

www.pathagar.com

আহবান অবজ্ঞা করে যে কোন ব্যক্তি আসলে আল্লাহ্‌র কাছে যাবার পথকেই অবজ্ঞা করে। নবী (সা.)-এঁর সুন্নাহর অনুসরণে যারা নিজের জীবনকে বিন্যস্ত করার ব্যাপারটা তোয়াক্কা করে না, তাদের চূড়ান্ত ফলাফল হচ্ছে এই যে, তারা জান্নাতের প্রতিফল উপভোগ করতে পারবে না। সবশষে ফেরেশতারা বললেন যে, রাসূল (সা.) **মানবজাতির জন্য নিয়ামক। এর অর্থ হচ্ছে এরকম যে, তাঁর বাণী বিশ্বাসীদের, অবিশ্বাসীদের থেকে পৃথক করে এবং জান্নাতবাসীদের, জাহান্নামবাসীদের থেকে পৃথক করে** – অর্থাৎ যারা তাঁকে অনুসরণ করার মধ্য দিয়ে তাঁর আহবানে সাড়া দেয় এবং যারা তাঁর সুন্নাহ ও তাঁর আহবানকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের পৃথকীকরণ। **সুতরাং এই হাদীস সুন্নাহ অনুসরণকে ঈমানের এক শক্তিশালী নিদর্শন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে ।**

রাসূল (সা.) আরো বলেন, ***"আমার উম্মতের সবাই জান্নাতে প্রবেশ করবে কেবল তারা ছাড়া যারা প্রত্যাখ্যান করে।"*** তাঁর সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন, ***"কারা প্রত্যাখ্যান করে?*** "তিনি উত্তর দিলেন, ***"যারা আমাকে মেনে চলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, যারা আমাকে অমান্য করে তারাই (জান্নাতে প্রবেশ করা) প্রত্যাখ্যান করলো।"*** (বুখারী ও অন্যান্য)। এখানেও যে কেউ নবীর (সা.) সত্যিকার ভূমিকার সৌন্দর্যটা উপলব্ধি করতে পারবে। রাসূল (সা.) তাঁর সুন্নাহ বা জীবনযাপনের ধরন দিয়ে মুসলিমদের সেই পথটি দেখিয়ে দিয়েছেন, যেটা তাদের সরাসরি জান্নাতে নিয়ে যাবে। একজন মুসলিম যদি তাঁকে অনুসরণ করার ব্যাপারটা গ্রহণ করে, তবে সে জান্নাতের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলো না ।

একজন মুসলিম যদি তাঁকে অনুসরণ করার ব্যাপারটা প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে সে আসলে জান্নাতে প্রবেশ করাকেই প্রত্যাখ্যান করলো। লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে এই যে, রাসূল (সা.) এখানে যেসব মানুষ

www.pathagar.com

তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদের কথাই বলছিলেন (তাঁর উম্মত)। তা দিয়ে এখানে এবং অন্য হাদীসেও বোঝানো হয়েছে যে, **আল্লাহ্ নবী (সা.)-কে অবগত করেছেন যে, তাঁর নিজের উম্মাহর ভিতরে এমন মানুষজন থাকবে, যারা তাঁকে ও সুন্নাহকে অনুসরণ করাটা অস্বীকার করবে।**

অপর একটি হাদীসে রাসূল (সা.) বলেন, ***"আমার এবং আল্লাহ্ আমাকে যা দিয়ে পাঠিয়েছেন তার উদাহরণ হচ্ছে এমন একজন লোকের মত যে একটি জনগোষ্ঠীর কাছে এসে বলল, 'হে লোক সকল, আমি স্বচক্ষে এক সেনাবাহিনীকে [আসতে] দেখেছি এবং আমি হচ্ছি নগ্ন সাবধানকারী - সুতরাং নিজেদের রক্ষা কর।' তাঁর জনগোষ্ঠীর একটা দল তাঁর কথা শুনল এবং রাতের আঁধারে চুপিচুপি নিরাপদ দূরত্বে সরে গিয়ে বেঁচে গেল। অপর একটি দল কথা বিশ্বাস করলো না এবং সকাল পর্যন্ত নিজ নিজ অবস্থানে রইলো, যখন সেনাবাহিনী এসে তাদের উপর চড়াও হলো। তারা তাদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিল। যে আমার আনুগত্য করে এবং আমি যা নিয়ে এসেছি তা অনুসরণ করে, এটা হচ্ছে তার উদাহরণ এবং যে আমাকে অমান্য করে এবং আমি যে সত্য নিয়ে এসেছি তা প্রত্যাখ্যান করে এটা হচ্ছে তারও উদাহরণ।"*** (বুখারী, মুসলিম)।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে এই যে, তুলনামূলক ঐ উদাহরণটি দেওয়ার পরে নবী (সা.) বললেন, ***"যে আমার আনুগত্য করে এবং আমি যা নিয়ে এসেছি তা অনুসরণ করে এটি হচ্ছে তার উদাহরণ"***, কিন্তু এর বিপরীতে বলতে গিয়ে বললেন, ***"যে আমাকে অমান্য করে এবং আমি যে সত্য নিয়ে এসেছি তা প্রত্যাখ্যান করে এটা হচ্ছে তারও উদাহরণ"*** – এ থেকে বোঝা যায় যে, রাসূলের (সা.) বাণীতে

www.pathagar.com

বিশ্বাস ও সত্যায়নের ফলশ্রুতি হচ্ছে আনুগত্য করা এবং অস্বীকৃতি ও প্রত্যাখ্যানের ফলশ্রুতি হচ্ছে নবীকে (সা.) অমান্য করা।[৫৯]

আসলে কেউ যে নবী (সা.) যা নিয়ে এসেছেন তা কখনো অস্বীকার করবে তার একমাত্র সম্ভাব্য কারণই হচ্ছে তার ঈমানের কমতি - নবীর (সা.) উপর বিশ্বাস এবং তিনি যা শিখিয়ে গিয়েছেন তার উপর বিশ্বাসে তার কমতি রয়েছে। এই হাদীসে যেমন অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, এটাই হচ্ছে যে কারো নবীর (সা.) সুন্নাহ অনুসরণ করতে অস্বীকার করার সত্যিকার উৎস।

সবশেষে, একটা হাদীস, যেখানে নবীর (সা.) পথ-নির্দেশনার ব্যাপকত্ব বর্ণনা করা হয়েছে এবং তার মাধ্যমে তাঁর সুন্নাহর দিকে ফিরে যাবার প্রয়োজনের কথা বলা হয়েছে এবং হেদায়েতের জন্য সম্ভাব্য অন্য কোন উৎসের কাছে যাবার অপ্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে - সেখানে নবী (সা.) বলেন, ***"যা কিছু যে কাউকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে অথবা আগুন থেকে দূরে সরিয়ে রাখে, তার এমন কিছুই নেই যা কিনা আমি তোমাদের কাছে পরিষ্কার করে বর্ণনা করিনি।"*** আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, ***"হে লোকসকল, এমন কিছু নেই যা তোমাদের জান্নাতের কাছে নিয়ে যাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে, অথচ আমি সে সম্বন্ধে তোমাদের আদেশ করিনি। এবং এমন কিছু নেই যা তোমাদের জাহান্নামের নিকটবর্তী করবে এবং জান্নাত থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে, অথচ আমি তোমাদের তা নিষেধ করিনি।"***[৬০]

---

[৫৯] Page#613, Vol.2 , *Sharh al-Teebi ala Mishkaat al-Masaabeeh* - Al-Husain al-Teeby

[৬০] প্রথম বর্ণনাটা এসেছে আল-তাবারানী থেকে - যা আলবানীর মতে সহীহ্। দ্বিতীয় বর্ণনাটা এসেছে হুনাদ ইবন আল-সিররী থেকে - যে সম্বন্ধে আলবানী আলাপ করেন নি! তবে মুহাম্মাদ আল-খাইরাবাদীর তাহক্বীক মতে দ্বিতীয় বর্ণনাটাও সহীহ্!

www.pathagar.com

উপরে আমরা যে হাদীসগুলো উল্লেখ করলাম তার সমর্থনে আরো অনেক হাদীস যোগ করা যেত, কিন্তু সংক্ষিপ্ততার জন্য আমরা এখানেই ক্ষান্ত হবো। রাসূল (সা.)-এঁর হাদীসগুলো থেকে আমরা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলোতে পৌঁছাতে পারি :

ক) আল্লাহ্-প্রদত্ত দায়িত্ববলে আমাদের কাছে বাণী পৌঁছে দিতে গিয়ে বহু অবস্থায় তিনি এটা সুস্পষ্ট ভাবে বলে দিয়ে গেছেন যে, সত্যিকার হেদায়েত পেতে হলে একজন মুসলিমকে অবশ্যই তাঁর সুন্নাহর অনুসরণ করতে হবে।

খ) আল্লাহ নবী (সা.) কে জ্ঞান দান করেছেন যে পরবর্তী সময়ে এমন লোকজন আসবে যারা তাঁর সুন্নাহ প্রত্যাখ্যান করবে এবং তাঁর জীবনযাপনের ধরন অনুযায়ী জীবনযাপন করতে অস্বীকার করবে। আর তাই নবী (সা.) তাঁর অনুসারীদের ঐ ধরনের মানুষ ও ঐ ধরনের ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে গেছেন ।

গ) রাসূলের (সা.) এ হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, একজন মুসলিম যদি রাসূল (সা.)-এঁর সুন্নাহ অনুসরণরত হয়ে থাকেন, তবে তিনি নিশ্চিত হতে পারেন যে, তিনি সিরাতুল মুস্তাকিম এর উপর রয়েছেন - অর্থাৎ ঐ পথের উপর যা তাঁকে সরাসরি আল্লাহর সন্তুষ্টি, ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে নিয়ে যাবে।

www.pathagar.com

আল্লাহর রাসূলের (সা.) পরেই যাঁরা কুর'আনের সত্যিকারের অর্থ সবচেয়ে ভাল বুঝতেন এবং একজন বিশ্বাসীর কি ধরনের আচরণ করা উচিত তা সবচেয়ে ভাল যাঁরা জানতেন, তাঁরা হচ্ছেন সাহাবা রাদিআল্লাহু আনহুম। আল্লাহর রাসূল (সা.) নিজেই তাঁর প্রজন্মকে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজন্ম বলে আখ্যায়িত করেছেন: *"তোমাদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ (আমার উম্মতের মাঝে) হচ্ছে আমার প্রজন্ম, তারপর হচ্ছে তার পরের প্রজন্ম, এবং তারপর হচ্ছে তার পরের প্রজন্ম ।"* (বুখারী)। বাস্তবিকই সাহাবীদের (রা.) মাধ্যমে আল্লাহ কুর'আনকে সংরক্ষিত করেছিলেন এবং তাদের মাধ্যমেই পরবর্তী প্রজন্মগুলো ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ও বিস্তারিত দিকগুলো সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। নীচে আমরা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও জ্ঞানী সাহাবীদের কয়েকজনের কথা এবং রাসূল (সা.)-এঁর সুন্নাহ এবং তাঁদের অবস্থান তুলে দিলাম।

সুন্নাহ সম্বন্ধে সাহাবীদের কিছু বক্তব্য উল্লেখ করার আগেই তাঁদের আচরণের একটা ব্যাপার সম্পর্কে উল্লেখ করার প্রয়োজন রয়েছে; তাঁরা হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ ঐ প্রজন্ম যাঁরা নবী (সা.)-কে তাৎক্ষণিকভাবে অনুসরণ করেছেন – কোন একটা নির্দিষ্ট কর্ম রাসূল (সা.) কেন সম্পাদন করলেন, সে সম্বন্ধে কোন সংশয় বা প্রশ্ন উত্থাপন করা ছাড়াই। [৬১] উদাহরণস্বরূপ বুখারীর বর্ণনায় **আবদুল্লাহ ইবন উমর** (রা.)-এঁর সূত্রে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) একটি সোনার আংটি পরতেন, আর তাই লোকেরাও সোনার আংটি পরতে শুরু করলো। তারপর নবী (সা.) আংটিটি পরিত্যাগ করলেন এবং বললেন, ***"আমি আর কখনো এটা পরবো না।"*** লোকেরাও সাথে সাথে তাদের সোনার আংটিগুলি পরিত্যাগ করলো। আরেকটি উপলক্ষে নবী (সা.)

[৬১] Page#283-291, *Hujjiyah al-Sunnah* - Abdul Ghani Abdul Khalique

www.pathagar.com

সালাত আদায় করছিলেন এবং সালাতের মাঝে তিনি তাঁর জুতা খুলে ফেললেন। সাহাবীরা (রা.) যখন তাঁকে ঐরকম করতে দেখলেন, তখন তাঁরা নিজেরাও তা অনুসরণ করলেন। পরবর্তীতে তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁরা কেন তাঁদের জুতা খুলে ফেলে দিলেন। তাঁরা বললেন, ***"কেননা আমরা আপনাকে আপনার জুতো খুলে ফেলতে দেখেছি।"*** তিনি তাঁদের ব্যাখ্যা করলেন, ***"জিবরাইল (আ.) আমাকে জানিয়েছিলেন যে, আমার জুতোয় কিছু ময়লা লেগেছিল।"***[৬২]

সাহাবীদের এই আচরণ এবং এই বাস্তবতা যে, তাঁদের এহেন আচরণের জন্য আল্লাহ এবং রাসূল (সা.) কখনোই তাদের তিরস্কার করেননি অথবা ভুল শুধরে দেননি – এটা হচ্ছে সুন্নাহর মর্যাদার ব্যাপারে আরেকটি প্রমাণ। এ ধরনের ব্যাপার: 'আল্লাহর নীরব অনুমোদন' – এই শ্রেণীভুক্ত হবে। এটা অকল্পনীয় যে তাঁরা যদি ভুল করে থাকতেন, তাহলে আল্লাহ তাঁর তরফ থেকে এ ব্যাপারে ইঙ্গিত ছাড়া তাঁদের সে আচরণ অব্যাহত ভাবে চালিয়ে যেতে দেবেন।

তাঁদের কর্মকান্ড ছাড়াও সাহাবীরা সুন্নাহর মর্যাদা ও কর্তৃত্ব সম্বন্ধে তাঁদের বিশ্বাস ব্যক্ত করে বক্তব্য প্রদান করে গেছেন এমন বহু উদ্ধৃতির মাঝে নীচের উদ্ধৃতিগুলোও রয়েছে:
নবীর সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে সৎকর্মশীল আর তাই যিনি নবীর (সা.) পরে গোটা উম্মাহর মাঝে সবচেয়ে সৎকর্মশীল বলে বিবেচিত, সেই **আবুবকর** (রা.) বলেছেন, ***"রাসূল (সা.) যা করতেন এমন কোন কিছুই আমি করতে বাদ রাখিনি। আমি ভয় পাই যে, আমি যদি তাঁর কোন আদেশ বাদ দিতাম, তাহলে আমি বিপথগামী হয়ে যেতাম।"***

সাহাবী **আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ** (রা.) থেকে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি বলেন, ***"যারা উল্কি আঁকে, যারা***

[৬২] আহমাদ ও আবু দাউদে বর্ণিত - আলবানীর মতে সহীহ্।

www.pathagar.com

উল্কি আঁকাতে চায়, যারা ভ্রূ তুলে সরু করে এবং যারা আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন ঘটাতে দাঁত ফাঁক করে তাদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ।" একথা উম্ম ইয়াকুবের কাছে পৌঁছালে তিনি তাঁর কাছে আসেন এবং বলেন, *"আমি শুনেছি আপনি এমন এমন কথা বলেছেন।"* তিনি তাঁকে বললেন, *"আল্লাহর রাসূল (সা.) যেটাকে অভিশাপ দিয়েছেন এবং যা আল্লাহর কিতাবে পাওয়া যায় সেরকম ব্যাপারে যদি আমি অভিশাপ দিই তাহলে আমার দোষ কোথায়"* মহিলা তাঁকে বললেন, *"আমি (আল্লাহর কিতাব) শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়েছি, কিন্তু কোথাও (আপনি যা বলেছেন) তা পাইনি।"* আবদুল্লাহ্‌ (রা.) তাঁকে বললেন, *"আপনি পড়ে থাকলে তো আপনার পাবার কথা। আপনি কি পড়েন নি 'আল্লাহর রাসূল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে দূরে থাকো"* (সূরা হাশর,৫৯;৭) মহিলা বললেন, *"হ্যাঁ"* তিনি বললেন, *" তিনি [আল্লাহর রাসূল (সা.)] এসব জিনিস নিষেধ করেছেন। "* এই ঘটনায় একজন সাহাবী নবীর (সা.) প্রদত্ত বিধিনিষেধকে আল্লাহর বিধিনিষেধ বলে উল্লেখ করেছেন। ঐ ভদ্রমহিলা অর্থাৎ উম্ম ইয়াকুব, আবদুল্লাহ্‌কে (রা.) ভুল বুঝেছিলেন, এবং ভেবেছিলেন যে, তিনি এমন কোন সুনির্দিষ্ট আয়াতের কথা বলেছেন যেখানে ঐ কাজগুলির কথা নির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ করা রয়েছে। আবদুল্লাহ (রা.) তাঁর ব্যাখ্যায় দেখান যে, আল্লাহর রাসূল (সা.) যা নিষিদ্ধ করেছেন, তা আসলে আল্লাহ যা স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করেছেন তার মতই গুরুত্বপূর্ণ। এ ব্যাপারে তাঁর প্রমাণ ছিল সূরা হাশরের সাত নম্বর আয়াত।

সাঈদ ইবন আল-মুসাইয়্যেব থেকে আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে যে, **উমর** (রা.) বলেন, *"একজন বিধবা তার স্বামী হত্যার বিপরীতে প্রাপ্ত রক্তপণ থেকে উত্তরাধিকার হিসাবে কিছুই পাবে না।"* **আদ- দুহাক ইবন সুফিয়ান**, উমর (রা.) কে বলেন যে, *"রাসূল(সা.) একবার তাঁকে লিখেছিলেন যে, আস-শিয়াম আল-যাহাবীর স্ত্রীকে যেন তার স্বামীর*

www.pathagar.com

রক্তপণের একটা অংশ উত্তরাধিকার হিসাবে দেওয়া হয়।" **উমর** (রা.) তারপর তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। এবং রক্তপণের একটা অংশ বিধবাকে দান করেন। এই ঘটনা থেকে **উমর আল-খাত্তাব** (রা.) সুন্নাহর প্রতি কেমন মনোভাব পোষণ করতেন তা বোঝা যায় – যিনি ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ছিলেন এবং দ্বীনের জ্ঞান ও সঠিক ধারণার জন্য যাঁর সুখ্যাতি ছিল। না জেনে তিনি এমন একটা অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন, যেটা রাসূল (সা.)-এঁর সিদ্ধান্তের বিপরীত। কিন্তু যখনি তিনি বুঝলেন যে, তাঁর সিদ্ধান্ত সুন্নাহ্‌র বিপরীতে চলে যাচ্ছে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর মতামত পরিত্যাগ করলেন এবং আল্লাহ্‌র রাসূলের (সা.) সিদ্ধান্তের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করলেন।

আরেকটি ঘটনায় যেখানে **উমর** (রা.) সম্পৃক্ত ছিলেন - একটা নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল কেননা একজন সাহাবী একটা সদৃশ ঘটনার ব্যাপারে নবী (সা.)-এঁর একটা হাদীস বর্ণনা করেছিলেন। তারপর উমর (রা.) বলেছিলেন , *"আমরা যদি এই হাদীস না শুনতাম, তবে আমরা একটা ভিন্ন সিদ্ধান্ত দিতাম। আমরা আমাদের মতামত অনুযায়ী বিচার করতাম।"* এখানেও ইমাম শাফি'ঈ যেমন মন্তব্য করেন – ওমরের (রা.) সিদ্ধান্ত নবীর (সা.) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হতো না। কিন্তু যখন তাঁকে নবীর (সা.) সিদ্ধান্ত জানানো হলো, উমর (রা.) জানলেন যে এ ব্যাপারে তাঁর আর কিছুই বলার রইলো না এবং উপরন্তু তিনি জানতেন যে, একজন বিশ্বাসীকে অবশ্যই নবীর (সা.) সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হবে, এমনকি তা যদি তাঁর নিজের মতের বিপক্ষেও যায়।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের আরেকটি বর্ণনায় একটি ঘটনার কথা উল্লিখিত হয়েছে সেখানে উমর (রা.) আল-শামে (বৃহত্তর সিরিয়া) যাবার জন্য মনস্থির করেছিলেন, সেখানে তখন একটা মহামারীর প্রকোপ দেখা দিয়েছিল। এমতাবস্থায় তাঁর সাথে আবদুর রহমান

www.pathagar.com

ইবন আউফ (রা.)-এঁর দেখা হলো, তখন আবদুর রহমান (রা.) তাঁকে বললেন যে, নবী (সা.) বলেছেন, *"যদি তোমরা শোন যে, কোন নির্দিষ্ট স্থানে মহামারী দেখা দিয়েছে তবে, সে স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করো না; এবং তুমি যদি সেই স্থানে আগে থেকেই অবস্থান করে থাকো, তবে সেই স্থান ত্যাগ করে বাইরে যেও না।"* এটা শুনে উমর (রা.) বুঝলেন যে, তাঁর জন্য আল-শামের দিকে যাওয়াটা সঠিক হবে না, তাই তিনি মদীনায় ফিরে এলেন। বুখারীতে লিপিবদ্ধ আরেকটি ঘটনায় দেখা যায় যে, উমর (রা.) মাজুসীদের কাছ থেকে জিযিয়া কর সংগ্রহ করা থেকে বিরত থাকেন যতক্ষণ না **আবদুর রহমান ইবন আউফ** (রা.) সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, নবী (সা.) তাদের কাছ থেকে ঐ কর সংগ্রহ করেছিলেন। এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, এমনকি রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নবীর (সা.) আদেশ ও সুন্নাহর কাছে সমর্পিত। মাজুসীদের কাছ থেকে জিযিয়া কর গ্রহণ করার ব্যাপারে সংশয় থাকার দরুণ {যতক্ষণ না তিনি এ ব্যাপারে নবীর(সা.) উদাহরণ সম্পর্কে জানতে পারেন, ততক্ষণ}, উমর (রা.) বর্ধিষ্ণু ইসলামী রাষ্ট্রের বাজেটের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছিলেন।

আল- বাইহাকি ও আল-হাকিম কর্তৃক লিপিবদ্ধ সহীহ সনদে দেখা যায় যে, **তাউস** আসরের ফরজ সালাতের পরে ২ রাকাত নফল সালাত পড়ছিলেন। **ইবন আব্বাস** (রা.) তাঁকে তা থেকে বিরত থাকতে বললেন। তিনি উত্তর দিলেন যে, তিনি তা ত্যাগ করবেন না। ইবন আব্বাস (রা.) তখন তাঁকে বললেন, *"আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) আসরের সালাতের পরে সালাত নিষিদ্ধ করেছেন [মাগরেবের আগ পর্যন্ত] সুতরাং আমি জানিনা (তুমি যে সালাত আদায় করেছো তার জন্য) তুমি শাস্তি পাবে না পুরস্কৃত হবে।*

নিশ্চয়ই আল্লাহ বলেছেন:

www.pathagar.com

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে আদেশ দিলে, কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন কোন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।' " (সূরা আহযাব,৩৩:৩৬)

এই ঘটনা থেকে যে কেউ নবীর আদেশের গুরুত্বটা সহজেই বুঝতে পারবেন। ইবাদতের মত একটা সৎকর্মের বেলায়ও যে কারো মনে রাখতে হবে যে, সে সম্বন্ধে নবী (সা.) প্রদত্ত নিয়ম-নীতি কি। ইবন আব্বাস (রা.) তাউস-কে বললেন , *"আমি জানি না তুমি পুরস্কৃত হবে না শাস্তি লাভ করবে"* – তাউস যে অতিরিক্ত সালাত আদায় করার জন্য শাস্তি লাভ করবেন তা কিভাবে হয়? তা এজন্যই যে, তিনি আসলে নবীর আদেশ অমান্য করছিলেন। এ থেকে বোঝা যায়, সকল সৎকর্ম - তা যতই উন্নতমানের হোক না কেন - গ্রহণযোগ্য হবার জন্য সেগুলোকে অবশ্যই কুর'আন ও সুন্নাহ দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে।

আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা.), রাসূল (সা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, *"তোমাদের মেয়েদের রাতে মসজিদে যেতে দিও না।"* আবদুল্লাহর (রা.) একজন ছেলে বললেন যে, তিনি তা করবেন না। এটা শুনে আবদুল্লাহ (রা.) তাঁর ছেলেকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করলেন, তার বুকে ধাক্কা দিলেন এবং বল্লেন, *"আমি আল্লাহর রাসূলের (সা.) একটা হাদীস তোমাকে বললাম, আর তুমি বলছো 'না'।"* [৬৩] এই ঘটনায় **আবদুল্লাহ্ ইবন উমর** (রা.), যিনি সাহাবীদের মাঝে সবচেয়ে জ্ঞানীদের একজন ছিলেন, তিনি তাঁর ছেলের বুকে

---

[৬৩] আহমাদ, মুসলিম ও আবু দাউদে বর্ণিত।

www.pathagar.com

এইজন্য আঘাত করেছিলেন যে, তাঁর ছেলে নবীর (সা.) একটা আদেশ না মানার প্রবণতা দেখিয়েছিলেন। আবদুল্লাহর (রা.) বক্তব্য থেকে স্পষ্টত বোঝা যায় যে, তিনি এমন একটা কিছু বলছিলেন: **"আমি তোমাকে নবীর (সা.) একটা বক্তব্য শোনাচ্ছি, আর তুমি ভাবছো যে, তারপরও এ ব্যাপারে তোমার নিজস্ব কোন বক্তব্য রয়েছে। নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে তোমার আর নিজস্ব কোন বক্তব্য থাকতে পারে না।"**

নীচে আমরা যে ঘটনাটি উল্লেখ করবো তা বুখারী ও মুসলিমে লিপিবদ্ধ:

কাতাদাহ (রা.) বর্ণনা করেন, *"আমরা ইমরান ইবন হুসায়েন ও বুশায়ের ইবন কাব এক সাথে বসেছিলাম। ইমরান বর্ণনা করেন যে,* ***'শালীনতাবোধ হচ্ছে একটি পরিপূর্ণ গুণ'*** *অথবা তিনি বলছিলেন* ***'শালীনতাবোধ পুরোটাই ভাল।'*** *এটা শুনে বুশায়ের ইবন কাব বলেন* ***'আমরা নির্দিষ্ট কিছু বইয়ে অথবা জ্ঞানের বইয়ে দেখতে পাই যে, এটা হচ্ছে আল্লাহ্ প্রদত্ত মনের প্রশান্তি অথবা আল্লাহর খাতিরে ভদ্র আচরণ এবং এর কিছু দুর্বল দিকও রয়েছে।"*** *ইমরান এতই রাগান্বিত হলেন যে, তাঁর চক্ষু লাল হয়ে উঠল এবং তিনি বললেন,* ***'আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর রাসূলের (সা.) একটি হাদীস বর্ণনা করছি আর তুমি তার বিরোধিতা করছো।' "***

আবদুল হামিদ সিদ্দিকী এই হাদীসের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন:

"এই হাদীস একজন নবীর মর্যাদা ব্যাখ্যা করে। নবীদের জ্ঞানের উৎস হচ্ছে ঐশ্বরিক। আর তাই তা নিখুঁত এবং সকল প্রকার ত্রুটিমুক্ত। মানুষের প্রজ্ঞা পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও মতামতের উপর ভিত্তি করে

www.pathagar.com

গড়ে উঠে। আর তাই তা কখনোই নির্ভুল হতে পারে না। এ কারণেই মানবজাতিকে সবসময়ই নবীদের আদেশ মানার তাগিদ দেয়া হয়েছে - দার্শনিকদের নয়। এ হাদীস স্পষ্টতই আমাদের হাদীসের মর্যাদা সম্বন্ধেও জ্ঞান দান করে। এটা হচ্ছে ঐশ্বরিক জ্ঞানের অংশবিশেষ। আর তাই ধর্মীয় অনুভূতি সহকারে এটাকে গ্রহণ করা উচিত।"[৬৪]

[উপরে উল্লেখিত হাদীসের শব্দাবলী মুসলিমের]

এ হাদীসে বুশায়ের আরবদের কিছু প্রাচীন পুস্তকের কথা উল্লেখ করছিলেন যেগুলোতে তাদের 'প্রজ্ঞা ' লিপিবদ্ধ ছিল । কিন্তু তা যখন সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন, তার বিরোধিতা করে, তখন সেটাকে কি করে 'প্রজ্ঞা ' বলা যায় ? রাসূল (সা.) যখন বললেন যে, এর উল্টোটাই করা সত্যি তখন সেটাকে আর কি করে 'প্রজ্ঞা' বলে বিবেচনা করা যায়? নবী (সা.) যখন কোন বিষয়ে কথা বলেছেন, তখন সেই বিষয়ে নবীর (সা.) বক্তব্য বিরোধী কোন বক্তব্যকে কেউ কিভাবে সম্মান দেখাতে পারে? {দুর্ভাগ্যজনকভাবে যে কেউ এমন অনেক মুসলিম খুঁজে পাবেন, যারা, এমন সব ধ্যান-ধারণা অনুসরণ করেন, যা রাসূল (সা.) যা বলে গেছেন তার বিরোধী। বিশেষত স্বল্পোন্নত দেশের কারো কারো জন্য, 'বিজ্ঞান-সমৃদ্ধ পশ্চিম' থেকে আসা যে কোন কিছুই তাদের নিজেদের 'ঐতিহ্যবাহী প্রজ্ঞার' চেয়ে উন্নততর বলে মনে হয়। এটা হয়তো একধরনের হীনমন্যতা থেকে উদ্ভূত। অথচ একজন মুসলিম, যে কিনা কেবল আল্লাহর ইবাদত করে এবং তাঁর কাছে নিজেকে সমর্পণ করে, তার উচিত নয় এমন কেউ বা এমন কোন সভ্যতা যা কিনা আল্লাহর হেদায়েত বিবর্জিত - তার মুখোমুখি দাঁড়াতে গিয়ে হীনমন্যতায় ভোগা।}

---

[৬৪] দেখুন: Vol.1, page#28, footnote#87, *Shahih Muslim: Translation* - Abdul Hamid Siddiqui

www.pathagar.com

আসলে এ ধরনের আরো বহু উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যাবে, যেখানে কেউ নবীর একটি হাদীস অস্বীকার করাতে অথবা সে সম্বন্ধে কোন বিরূপ মন্তব্য করাতে তার সাথে কেউ কথা বলতে অস্বীকার করেছে। সুন্নাহর সপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করতে গিয়ে এ ধরনের আচরণের কথা আমরা আব্দুল্লাহ ইবন মুগাফফাল, ইবাদা ইবন আল সামিত, আবু আদ দারদা এবং আবু সাঈদ আল-খুদরীর মতো সাহাবীদের বর্ণনায় জানতে পারি। পরবর্তী আলেমদের কাছ থেকেও একই ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়।[৬৫] এসব দুর্ব্যবহার কেবল একভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়: **নবীর (সা.) কোন বক্তব্য কোন মুসলিম বিরোধিতা করবেন অথবা প্রত্যাখ্যান করবেন - এটা অকল্পনীয়। ওরকম ব্যবহারের কোন অবকাশ নেই, আর তাই পাপকার্যের জঘন্যতা অনুযায়ী তার প্রতিক্রিয়া সেরকম ছিল।**

বুখারীর বর্ণনায় এসেছে যে, আলী (রা.) ও উসমান (রা.) মক্কা ও মদীনার যাত্রাপথের মাঝখানে ছিলেন। সময়টা ছিল এমন যখন উসমান (রা.) কোন নির্দিষ্ট কারণবশত লোকজনকে মুতা সম্পাদন থেকে বিরত রাখছিলেন (অর্থাৎ একই নিয়তে মাঝখানে একটি বিরতি দিয়ে, হজ্জ এবং উমরাহকে একই যাত্রায় সম্পাদন করা)। আলী (রা.) নিয়ত করলেন :"আমরা মাঝখানে একটি বিরতি সহ হজ্জ এবং উমরাহর জন্য আসছি।" উসমান (রা.) তাঁকে বললেন,"তুমি দেখছো যে, আমি লোকজনকে এটা করা থেকে বিরত রাখছি অথচ তুমি তাই করছো?" আলী (রা.) তাঁকে উত্তর দিলেন, "আমি মানবজাতির কারো বক্তব্যে আল্লাহর রাসূলের (সা.) সুন্নাহ পরিত্যাগ করতে পারি না।" এই ঘটনা থেকে আবারও দেখা যায় যে, নবীর (সা.) সাহাবীরা আল্লাহ্ অথবা তাঁর রাসূলের (সা.) কর্তৃত্ব ছাড়া আর কারো কর্তৃত্ব মেনে নিতেন না। এই ঘটনায় আলী (রা.) দেখছিলেন যে উসমানের

---

[৬৫] দেখুন: Page#35-41,*Tadheem al-Sunnah wa Muwaqaf al-Salaf miman Aaridhuhaa au Istahza bi-Shain Minhaa* - Abdul Qayyoom al-Sihaibaani

www.pathagar.com

(রা.) ফিকহী যুক্তিতে ভুল ছিল। কারণ তিনি বুঝেছিলেন যে উসমান (রা.) মুতা সংক্রান্ত সুন্নাহকে সঠিকভাবে বুঝতে পারেন নি। এখানে মনে রাখা উচিত যে, এই ঘটনার সময় উসমান (রা.) ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফা ছিলেন। এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, সাহাবীরা জানতেন যে, ইসলামের ভূমিতে সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের অধিকারীও, তা তিনি যতই পরহেজগার হন না কেন, তিনিও এমন কোন আইন চাপিয়ে দিতে পারেন না যা নবীর (সা.) সুন্নাহর বিপক্ষে যায়।

সাহাবীদের সম্বন্ধে অনেক কয়টি বিশ্বস্ত সূত্রে আমাদের কাছে যে বর্ণনা এসেছে, তাতে দেখা যায় যে, কোন সমস্যা দেখা দিলে তাঁরা প্রথমে আল্লাহ্‌র কিতাবে তার সমাধান খুঁজতেন। সেখানে সমাধান না পেলে তখন তাঁরা নবী (সা.)-এঁর সুন্নাহয় তার সমাধান খুঁজতেন। সেখানেও কোন সমাধান না পেলে তখন তাঁরা ব্যক্তিগত যুক্তির সাহায্য নিতেন। প্রথম খলিফা আবু বকর (রা.) এবং তাঁর উত্তরসূরী উমর (রা.) – তাঁদের পন্থা এবং আসলে সকল সাহাবীদের পন্থাই ছিল এটা।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি:

ক) (দ্বীনের জ্ঞানের ব্যাপারে যাঁরা সর্বোত্তম ও সবচেয়ে জ্ঞানী ছিলেন সেই প্রজন্ম অর্থাৎ) সাহাবীদের মাঝে এই ব্যাপারে একটা ঐকমত্য ছিল যে, **নবীর (সা.) সুন্নাহ অনুসরণ করাটা তাঁদের জন্য অবশ্যকরণীয় ছিল**। এবং তাঁদের কেউই নিজেকে এই বাধ্যবাধকতার উর্দ্ধে বলে কখনও দাবী করেন নি।

খ) নবীর (সা.) মৃত্যুর পরে মুসলিমরা তখনও একমত ছিলেন যে, তাদের অবশ্যই নবীর (সা.) সুন্নাহ অনুসরণ করতে হবে।

গ) জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে – ইবাদত থেকে রাষ্ট্র পরিচালনা - সব ক্ষেত্রে নবীর (সা.) সুন্নাহকে প্রয়োগ করতে হবে এবং এমনকি রাষ্ট্রের

www.pathagar.com

যিনি প্রধান, তারও নবীর (সা.) সুন্নাহর বিপরীতে শাসনকার্য পরিচালনা করার অধিকার নেই।

সুন্নাহর ব্যাপারে স্কলারদের মতামত

এই অংশে আমরা ব্যাখ্যাকে সংক্ষিপ্ত রাখবো। আমরা মাত্র যে সব আলোচনা করলাম, তারপরে বিস্তারিত বা দীর্ঘ ব্যাখ্যার প্রয়োজন হবে না। সকল মুসলিমদের জন্য নবীর (সা.) সুন্নাহ অথবা নবী মুহাম্মাদ (সা.)-এঁর পথ অনুসরণ করাটা যে অবশ্যকরণীয়, সে ব্যাপারে সকল সময়ের বিশাল সব ইসলামী স্কলাররাই যে একমত ছিলেন, তা দেখাতে এখানে তাঁদের কিছু বক্তব্য উদ্ধৃত করা হবে।[৬৬]

ইবন খুযাইমা বলেন, *"একটা বিষয় সম্বন্ধে আল্লাহ্র রাসূল (সা.) যদি কিছু বলে থাকেন, আর তা যদি আমাদের কাছে একটা সহীহ সনদে এসে থাকে, তবে আর কেউ সে ব্যাপারে কিছু বলতে পারে না।"*

বিখ্যাত স্কলার **মুজাহিদ** (রহ.) বলেন, *"আমরা সবার বক্তব্যেরই কিছু গ্রহণ করি এবং কিছু প্রত্যাখ্যান করি কেবল আল্লাহর রাসূল (সা.) ছাড়া।"* অন্য কথায় রাসূল (সা.)-এঁর সব বক্তব্যই গ্রহণ করতে হবে।

উরওয়া বলেন, *"সুন্নাহর অনুসরণ হচ্ছে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা।"*

আবু সুলায়মান আল দারেমী বলেন, *"আমার অন্তরে হয়তো বা আমার সময়কার সমস্যাবলী ও কথাবার্তা খচখচ করে এবং আমি কখনোই দুটি ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী - কুর'আন ও সুন্নাহর সাক্ষ্য ছাড়া কোন কিছুই গ্রহণ করি না।"*

---

৬৬ বিশেষভাবে আলাদা করে উল্লেখ করা না হলে, নীচের বক্তব্যগুলোর সবকটিই জালালুদ্দিন আস-সুয়ূতির Page#74f, *Miftah al-Jannah fi al-Ihtijaaj bi al-Sunnah* - তে পাওয়া যাবে।

www.pathagar.com

আহমদ ইবন আবু আল হুয়ারী বলেন, *"যে এমন কোন একটা কাজ করে, যা সুন্নাহসম্মত নয়, সে আসলে একটি নিষ্ফল কর্ম সম্পাদন করলো।"*

আবু কিলাবা বলেন, *"তুমি যদি কারো সাথে সুন্নাহ নিয়ে কথা বলো, আর সে যদি বলে, 'এসব আমার কাছ থেকে দূরে রাখ এবং আল্লাহর কিতাব নিয়ে আস' তাহলে জানবে যে সে পথভ্রষ্ট।"*(পৃষ্ঠ# ২৫, *Tabaqaat ibn Saad* থেকে উদ্ধৃত)

আসলে সুন্নাহর মর্যাদা ও কর্তৃত্ব হচ্ছে এমন একটা বিষয়, যে সম্বন্ধে বলা যায় যে, এর পক্ষে স্কলারদের সর্বসম্মত রায় রয়েছে। **শাওয়াত** বলেন,

"ইবন হাজম, আল বাজী, আল-গাজালী, আল-আমাজী, আল-বাজদাওয়ী এবং অন্যান্য স্কলার - যাঁরা ইসলামের আইনতত্ত্বের উপর লিখে গিয়েছেন, তাঁরা এই ব্যাপারে (অর্থাৎ, সুন্নাহর মর্যাদা ও কর্তৃত্ব নিয়ে) আলোচনা করেছেন এবং তাঁরা বলে গেছেন যে, এই প্রশ্নে গোটা মুসলিম জাতির মাঝে একটা সর্বসম্মত অবস্থান রয়েছে। তাঁদের পুস্তকাদিতে তাঁরা স্পষ্টভাবে অথবা এমনকি ইঙ্গিত সহকারেও এমন কিছু বলে যাননি, যাতে বোঝা যায় যে, সুন্নাহর কর্তৃত্ব সম্বন্ধে কোন মতপার্থক্যের অস্তিত্ব রয়েছে। আর এঁরা ছিলেন ঐ ধরনের ব্যক্তি, যাঁরা নিজ মাযহাবের পূর্বসূরীদের বইপুস্তক তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছেন এবং তাঁদের মতপার্থক্যগুলো – যুক্তিযুক্ত হোক অথবা অগ্রহণযোগ্য হোক, যাচাই করেছেন এবং সময় নিয়ে সে সবকে (অগ্রহণযোগ্য মতামতকে) খন্ডন করেছেন। কেউ এটা কিভাবে কল্পনা করতে পারে যে, মুসলিমদের মধ্যে একটা বিষয়ে মতবিরোধ থাকবে, যা কিনা দ্বীনের মৌলিক বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত – যা অপরিহার্য ভাবেই দ্বীন ইসলামের অংশ এবং যা নিয়ে কেউ যদি বাকবিতন্ডা করে তাহলে

www.pathagar.com

সে একজন মুরতাদ, ইসলামের গন্ডীর বাইরে অবস্থিত..... ইমাম আস-শাফি'ঈ তাঁর আল-উম্ম বইতে জিমা আল ইলম-এ লেখেন, 'আমি এমন কোন লোকের কথা জানি না, যাকে লোকে জ্ঞানী মনে করে অথবা যে নিজেকে জ্ঞানী মনে করে – যে এই সত্যের ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করে যে, রাসূল (সা.)-এঁর আদেশসমূহ অনুসরণ করা এবং তাঁর অনুশাসনের কাছে নিজেকে সমর্পণ করাটা আল্লাহ্ ফরজ করে দিয়েছেন এবং তাঁর পরে আর কারো জন্য তাঁকে অনুসরণ করা ছাড়া আল্লাহ্ আর কোন বিকল্প খোলা রাখেন নি..... ।' ঐ সমস্ত উপদলগুলি যারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে জাহির করে, অথচ যারা সত্য থেকে বিচ্যুত ও এই বিষয়ে পথভ্রষ্ট তাদের কারোই মূলনীতি হিসেবে সুন্নাহর কর্তৃত্ব অস্বীকার করার সাহস হয় না, কেননা তারা জানতো যে এমন কিছু করাটা তাদেরকে দ্বীনের বাইরে নিয়ে যাবে ।'[৬৭]

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, উপরে উদ্ধৃত স্কলারগণ (এবং আরও হাজার হাজার স্কলার) যাঁরা রাসূল (সা.)-এঁর মৃত্যুর পরে জীবনযাপন করে গেছেন, তাঁদের কেউই কখনো এমনকি স্বল্পতম কোন ইঙ্গিত সহকারেও এমন সম্ভাবনার কথা বলে যান নি যে, কেবল নবীর (সা.) জীবদ্দশায়ই সুন্নাহ মেনে চলার কথা ছিল এবং কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য তার প্রয়োজন নেই । বরং এ ধরনের চিন্তাভাবনা হচ্ছে সমকালীন সময়ের এক নব্য উদ্ভাবন - যার কোন ভিত্তি নেই, যেমনটা আমরা পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদগুলোতে দেখলাম ।

সাহাবী এবং অন্যান্য স্কলারদের বক্তব্য থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়:

---

[৬৭] দেখুন: Page#272-273, *Hujiyyat al-Sunnah* - Al-Hussain Shawaat

www.pathagar.com

তাঁরা সবাই এই ব্যাপারে একমত ছিলেন যে, নবী (সা.)-এঁর কাছ থেকে যা কিছু এসেছে, তা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে এবং আর যে কারো কাছ থেকে যা কিছু আসুক না কেন, তা কেবল তখনই গ্রহণ করা যাবে, যদি তা কুর'আন এবং সুন্নাহয় যা রয়েছে, তার সাথে বিরোধপূর্ণ না হয়। অন্য যে কোন মানুষই ভুল-ত্রুটির উর্দ্ধে নয়, অথচ নবী (সা.)-কে আল্লাহ দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন এবং ভুল করা থেকে রক্ষা করেছেন। অপর কথায় বলতে গেলে, কারো কাছে যদি রাসূল (সা.)-এর একটা সহীহ হাদীস উপস্থাপন করা হয়, তবে সেই হাদীস অনুসরণ করা ছাড়া তার আর গত্যন্তর থাকবে না।[৬৮] আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) যা বলেছেন, তার সপক্ষে তার ব্যক্তিগত মতামত ত্যাগ করতে হবে। তাকে অবশ্যই তার মাযহাব, তার সংস্কৃতি ও তার ঐতিহ্যগত মতামত ত্যাগ করতে হবে – নবী (সা.)-এঁর কাছ থেকে সহীহ-শুদ্ধ ভাবে যা এসেছে, তার পক্ষ অবলম্বন করতে গিয়ে। নবী (সা.) যখন কোনকিছুর ব্যাপারে স্পষ্ট বক্তব্য দিয়ে গেছেন, তখন সে ব্যাপারটা আর বিতর্ক, আলোচনা অথবা মতামতের জন্য উন্মুক্ত নয়।

চার ইমাম এবং সুন্নাহ সম্বন্ধে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি

সময়ের সাথে সাথে মুসলিমদের মাঝে ফিক্‌হের চারটি ধারা জন্ম নেয় এবং বিস্তার লাভ করে। আজ পর্যন্ত ঐ চারটি মাযহাবের প্রচুর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এই মাযহাবগুলি হচ্ছে:

১) **হানাফী মাযহাব** – এই মাযহাবের সূত্রপাত ঘটে কুফায়, যেখানে আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) এবং আলী ইবন আবু তালিব (রা.) এর মত সাহাবীরা বসবাস করতেন। আবু হানিফা আল নু'মান ইবন সাবিতের (৮০ - ১৫০ হিজরী) নাম অনুসারে এই মাযহাব, হানাফী

[৬৮] অবশ্য যদি তার চেয়ে শক্তিশালী দলিল ভিত্তিক কোন হাদীস দ্বারা অন্যথা প্রমাণিত হয়, তবে ব্যাপারটা ভিন্ন রকম হতে পারে!

www.pathagar.com

মাযহাব নামে পরিচিত। ইসলামের ইতিহাসে তাঁকে সর্বকালের বৃহত্তম ফিক্‌হশাস্ত্রবিদদের একজন বলে সবাই স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন। আবু হানিফার সাথে তাঁর শিষ্য আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ আল হাসান এবং জাফর – এঁরা সবাই এই মাযহাবের গঠন ও বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। আধুনিক পাকিস্তান, ভারত, তুরস্ক, প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত মুসলিম রাষ্ট্রগুলো এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে আজও হানাফী মাযহাব প্রাধান্য বিস্তার করে আছে।

২) মালিকী মাযহাব – এই মাযহাবের বিকাশ ঘটে নবীর (সা.) শহর মদীনায়, যেখানে তাঁর অনেক সাহাবী বসবাস করতেন। এই মাযহাব মালিক বিন আনাসের (৯৫ - ১৭৯ হিজরী) নামানুসারে পরিচিত - যিনি হাদীসের একজন স্কলার ও ফিকহশাস্ত্রবিদ ছিলেন। এই মাযহাব দ্রুত উত্তর আফ্রিকায় ছড়িয়ে পড়ে, যেখানে আজও এর প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়, উপরন্তু মুসলিম স্পেনেও এটাই ছিল প্রধান মাযহাব।

৩) শাফি'ঈ মাযহাব– এই মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মুহাম্মাদ ইবন ইদ্রিস আল শাফিঈ (১৫০ - ২০৪ হিজরী) - যাঁর নাম অনুসারে এই মাযহাবের নামকরণ হয়েছে। মক্কার একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করা আল শাফি'ঈ মদীনায় গমন করেন। তিনি ইরাকেও যান এবং আবু হানিফার ছাত্র মুহাম্মাদ আল হাসানের সাথেও কথাবার্তা বলেন। উসূল আল ফিক্‌হ বা ইসলামী আইনতত্ত্বের উপরে প্রথম পুস্তকের সংকলন ইমাম শাফি'ঈই করেছিলেন। এটা একটা বিশাল কাজ ছিল এবং এতে ইসলামে সুন্নাহর কর্তৃত্ব ও মর্যাদা স্পষ্ট করে নির্দেশিত হয়েছে। আজকের দিনে মিশর, সিরিয়া, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং অন্যান্য স্থানে শাফিঈ মাযহাবের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।

৪) হাম্বলী মাযহাব - আহমাদ বিন হাম্বলের (১৬৪ - ২৪১ হিজরী) নামানুসারে এই মাযহাব পরিচিত। ইমাম আহমাদ ছিলেন হাদীসের

www.pathagar.com

এক বিশাল পন্ডিত ব্যক্তি। মুসনাদ আহ্‌মাদ নামে এক বিশাল গ্রন্থের তিনি ছিলেন প্রণেতা। ফিকহের ব্যাপারে তিনি তাঁর শিক্ষক ইমাম আল-শাফি'ঈ কর্তৃক গভীরভাবে প্রভাবিত হন। আজকের দিনের সৌদী আরবে, হাম্বলী মাযহাবই হচ্ছে প্রধান।

সুন্নাহ ও হাদীসের গুরুত্ব সম্পর্কে স্কলারদের ধ্যান-ধারণা বোঝাটা গুরুত্বপূর্ণ। কেননা কোন হাদীস যখন তাদের মাযহাবের মতের বিরুদ্ধে যায়, তখন তাদের অনুসারীরা সেই সব হাদীস অনুসরণ করার ব্যাপারে তীব্র বিরোধিতা করে থাকেন। তারা ধরেই নেন যে, তাদের স্কলাররা নিশ্চয়ই হাদীসটি জানতেন এবং জেনে শুনে সঙ্গত কারণেই তারা হাদীসটির বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। সুন্নাহ্‌ এবং হাদীস সম্বন্ধে চার ইমামের বক্তব্যের ভিতর থেকে আমরা নিম্নলিখিত বক্তব্যগুলো তুলে দিলামঃ

ইবন আল মুবারকের বর্ণনায় এসেছে যে, **ইমাম আবু হানিফা** বলেন, *"যদি আল্লাহর রাসূলের (সা.) কাছ থেকে কোন বর্ণনা আসে, তবে সেটাই হচ্ছে মস্তিষ্ক ও চক্ষু (অর্থাৎ সেই ব্যাপারের সবকিছু – সেখানে আর বিতর্ক করার কোন অবকাশ নেই)। যদি নবীর (সা.) সাহাবীদের কাছ থেকে বর্ণনা আসে, তবে তাদের বক্তব্যগুলোর মধ্য থেকে আমরা (কোন একটি) বেছে নিই।"*

আবু হানিফা বলেন, *"আল্লাহ্‌র দ্বীন সম্পর্কে নিজের মতামতের ভিত্তিতে কথা বলার ব্যাপারে সাবধান থেকো। তোমাদের অবশ্যই সুন্নাহ্‌র সাথে লেগে থাকা উচিত। যে এর থেকে দূরে থাকে সেই পথভ্রষ্ট হল (সে সিরাতুল মুস্তাক্বীম থেকে সরে গেল)।"*

তিনি আরো বলেন, *"সুন্নাহ যদি না হতো, তাহলে আমরা কেউই কুর'আন বুঝতে সক্ষম হতাম না।"* আরেকটি উপলক্ষে তিনি বলেন,

www.pathagar.com

"মানুষ ততদিন পর্যন্ত ভালোর মধ্যে থাকবে, যতদিন তারা হাদীস শিক্ষা ও অনুসন্ধান করতে থাকবে। তারা যদি হাদীস ছাড়া জ্ঞানের অনুসন্ধান করে, তবে তারা পচে যাবে - কারোরই কোন কথা বলা উচিত নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত সে জানবে না যে, রাসূলের (সা.) আইন ঐ কথাটির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।"[৬৯]

ইমাম আবু হানিফাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, *"আপনি যদি এমন কোন বক্তব্য দেন, যা আল্লাহর কিতাবের সাথে বিরোধপূর্ণ হয় (তাহলে কি করা হবে) ?"* তিনি উত্তর দেন, *"আল্লাহর কিতাবের পক্ষ অবলম্বন করে আমার বক্তব্য ত্যাগ করবে।"* তারপর বলা হলো, *"যদি ধরুন তা রাসূল (সা.) এঁর কোন বর্ণনার বিরোধিতা করে?"* তিনি বলেন, *"রাসূলের (সা.) বর্ণনার পক্ষালম্বন করে আমার বর্ণনা ত্যাগ করবে।"* আবু হানিফার ছাত্র মুহাম্মাদ ইবন আল হাসানের সূত্রেও উপরের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আরো বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি বলেন, *"হাদীস যদি সহীহ হয় তবে সেটাই আমার মত (মাযহাব)।"*[৭০]

উসমান ইবন উমর-এর বর্ণনায় এসেছে যে, এক ব্যক্তি একবার ইমাম মালিকের কাছে এলো এবং তাঁকে একটি প্রশ্ন করলো। **ইমাম মালিক** জবাবে বললেন, *"আল্লাহর রাসূল (সা.) এমন এমন বলেছিলেন।"* লোকটি জিজ্ঞেস করলো, *"আপনার মত কি?"* মালিক তখন কেবল কুর'আনের একটি আয়াত যেখানে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে সেটি দিয়ে তার জবাব দিলেন:

---

[৬৯] দেখুন: Page#77-78, *Al-Sunnah: Hujiyyatuhaa wa Makaanatuhaa fi-l-Islaam wa al-Raad ala Munkireehaa* - Muhammad Luqmaan al-Salaafi
[৭০] দেখুন: Page#85, *Eeqaadh Himam Ooli-l-Absaar* - Saalih al-Fulaani

www.pathagar.com

فَلۡيَحۡذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنۡ أَمۡرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمۡ فِتۡنَةٌ أَوۡ يُصِيبَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾

"সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা সতর্ক হয়ে যাক যে তাদের উপর বিপর্যয় নেমে আসবে অথবা মর্মন্তুদ শাস্তি নেমে আসবে।" (সূরা নূর, ২৪:৬৩)

ইমাম মালিক থেকে আরো উদ্ধৃত করা হয় যে তিনি বলেন, *"আমি কেবলই একজন মানুষ। আমি ভুল করি এবং আমি অন্যসময় সঠিকও হই। আমার মতামত পরীক্ষা করে দেখ। আমার মতের যা কিছু আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাহর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, তা গ্রহণ কর, আর যা কিছু আল্লাহ্র কিতাব ও সুন্নাহর সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ তা বর্জন কর।"*[৭১]

আল রাবীর বর্ণনায় এসেছে যে, **ইমাম আস-শাফি'ঈ** বলেন, *"আমার বইয়ে যদি তোমরা এমন কিছু পাও, যেটা আল্লাহর রাসূলের (সা.) চেয়ে ভিন্ন হয়, তবে সুন্নাহ অনুযায়ী কথা বলো এবং আমি যা বলেছি সেটা বর্জন কর।"* আস-শাফিঈ আরো বলেন, *"যদি হাদীসটি সহীহ হয় তবে সেটাই আমার মত।"*[৭২]

আল-হুমাইদি বলেন যে, **আস-শাফি'ঈ** একদিন একটি হাদীস বর্ণনা করলেন এবং আল হুমাইদি তখন তাঁকে বললেন, *"আপনি কি এটা অনুসরণ করেন?"* তিনি উত্তর দিলেন, *"তুমি কি আমাকে গির্জা থেকে বেরিয়ে আসতে দেখ, না কি জিনার (বিশেষভাবে নন-মুসলিমদের*

---

[৭১] দেখুন: Page#97, *Eeqaadh Himam Ooli-l-Absaar* - Saalih al-Fulaani

[৭২] দেখুন: Page#98, Vol 3, *Majmooah Rasaail al-Munairiyyah* - (Ali al-Subki)

www.pathagar.com

দ্বারা পরিহিত এক ধরনের কোমরবন্ধ) পরিহিত অবস্থায় দেখ? আমি রাসূল (সা.) এঁর একটা হাদীস শুনব আর অনুসরণ করবো না?"[৭৩]

তিনি বোঝাতে চাইছিলেন যে, কেবল একজন অমুসলিম – যেমন একজন খৃস্টান যে কিনা গির্জায় যায় – সেই ওরকম আচরণ করতে পারে।

আহমাদকে (রহ.) একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আওযায়ীর মতামত অনুসরণ করা ভাল না মালিকের মতামত অনুসরণ করা ভাল। এবং তিনি বলেন, ***"তোমাদের দ্বীনে তোমরা তাদের কাউকেই অন্ধভাবে অনুসরণ করো না। যা কিছু নবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের কাছ থেকে এসেছে তাই গ্রহণ কর ..... ।"***[৭৪]

ইমাম আহমাদের পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে দীর্ঘ অধ্যায়ের শুরুতে **ইবনুল কাইয়্যিম** বলেন, *"কোন ব্যাপারে ইমাম আহমাদ যদি একটা দলিল (কুর'আনের আয়াত বা একটি হাদীস) পেতেন, তাহলে তিনি সেই অনুযায়ী ফতোয়া দিতেন এবং এমন কিছু বা কারো ব্যাপারে ভ্রূক্ষেপ করতেন না যে সেটার বিরোধিতা করতো – সে যেই হোক না কেন। সেজন্যেই জনৈক মহিলার চূড়ান্ত তালাকের ব্যাপারে তিনি ওমরের (রা.) মতামত বিবেচনা করেননি, বরং তিনি ফাতিমা বিনতে কায়েসের (রা.) হাদীস অনুসরণ করেন ..... ।"*[৭৫]

এইসব মাযহাবগুলোর সবচেয়ে বিশ্বস্ত অনুসারীরা যুক্তি দেখান যে, তারা যেসব স্কলারদের অনুসরণ করেন তারা কখনোই ইচ্ছে করে রাসূল (সা.)-এঁর কোন হাদীসের বিপক্ষে কোন অবস্থান নেবেন না –

---

[৭৩] দেখুন: Page#135, *Eeqaadh Himam Ooli-l-Absaar* - Saalih al-Fulaani

[৭৪] দেখুন: Page#145, *Eeqaadh Himam Ooli-l-Absaar* - Saalih al-Fulaani.

[৭৫] দেখুন: Page#29, Vol.1, *Ilaam al-Muwaqqieen an Rabb al-Alameen* - Muhammad Ibn al-Qayyim.

www.pathagar.com

যেমনটা আমরা আগেই বলেছি। এ ব্যাপারে একটা ঐক্যমতে পৌঁছানো প্রয়োজন। কারো এই অভিযোগ উত্থাপন করা উচিত নয় যে, এইসব সৎ ও পরহেজগার স্কলারদের কেউ ওরকম একটা কাজ করতে পারেন। এটা একটা স্বীকৃত ব্যাপার যে, কোন কারণ ছাড়া তারা একটা সহীহ্ হাদীসের বিপক্ষে কখনো কিছু করেন নি। এই যুক্তিতে তাদের অনুসারীরা বলবেন যে, তাদের কোন মতামত যদি একটি হাদীসের বিপক্ষে যায়, তবে সেই হাদীস অবজ্ঞা করার ব্যাপারে তাদের কাছে নিশ্চয়ই অধিকতর গ্রহণযোগ্য কোন যুক্তি ছিল। উদাহরণস্বরূপ, এমন কথা বলা হয় যে, ঐ নির্দিষ্ট হাদীসটি হয়তো মানসুখ বা বাতিল হয়ে গেছে -অথবা- সেটা হয়তো আসলে সহীহ নয়, বা তা হয়তো সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়।

এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই যে এরকম একটা যুক্তির পিছনে হয়তো কিছু গ্রহণযোগ্য কারণও থেকে থাকবে। কিন্তু আরো সুচিন্তিত যুক্তিতর্ক এটা প্রতীয়মান করতে পারে যে, এ ব্যাপারে নিরাপদ এবং অধিকতর যুক্তিযুক্ত পদ্ধতি একদমই ভিন্ন।

এটা বোঝা উচিত যে, একটা নির্দিষ্ট হাদীস অনুসরণ না করার পিছনে তাদের স্কলারদের পক্ষ হয়ে তারা যে যুক্তি দেখান - সেগুলোই যে কোন নির্দিষ্ট স্কলারের কোন নির্দিষ্ট হাদীস অনুসরণ না করার একমাত্র কারণ, তেমন নয়। আসলে, সেই কারণগুলো হয়তো মোটেই প্রধান কারণ নয়। উদাহরণস্বরূপ: এটা সম্ভাব্য যে, **একজন স্কলার হয়তো ঐ নির্দিষ্ট হাদীসটি সম্বন্ধে জ্ঞাতই ছিলেন না**। এরকম হওয়াটা অসম্ভব কিছু নয় অথবা এর অর্থ এটাও নয় যে, এমন হলে তা কোন নির্দিষ্ট স্কলারের সামর্থের উপরে কোন কালিমা লেপন করে – **এমন কোন সাহাবীই ছিলেন না যিনি রাসূল (সা.)-এঁর সব হাদীসগুলো সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলেন**। উপরন্তু এমনও হতে পারে যে, কোন মাযহাবের অনুসারীদের অনুসৃত স্কলার মুহাদ্দিসদের মতো হাদীস শাস্ত্রের

www.pathagar.com

বিশেষজ্ঞ ছিলেন না, আর তাই হয়তো ঐ হাদীসটিকে তিনি দুর্বল ভেবেছেন – সম্ভবত যে উপায়ে তা তাঁর কাছে এসে পৌঁছেছিল সে জন্য। অথচ হাদীস বিশেষজ্ঞরা (পরবর্তীতে হয়তো) ঐ নির্দিষ্ট হাদীসটিকে সহীহ্ বলে চিহ্নিত করেছেন। হাদীস অনুসরণ না করে যে ব্যক্তিটি তার মাযহাব অনুসরণ করার পক্ষে যুক্তি দেখান, সেই যুক্তির চেয়ে আমরা মাত্র যে যুক্তি উপস্থাপন করলাম, তা মোটেই কম গ্রহণযোগ্য নয়। মনে করুন একজন ব্যক্তির কাছে একটা হাদীস উপস্থাপন করা হলো এবং তাকে নির্ভরযোগ্য সূত্রে বলা হলো যে, হাদীসের স্কলাররা ঐ হাদীসটিকে সহীহ বলে নির্ধারণ করেছেন। বাস্তবে এটা হচ্ছে একটা হাদীস যা অন্যান্য মাযহাবগুলো গ্রহণ করে এবং প্রয়োগ করে। এবং ধরে নেয়া যাক যে, ঐ ব্যক্তিটি যে মাযহাবের অনুসরণ করে, হাদীসটি তার বিরোধিতা করে এবং ঐ ব্যক্তিটির কোন ধারণাই নেই যে তার মাযহাব কেন ঐ নির্দিষ্ট হাদীসটি প্রয়োগ করছে না। এখন ঐ ব্যক্তিটির সামনে দু'টো পথ খোলা রয়েছে:

ক) যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ হাদীসটি অনুসরণ না করার সে কোন কারণ পাচ্ছে না ততক্ষণ পর্যন্ত সে তা অনুসরণ করতে থাকবে।

খ) সে ধরে নেবে যে ঐ হাদীস মেনে না চলার পিছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে, আর সেজন্য সে ঐ হাদীসের বিপক্ষে তার মাযহাবের মত অনুসরণ করবে।

সে যদি উপরের বর্ণিত 'ক' অনুসারে চলে, তবে স্বভাবতই দুইয়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ভাল পথটি বেছে নেবে। এটা যে অপেক্ষাকৃত ভাল পথ তা বলার জন্য বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে। **প্রথমত**, কিয়ামতের দিন সে আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলতে পারবে যে, যা কিছু রাসূল (সা.)-এঁর বক্তব্য হিসাবে তার সামনে উপস্থিত করা হয়েছিল সে তাই

www.pathagar.com

অনুসরণ করেছে। **রাসূল (সা.)-এঁর প্রতি আনুগত্যকে ফরজ করে এবং তাঁর আনুগত্যের আদেশ দিয়ে কুর'আনে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ রয়েছে;** যদিও আমরা জানি যে, পক্ষান্তরে আবু হানিফা, মালিক, আহ্মাদ, আস-শাফিঈ বা অন্য কোন ব্যক্তিকে অনুসরণ করার ব্যাপারে কোন আদেশ নেই। সুতরাং, এমন যদি দেখা যায় যে, কোন একটা নির্দিষ্ট হাদীস আসলে, উদাহরণস্বরূপ, বাতিল হয়ে গিয়েছিল, তবুও তা অনুসরণ করার ব্যাপারে তার অবস্থান যুক্তিযুক্ত থাকবে এবং ইনশাআল্লাহ্ কিয়ামতের দিন সে নিরাপদ অবস্থানে থাকবে। **দ্বিতীয়ত,** সেক্ষেত্রে সে তার নিজের ইমামের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করে থাকবে। যেমনটা আমরা দেখেছি যে, চারজন ইমামই যখন তাঁদের কোন শিক্ষা নবী (সা.) যা বলেছেন, তার সাথে বিরোধপূর্ণ হবে তখন সেই শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করা বা বর্জন করার কথা বলে গেছেন। সুতরাং সেক্ষেত্রে সে যে স্কলারের উপর আস্থাশীল, অর্থাৎ তার ইমাম, তাকে তার ভ্রান্তির জন্য ক্ষমা করে দিয়ে এবং রাসূল (সা.)-এঁর সুন্নাহ অনুসরণ করে সে আসলে ঐ ইমামের পরামর্শই মেনে চললো। কিন্তু যদি ঐ ব্যক্তি 'খ' তে বর্ণিত পথ অনুসরণ করে, তবে সে আসলে **এক ধরনের অনুমানবশত কাজ করা ছাড়া আর কিছুই করলো না। বাস্তবে সে একটা ত্রিমুখী অনুমানের বশবর্তী হয়ে কাজ করলো। প্রথমত,** সে অনুমান করছে যে, তার ইমাম বা স্কলার আমাদের আলোচ্য নির্দিষ্ট হাদীসটি সম্বন্ধে জানতেন। **দ্বিতীয়ত,** সে ধরে নিচ্ছে যে, তার ইমাম বা স্কলার হাদীসটি কোন শ্রেণীর তা জানতেন অথবা হাদীসটি তার ইমামের কাছে গ্রহণযোগ্য সূত্রের মাধ্যমে পৌঁছেছে। **তৃতীয়ত,** সে এটা অনুমান করছে যে, তার ইমামের ঐ হাদীস মেনে না চলার জন্য পর্যাপ্ত ও শক্তিশালী যুক্তি বা কারণ ছিল।

সম্ভাব্যতার সূত্র বলে যে, **কোন একটা ঘটনার জন্য যত বেশী বিষয় অনুমান করা হয়, ঘটনাটার সম্ভাব্যতা তত কমে যায়।** আবার সে যখন জানেনা যে, তার মাযহাব কেন ঐ নির্দিষ্ট হাদীসটি অনুসরণ করে

www.pathagar.com

না, তখন তাকে অবশ্যই ধরে নিতে হবে যে, তা অনুসরণ না করার জন্য তাদের খুব ভাল যুক্তি রয়েছে। এটা সত্যি যে, তার স্কলারদের পারদর্শিতার উপর তার আস্থা থেকেই এমনটা মনে হয়ে থাকবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্যাপারটা তার পক্ষ থেকে স্রেফ একটা অনুমানের চেয়ে বেশী কিছু বলে মনে করার উপায় নেই – **একটা অনুমান যার সত্য হওয়ার *সম্ভাব্যতা* খুবই ক্ষীণ**। কোন ব্যক্তির দ্বীন এবং আমল কেবলমাত্র অনুমানের উপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত নয়। এটা এমন একটা ব্যাপার যে সম্বন্ধে কুর'আনের বহু আয়াতে আল্লাহ্ সতর্ক করে দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ আল্লাহ মূর্তিপূজকদের অনুমানের উপর ভিত্তি করে তাদের ধর্মকর্ম পালনের ব্যাপারে দোষারোপ করেন এবং বলেন:

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۚ إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًٔا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾

"তাদের অধিকাংশ অনুমানেরই অনুসরণ করে, সত্যের পরিবর্তে অনুমান কোন কাজে আসে না, তারা যা করে নিশ্চয়ই আল্লাহ সেই বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।" (সূরা ইউনূস, ১০:৩৬)

আল্লাহ্ আরো বলেন:

وَمَا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ ۖ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًٔا ﴿٢٨﴾

www.pathagar.com

"অথচ এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই, তারা তো কেবল অনুমানেরই অনুসরণ করে। কিন্তু সত্যের মুকাবিলায় অনুমানের কোনই মূল্য নেই।" (সূরা আন-নাজম, ৫৩:২৮)

কোন ব্যক্তি যদি এভাবেই নিজের অনুমানের অনুসরণ করেন, তবে তিনি যখন কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র সামনে দাঁড়াবেন, তখন তার নিজের পক্ষে কোন অজুহাত বা যুক্তি থাকবে না। তার সামনে নবীর (সা.) কথা উপস্থাপন করা হয়েছিল, ওগুলো যে নবীর (সা.) কথা তা সন্দেহ করারও তার কোন কারণ ছিল না, তবু তিনি এজন্য সেগুলো অনুসরণ করেননি যে, তিনি অনুমানবশত ধরে নিয়েছিলেন যে, ঐ কথাগুলো অনুসরণ না করার জন্য তার ইমামের কাছে নিশ্চয়ই কোন কারণ ছিল।

সুতরাং, এ ব্যাপারে সঠিক মনোভাব হচ্ছে এই যে, যখন কারো সামনে নবী (সা.)-এঁর একটা সহীহ্ হাদীস উপস্থাপন করা হয়, তার অবশ্যই সর্বান্তঃকরণে সেটাকে অনুসরণ করা উচিত, এবং তার সাধ্য অনুযায়ী সর্বতোভাবে তা প্রয়োগ করার আকাঙ্খা হওয়া উচিত। যখন সে তা করবে, তখন এই জীবনে সে সবচেয়ে সঠিক রাস্তাটিই এবং আখিরাতের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ রাস্তাটিই অনুসরণ করবে। **আল্লাহ্‌র রাসূলের (সা.) একটা সহীহ্ হাদীসকে কেউ কেবল এবং কেবল তখনই পরিত্যাগ করবে, যদি, এর বিপরীতে তার সামনে সমপর্যায়ের শক্তিশালী প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়।**

উপসংহার

আমরা মাত্র যে অধ্যায়টি শেষ করতে যাচ্ছি, এই অধ্যায়কেই এই বইয়ের প্রাণ বলা যায়। এই অধ্যায় নিশ্চিতভাবেই নবীর (সা.) সুন্নাহ্‌র কর্তৃত্ব ও গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে। কোন ব্যক্তি যদি কুর'আন

www.pathagar.com

মানে, তবে তাকে অবশ্যই সুন্নাহর অবস্থান স্বীকার করতে হবে – তা না হলে, সে কুর'আনে তার বিশ্বাসকেই কেবল মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে। সে যদি রাসূল (সা.)-কে আল্লাহর একজন সত্যিকার রাসূল বলে বিশ্বাস করে, তবে তার অবশ্যই বিশ্বাস করা উচিত যে, নিজের মর্যাদা ও তাঁর নিজের কথার গুরুত্ব বোঝাতে তিনি মিথ্যাচার করতে পারেন না। তাঁর নিজের কথা আবারও সুন্নাহর গুরুত্ব ও মর্যাদা ব্যক্ত করে। কেউ যদি আল্লাহর দয়া ও করুণায় বিশ্বাস করে, তবে সে এটা বিশ্বাস করবে না যে, যদি নবীকে (সা.) বিশদভাবে অনুসরণ করাটা সঠিক ব্যাপার না হতো, তবে আল্লাহ তাদের সে ব্যাপারে কোন ইঙ্গিত না দিয়ে তাদেরকে তা করে যাবার অনুমতি দিতেন। কেউ যদি কুর'আন ও নবীর (সা.) উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সাহাবীদের সম্বন্ধে এই দুটো উৎস থেকে যা বলা হয় তাতে বিশ্বাস করে, তবে সে অনুধাবন করবে যে, সাহাবীরা সিরাতুল মুস্তাক্বীমের আশীর্বাদপুষ্ট ছিলেন। তথাপি সাহাবীরা নিজেরাই কুর'আন ও সুন্নাহকে সবকিছুর উপরে স্থান দিয়েছেন। নবীর (সা.) সুন্নাহর প্রতি তাঁদের আনুগত্য ছিল দ্বিধাদ্বন্দ্বের উর্দ্ধে। এ ছাড়া কেউ যদি চার ইমাম সহ পরবর্তী সময়ের স্কলারদের উপর কোনরূপ আস্থা জ্ঞাপন করে, তবে সে তাঁদের এই সিদ্ধান্ত মেনে নেবে যে, ইসলামে সুন্নাহ হচ্ছে একটা দলিল এবং কর্তৃত্বের অধিকারী। নবী (সা.)-এঁর কাছ থেকে যা সহীহ সনদে এসেছে, তাদের কেউ তার উপর নিজের মতামত বা চিন্তাভাবনাকে স্থান দেন নি।

আসলে সাহাবীদের সময় থেকে নিয়ে তাবেয়ীদের সময় পর্যন্ত - মুসলিম সম্প্রদায় সামগ্রিকভাবে ও সর্বতোভাবে সুন্নাহর অবস্থান ও মর্যাদার ব্যাপারে একমত ছিলেন। আল্লাহ এই গোটা মুসলিম সম্প্রদায়ের সবাইকে ভুল করতে দিতেন না। সুন্নাহর মর্যাদার ব্যাপারে এটা হচ্ছে আরেকটা আলামত।

www.pathagar.com

আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারি যে, ইসলামের আইনে সুন্নাহ নিশ্চিতভাবেই একটা দলিল। সবাইকে অবশ্যই যাঁর ইবাদত করতে হবে এবং সকলকে অবশ্যই যাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে, সেই এক আল্লাহ্‌র আইন ও অনুশাসনের প্রতিফলন হচ্ছে সুন্নাহ্। সুতরাং আল্লাহর রাসূল (সা.) যা কিছু সিদ্ধান্ত, আদেশ, বক্তব্য অথবা অনুশাসন রেখে গেছেন সেসবের কাছে আত্মসমর্পণ করা এবং সেসবকে মেনে নেয়া ছাড়া সঠিক বিশ্বাস-সম্পন্ন একজন বিশ্বাসীর আর কোন গত্যন্তর নেই।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

রাসূলের (সা.) ভূমিকাসমূহ

আরো একটু গবেষণা করলে দেখা যাবে যে, রাসূল (সা.)-এঁর গুরুত্ব, তিনি মুসলিম জাতির জন্য যে সমস্ত ভূমিকা পালন করেন, সে সবের মাঝে নিহিত। এই ভূমিকাগুলো সুন্নাহ্ ও হাদীসকে অনুসরণ করার অপরিহার্যতাকে আরো বেশী করে প্রতিষ্ঠিত করে। বহু স্কলার এইসব ভূমিকাকে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। নবী (সা.)-এঁর বহুবিধ ভূমিকা সম্বন্ধে যদিও আলোচনা করা যেত, তবুও আমরা এখানে কেবল তাঁর চারটি প্রধান ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা করব : **কুর'আনের ব্যাখ্যাকারী, স্বনির্ভর আইনপ্রণেতা, নিখুঁত উদাহরণ এবং যার আনুগত্য করতে হবে এমন ব্যক্তি।**[৭৬]

(১) *কুর'আন ব্যাখ্যাকারী হিসেবে নবী মুহাম্মদ* (সা.)

যারা ইসলামের বিরোধিতা করে, তারা কুর'আন ও ইসলামকে নবীর (সা.) সুন্নাহ থেকে পৃথক করে দেখাতে চায়। আমরা ইতিমধ্যেই যেমন দেখিয়েছি যে, এরকম একটা দৃষ্টিভঙ্গী অগ্রহণযোগ্য। যেমনটা কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন, সুন্নাহ হচ্ছে জীবন্ত কুর'আন। আয়েশা (রা.) যেমন বলেছেন, *"আল্লাহর রাসূলের (সা.) চরিত্র ছিল কুর'আন"* (বুখারী ও অন্যান্য কর্তৃক সংগৃহীত)। সুন্নাহর সাথে সম্পর্কহীনভাবে যারা কুর'আন ব্যাখ্যা করতে চাইবে, তাদের ব্যাপারে উমর (রা.)

---

[৭৬] দেখুন: Page#5-7, *Studies in Hadith Methodology* - Mustafa Azami.

www.pathagar.com

মুসলিমদের সাবধান করে বলেছেন : *"এমন মানুষজন আসবে যারা তোমাদের সাথে কুর'আনের জটিল আয়াতের ভিত্তিতে তর্ক করবে। তাদেরকে সুন্নাহ্ দিয়ে পরাভূত করবে, কেননা সুন্নাহর অনুসারীরা আল্লাহর কিতাবের ব্যাপারে সবচেয়ে জ্ঞানী।"*[৭৭]

নবী (সা.)-এঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাসমূহের অন্যতম একটি, নিঃসন্দেহে ছিল এই যে, তিনি মানব জাতির কাছে কুর'আনের বক্তব্য পৌঁছে দেবেন, তাদেরকে তা শিক্ষা দেবেন, ব্যাখ্যা করবেন এবং কি করে এর অর্থ প্রয়োগ করতে হয় তা দেখিয়ে দেবেন। আমরা ইতিপূর্বে এমন অনেক আয়াত উল্লেখ করেছি, যেগুলিতে তাঁর এই ভূমিকার উল্লেখ হয়েছে - সেগুলোর অন্যতম একটি হচ্ছে নিচের আয়াতটি ;

لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٤﴾

"আল্লাহ্ মু'মিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের নিজেদের মাঝ থেকে তাদের কাছে রাসূল প্রেরণ করেছেন, যে তাঁর আয়াতসমূহ তাদের কাছে তিলাওয়াত করে, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে এবং কিতাব ও হিকমাহ্ শিক্ষা দেয় - যদিও তারা আগে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিল।" (সূরা আলে ইমরান, ৩:১৬৪)

---

[৭৭] দেখুন: Page#71, *Al-Sunnah: Hujiyyatuhaa wa Makaanatuhaa fi-l-Islaam wa al-Raad ala Munkireehaa* - Muhammad Luqmaan al-Salaafi এবং Page#54-55, Vol.1, *Ilaam al-Muwaqqieen an Rabb al-Alameen* - Muhammad Ibn al-Qayyim.

www.pathagar.com

এখানে নবী (সা.)-এঁর ব্যাপারে বলা হচ্ছেঃ যে *"তাঁর আয়াতসমূহ তাদের কাছে তিলাওয়াত করে"*এবং *"কিতাব ও হিকমাহ্ শিক্ষা দেয়"*। এখানে নবী (সা.) পালন করে গেছেন এমন ২টি ভূমিকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে – তা না হলে এখানে এই অভিব্যক্তিগুলো বাহুল্য হয়ে যেত। নবী (সা.) জিবরাইল ফেরেশতার কাছ থেকে ওহী লাভ করেছেন এবং মুসলিমদের কাছে তা পড়ে শুনিয়েছেন। এ ছাড়া একই সময়ে তিনি তাদেরকে সেই ওহীর মর্মার্থ শিক্ষা দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে **হাবিবুর রহমান আজামী** বলেনঃ

"উপরের তিনটি আয়াতের সমষ্টিতেই (২:৫১, ৩:১৬৪, ৬২:২) দুটো ব্যাপারে স্পষ্টভাবে এবং আলাদা আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমত, ওহী তিলাওয়াত করা এবং দ্বিতীয়ত, কিতাব শিক্ষা দেওয়া।

প্রথমটির অর্থ অর্থাৎ কিতাবখানির তিলাওয়াত, একেবারেই স্পষ্ট। কিন্তু দ্বিতীয়টি অর্থাৎ কিতাবখানি শিক্ষা দেওয়া – এই ব্যাপারে কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে। ব্যাপারটা যদি নিয়মতান্ত্রিকভাবে কুর'আন আবৃত্তি করা, মানুষকে মুখস্থ করানো ইত্যাদি বোঝাতো, তাহলে এটাকে তিলাওয়াত থেকে আলাদা করে নির্দিষ্টভাবে বলার প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং, এটাই প্রমাণ করে যে, এ দ্বারা কুর'আনের আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা ও তাফসীর এবং সেগুলোর অন্তর্নিহিত অর্থ, প্রজ্ঞা ও আদেশসমূহ বের করে নিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে।

খোদ কুর'আন থেকে এভাবে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, নবীর কর্তব্যের মাঝে যেমন আল্লাহর ওহীর সরাসরি তিলাওয়াত ও প্রচার করার ব্যাপারগুলো ছিল, তেমনি সেগুলো স্পষ্ট করে দেয়া এবং তাফসীর করার ব্যাপারগুলো নবুওয়াতের কর্তব্য ছিল। যুক্তিসঙ্গতভাবেই বোঝা যায় যে, কুর'আনের বক্তব্যগুলো বাধ্যতামূলক এবং নিরঙ্কুশ। ঠিক যেমন নবীর (সা.) দেওয়া ব্যাখ্যাও। তা নাহলে তাঁকে কিতাবখানা

www.pathagar.com

শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব অর্পণ করা এবং সেটাকে তাঁর নবুওয়াতের মিশনের অংশবিশেষ করাটা অর্থহীন হয়ে যেত। মোটকথা কুর'আনের এই বক্তব্যগুলোর উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, নবী (সা.) কেবল আল্লাহর একজন রাসূলই ছিলেন না, বরং আল্লাহর বাণীর একজন শিক্ষক ও ব্যাখ্যাকারীও ছিলেন।" [৭৮]

কুর'আনে আল্লাহ্ আরো বলেন:

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

"এবং আমরা তোমার প্রতি স্মরণিকা (কুর'আন) নাযিল করেছি যাতে তুমি সমগ্র মানবজাতিকে তা বুঝিয়ে দাও যা তাদের জন্য নাযিল করা হয়েছে, যেন তারা তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে পারে।" (সূরা নাহল, ১৬:৪৪)

আলবানী বলেন যে, এই আয়াতের দুটো অর্থ রয়েছে। **প্রথমত,** আল্লাহর রাসূল (সা.) যে ওহী লাভ করেছেন, তার কোনকিছুই তিনি গোপন করবেন না বরং তিনি অবশ্যই তার সবটুকুই মানবজাতির কাছে পৌঁছে দেবেন। **দ্বিতীয়ত,** এর অর্থ হচ্ছে এই যে, কুর'আনের বিস্তারিত ব্যাপারগুলো ব্যাখ্যা করা এবং কিভাবে কুর'আন প্রয়োগ করতে হবে, তা দেখিয়ে দেওয়াও আল্লাহর রাসূলের (সা.) কর্তব্য। [৭৯]

স্পষ্টতই আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের (সা.) উপর কুর'আন ব্যাখ্যা করার এই বোঝা চাপিয়ে দিতেন না, যদি তিনি নবীকে (সা.) কুর'আন ব্যাখ্যা

---

[৭৮] দেখুন: Page#9, *The Sunnah in Islam: The Eternal Relevance of Teaching and the Example of Prophet Muhammad* - Habib-ur-Rahman Azami.
[৭৯] দেখুন: Page#6, *Manzalat al-Sunnah fi al-Islam* - Muhammad Naasir al-Deen al-Albaani.

www.pathagar.com

করার প্রয়োজনীয় জ্ঞান দান না করতেন। অন্যথায়, ***"সমগ্র মানবজাতিকে তা বুঝিয়ে দাও"***– এই কাজটি তাঁর জন্য অসম্ভব হতো এবং আল্লাহ্ কোন বান্দার উপরই, তার বহন ক্ষমতার বেশী বোঝা চাপিয়ে দেন না। সুতরাং নবী (সা.) যখন কথা বলেছেন অথবা কোন কাজ করেছেন, তিনি তখন কুর'আন প্রয়োগ করছিলেন এবং ব্যাখ্যা করছিলেন – এই কর্ম সমাধা করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তাঁকে যে জ্ঞান দান করেছিলেন সেই অনুযায়ী। 'ওহীর ব্যাখ্যাকারী' হিসেবে তাঁর যে ভূমিকা সেটা পালন করতে গিয়েই তিনি তা করছিলেন। সুতরাং যখনি আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) কোন আয়াত ব্যাখ্যা করছিলেন, বা প্রয়োগ করছিলেন, সেই ব্যাখ্যা বা প্রয়োগের ভিত্তি ছিল ঐ আয়াত নাযিল করার পেছনে আল্লাহর যে উদ্দেশ্য ছিল সেটা – নবী (সা.)-কে আল্লাহ্ যে ব্যাপারে আগেই অবহিত করেছিলেন। সূরা আল-কিয়ামাহ্‌র নিম্নলিখিত আয়াতের নিহিতার্থও হচ্ছে তাই:

لَا تُحَرِّكْ بِهِۦ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِۦٓ ﴿١٦﴾ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُۥ وَقُرْءَانَهُۥ ﴿١٧﴾
فَإِذَا قَرَأْنَٰهُ فَٱتَّبِعْ قُرْءَانَهُۥ ﴿١٨﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُۥ ﴿١٩﴾

"ওহী আয়ত্ত করার জন্য তুমি তাড়াহুড়া করে তোমার জিহ্বা সঞ্চালন করো না, এটা সংরক্ষণ ও পড়ানোর দায়িত্ব আমাদেরই। সুতরাং আমরা যখন তা পাঠ করি তুমি সেই পাঠের অনুসরণ কর। অতঃপর এর বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমাদেরই।" (সূরা আল-কিয়ামাহ্, ৭৫:১৬-১৯)

নবী (সা.) কে সঠিকভাবে কুর'আন গ্রহণ করার আদেশ দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তারপর সেটার অর্থ পরিস্কার করে দেবেন। প্রথমে তাঁর কাছে পরিস্কার করে দেয়া হবে এবং তারপরে তাঁর মাধ্যমে বাকী গোটা মানবজাতির কাছে তা ব্যাখ্যা করা হবে।

www.pathagar.com

উপরোক্ত আয়াতে (১৬:৪৪) একথা বলা হচ্ছে যে, কেউ যদি আল্লাহর ব্যাখ্যা এবং কুর'আনের প্রয়োগ সম্বন্ধে জানতে চায়, তবে তাকে রাসূলের (সা.) সুন্নাহর শরণাপন্ন হতে হবে। এই আয়াতে এটা পরিস্কার ভাবে বলা হয়েছে যে, এটা হচ্ছে নবীর (সা.) ভূমিকাসমূহের একটি যে তাঁকে মানবজাতির কাছে কুর'আন ব্যাখ্যা করতে হবে। এরকম একটা ভূমিকা যদি অপ্রয়োজনীয় হতো, তবে গোটা কুর'আনকে একত্রে একটা পাহাড়ের উপর নাযিল করলেই হতো – এর সাথে কোন রাসূল প্রেরণের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর অসীম প্রজ্ঞাবলে তেমনটা করেন নি। এবং তিনি যেটা করেছেন, তার কারণ সম্বন্ধে মানবজাতিকে ভাবার অবকাশ দিয়েছেন।

নবী (সা.) যেভাবে কুর'আনের অর্থ ব্যাখ্যা করে গেছেন

সাধারণভাবে যে কেউ এটা বুঝবে যে, কুর'আনের বিভিন্ন দিকগুলো একমাত্র নবী (সা.)-ই ব্যাখ্যা করতে পারতেন, কেননা সেজন্য এমন কিছু জ্ঞানের প্রয়োজন, যা কেবল যিনি কুর'আন নাযিল করেছেন, অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা - তাঁর কাছেই রয়েছে। নবী (সা.) যেসব উপায়ে কুর'আন ব্যাখ্যা করেছেন সেগুলো নিম্নের শ্রেণীসমূহভুক্ত:

নবী (সা.) ঐ সমস্ত শব্দাবলীর অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন যেগুলোর অর্থ বিভিন্ন কারণে অনির্দিষ্ট ছিল।

কখনো কখনো কুর'আনের শব্দগুলি কোন ব্যক্তির বোঝার জন্য কিছুটা অসুবিধাজনক হতে পারে। এরকম হবার বেশ কিছু কারণও থাকতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কুর'আনে ব্যবহৃত একটি শব্দের একাধিক অর্থ থাকতে পারে এবং পাঠক হয়তো নিশ্চিত হতে পারেন না যে, আসলে কোন অর্থটা বোঝানো হয়েছে। সেক্ষেত্রে ঠিক কোন অর্থটা বোঝানো

www.pathagar.com

হয়েছে, তা জানার জন্য একমাত্র উপায় হচ্ছে, যাঁর কাছে কিতাবখানি নাযিল হয়েছিল এবং যাঁকে কিতাবখানির জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল – এবং কুর'আন ব্যাখ্যা করা যাঁর পালনীয় ভূমিকা ছিল – সেই নবীর (সা.) শরণাপন্ন হওয়া।

আলবানী এমন অনেক পরিস্থিতির উদাহরণ দেন, যখন, খোদ সাহাবীরা কুর'আনের কোন একটি আয়াতের উদ্দেশ্য বা অর্থ বুঝতে পারেন নি এবং নবী (সা.)-কে তাঁদের কাছে কুর'আনের অর্থ ব্যাখ্যা করতে হয়েছিল।[৮০]

এ থেকে বোঝা যায় যে, কেবল আরবী ভাষার জ্ঞান থাকাটা – যা কিনা সাহাবীদের ছিল – সকল ক্ষেত্রে কুর'আন বোঝার জন্য পর্যাপ্ত নয়। কুর'আনকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে তাই, যে কাউকে সুন্নাহর শরণাপন্ন হতে হবে। উদাহরণস্বরূপ আল্লাহ্ বলেন:

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا۟ إِيمَـٰنَهُم بِظُلْمٍ أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾

"যারা ঈমান এনেছে এবং যারা তাদের ঈমানকে জুলুম দ্বারা কলুষিত করেনি, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য এবং তারাই হেদায়েতপ্রাপ্ত।" (সূরা আন'আম, ৬:৮২)

সাহাবীরা "জুলুম" শব্দটি একটি ব্যাপক অর্থে বুঝেছিলেন, যার মাঝে সকল ধরনের অঠিক কর্মকান্ড অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই তাঁরা প্রশ্ন উত্থাপন

---

[৮০] দেখুন: Page#7-10, *Manzalat al-Sunnah fi al-Islam* - Muhammad Naasir al-Deen al-Albaani.

www.pathagar.com

করেছিলেন যে, এমন কে আছে যে কিনা কোন না কোন ধরনের অঠিক কাজের দোষে দোষী নয়। তাঁরা আল্লাহ্‌র রাসূলকে (সা.) এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন এবং তিনি তাঁদের বললেন যে, এই আয়াতের মর্মার্থ তাঁরা যেমন ভাবছেন তেমন নয়। তিনি তাঁদের বললেন যে, এই আয়াতে 'জুলুম' শব্দ দিয়ে সুনির্দিষ্টভাবে আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করা বোঝাচ্ছে এবং এই প্রসঙ্গে তিনি কুর'আনের সূরা লুকমানের ১৩ নম্বর আয়াত উদ্ধৃত করলেন:

إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۝١٣

"নিশ্চয়ই শিরক করা জুলুম।" (সূরা লুকমান, ৩১:১৩)

এই উদাহরণে উল্লিখিত আয়াতকে ভুল বোঝা থেকে সাহাবীরা যে দুশ্চিন্তায় পতিত হয়েছিলেন, তা থেকে রাসূল (সা.)-কে তাঁদেরকে উদ্ধার করতে হয়েছিল (বুখারী ও মুসলিম)। আরেকটি আয়াতে আল্লাহ্ বলেন:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِى ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ
إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ ... ۝١٠١

"তোমরা যখন দেশবিদেশে সফর করবে, তখন যদি তোমাদের আশংকা হয় যে কাফিররা তোমাদের জন্য ফিতনা সৃষ্টি করবে, তবে সালাত সংক্ষিপ্ত করলে তোমাদের দোষ নেই।" (সূরা নিসা, ৪:১০১)

এই আয়াতের আপাত যে অর্থ দাঁড়ায় তা হচ্ছে এই যে, সফরের সময় কেউ যদি এ আশংকা করে যে, ইসলামের শত্রুরা তাকে আক্রমণ করতে পারে, তাহলেই কেবল সে তার সালাত সংক্ষিপ্ত করতে পারে।

www.pathagar.com

কিছু কিছু সাহাবী এই আয়াতের অর্থটা এভাবেই বুঝেছিলেন এবং সে জন্য তাঁরা আল্লাহর রাসূলের (সা.) কাছে গিয়েছিলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, যখন কোন শত্রুর ভয় থাকবে না, তখনও সালাত সংক্ষিপ্ত করা চালিয়ে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা রয়েছে কিনা। রাসূল (সা.) তখন তাদের ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে পরিস্কার করে দিলেন যে, সফরে সালাত সংক্ষিপ্ত করাটা আল্লাহ্‌র তরফ থেকে একটা দান, যা কিনা যখন ভয়ভীতি থাকবে না তখনও প্রযোজ্য। এবং মুসলিমদের উচিত তাঁর এই দান গ্রহণ করা (মুসলিম)। এর অর্থ হচ্ছে যে, এই আয়াতের শব্দাবলী কোন একটা কাজের জন্য একটা শর্ত জুড়ে দেয়নি বরং আয়াতটি যখন নাযিল হয়েছিল তখনকার একটি বিরাজমান অবস্থার উদাহরণ দিচ্ছিল, যেক্ষেত্রে সালাত সংক্ষিপ্ত করা যাবে। এ ধরনের আরেকটা উদাহরণ হচ্ছে কুর'আনের ঐ আয়াত যেখানে আল্লাহ্ বলেন:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

"ততক্ষণ পর্যন্ত পানাহার কর যতক্ষণ পর্যন্ত ঊষার সাদা সূতা কালো সূতার চেয়ে ভিন্ন প্রতীয়মান না হয়।"[৮১] (সূরা বাক্বারা, ২:১৮৭)

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পরে একজন সাহাবী তাঁর বালিশের নীচে এক টুকরো কালো ও এক টুকরো সাদা – দুই টুকরো সূতা রাখতেন এবং সঠিকভাবে ঊষালগ্ন নির্ধারণ করতে পরীক্ষা করে দেখতেন যে, তিনি এই দুই টুকরো সূতার পার্থক্য করতে পারছেন কিনা। রাসূল (সা.) ব্যাপারটা সম্বন্ধে শুনলেন ও মন্তব্য করলেন যে, ঐ সাহাবীর

[৮১] আয়াতখানি যখন প্রথম নাযিল হয়, তখন "ঊষার" কথাটা ছিল না।

www.pathagar.com

একটা বিশাল বালিশ থাকতে হবে। কেননা, এই আয়াতে যা বলা হচ্ছে, তা হচ্ছে ঊষার দিগন্তের শুভ্র আভা থেকে রাত্রির অন্ধকারের কৃষ্ণতার পার্থক্য করা।[৮২]

উপরের উদাহরণগুলোয় আমরা যে বক্তব্য তুলে ধরেছি, তা আমাদের প্রস্তাবনার পক্ষে যথেষ্ট হওয়া উচিত। ওগুলো থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, কুর'আনকে সম্পূর্ণভাবে ও শুদ্ধভাবে বোঝার জন্য কেবল আরবী ভাষার জ্ঞান পর্যাপ্ত নয়। বাস্তবে এমনকি কুর'আনের অন্যান্য আয়াতগুলোর জ্ঞানও কুর'আনের সকল আয়াত ব্যাখ্যা করার জন্য পর্যাপ্ত নয়। কুর'আনকে সঠিকভাবে বুঝতে চাইলে যে কাউকে রাসূল (সা.)-এঁর কার্যকলাপ ও বক্তব্যের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে এবং তিনি কিভাবে কুর'আন প্রয়োগ করেছিলেন সেটা জানতে হবে। আর তাই সুন্নাহ পরিত্যাগ করে সেটা করাটা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। রাসূলের(সা.) সাহাবীরা আরবী ভাষায় দক্ষ ছিলেন, তবু অনেক সময় তাঁরা কিছু সুনির্দিষ্ট আয়াতের অর্থ ভুল বুঝেছেন। উপরের উদাহরণগুলোতে আমরা এটাই দেখলাম যে, রাসূল (সা.)- এঁর সাহায্য ছাড়া কতিপয় আয়াতের সুনির্দিষ্ট অর্থ, সেগুলো কতটা সাধারণ অর্থ অথবা কতটা বিশেষ অর্থ বহন করে এবং সেগুলো ঠিক কি বিষয়ে কথা বলে - সেটা জানাটা সাহাবীদের জন্য অসম্ভব ছিল।

নবী (সা.) সাহাবীদের ও অন্যান্যদের ভুল সংশোধন করেন

হাদীস গ্রন্থ মুসলিমে লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, নাজরানের খৃস্টানরা আল-মুগীরা ইবন শু'বাকে নিম্নলিখিত আয়াত সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছিল।

يَـٰٓأُخْتَ هَـٰرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿٢٨﴾

---

[৮২] মুসলিম।

www.pathagar.com

"হে হারুনের বোন, তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিলেন না এবং তোমার মাতাও ব্যভিচারিণী ছিলেন না।" (সূরা মরিয়ম, ১৯:২৮)

খৃস্টানরা যুক্তি দেখাচ্ছিল যে "মেরী"[অর্থাৎ, মারিয়াম (আ.)] নিশ্চিতভাবে হারুনের বোন ছিলেন না। সুতরাং, ঐ আয়াতে সময়ের হিসাবের একটা গন্ডগোল রয়েছে। মুগীরা যখন মদীনায় ফিরে এলেন তখন নবীকে (সা.) ব্যাপারটা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। তখন নবী (সা.) তাঁকে বললেন: ***"তারা নিজেদের তাদের নবীদের এবং তাদের ধার্মিক পূর্বসূরীদের নাম অনুযায়ী ডাকত।"***

বুখারী এবং মুসলিমে আবু মুলাইকার বর্ণনায় নিম্নলিখিত হাদীসটি এসেছে:

যদি নবীর স্ত্রী আয়েশা (রা.) এমন কিছু শুনতেন যা তিনি বুঝতেন না, তবে তিনি তা নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত গবেষণা করতেন, যতক্ষণ না তা তাঁর বুঝে আসত। নবী (সা.) একবার বলেন, ***"যার কর্মফলের হিসাব নেওয়া হবে সে শাস্তি পাবে।"*** *আয়েশা (রা.) বলেন,* ***'কিন্তু আল্লাহ কি বলেন নি, "নিশ্চয়ই তাদের একটা হালকা হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে"?'*** *তিনি (সা.) বলেন,* ***"সেটা হচ্ছে তাদের কর্মকান্ডের উপস্থাপনা। তবে যার কর্মকান্ডের বিস্তারিত হিসাব নেওয়া হবে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে"।***

যা কিছু অবাধ, নবী (সা.) সেটা নির্ধারণ করে দিয়ে গেছেন এবং সাধারণ অনুশাসন প্রয়োগের নির্দিষ্ট ক্ষেত্র চিহ্নিত করে গেছেন

নবী (সা.)-এঁর কুর'আন ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে এই যে, তিনি এই আয়াতগুলো প্রয়োগের ক্ষেত্র নির্ধারণ করে দিয়ে গেছেন। উদাহরণস্বরূপ একটা সাধারণ অভিব্যক্তি থেকে

www.pathagar.com

অনেক সময় মনে হবে যে, তা একটি শ্রেণীর সকল সদস্যের বেলায় প্রযোজ্য হবে। কিন্তু বাস্তবে রাসূল (সা.) দেখিয়ে দিয়ে গেছেন যে, একটা সাধারণ বক্তব্য সবসময় যে সকলের বেলায় প্রযোজ্য হবে এমন কোন কথা নেই – অর্থাৎ – একটা সাধারণ অভিব্যক্তির বাইরে কিছু কিছু ব্যতিক্রম থাকতে পারে। উদাহরণস্বরূপ আল্লাহ্ কুর'আনে বলেন:

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا... ﴿٣٨﴾

"পুরুষ চোর এবং স্ত্রী চোরের বেলায় [বিধান হচ্ছে যে], তাদের হাত কেটে দাও।" (সূরা মায়িদাহ্, ৫:৩৮)

এই আয়াতখানি কিভাবে প্রয়োগ করতে হবে, তা জানার একমাত্র উপায় হচ্ছে আল্লাহর রাসূলের সুন্নাহর শরণাপন্ন হওয়া। কেননা 'চোর' এবং 'হাত' উভয়ই সাধারণ বা অনির্দিষ্ট অভিব্যক্তি। এমনিতে আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে যে, প্রত্যেক চোরেরই হাত কেটে ফেলতে হবে। কিন্তু নবীর (সা.) কাছ থেকে আমরা যেমন জানি, এই দুটো অভিব্যক্তিরই সাধারণ অনির্দিষ্ট অর্থটা এখানে বুঝানো হয়নি। উপরের আয়াতে হাতের জন্য ব্যবহৃত আরবী শব্দ 'ইয়াদ' বাহুমূল পর্যন্ত হাতের যে কোনটুকুই বোঝাতে পারে। কিন্তু রাসূল (সা.) ব্যাখ্যা করে গেছেন যে, এখানে কেবল কব্জি পর্যন্ত হাতের অংশ কেটে ফেলার আদেশ দেয়া হয়েছে। তিনি আরো বলে গেছেন যে, প্রত্যেক চোরেরই যে হাত কেটে ফেলা হবে এমনটি নয়। উদাহরণস্বরূপ আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেন, ***"এক দীনারের এক চতুর্থাংশ বা তার চেয়ে বেশী মূল্যমানের কিছু চুরি করার জন্য হাত কাটতে হবে।"*** (বুখারী ও মুসলিম)[৮৩]

---

[৮৩] এছাড়াও চোরের হাত কাটার ব্যাপারে আরো অনেক ফিক্হী খুঁটিনাটি ধর্তব্য ও জ্ঞাতব্য বিষয় রয়েছে - যেমন: যে বস্তুটা চুরি হয়েছে, সেটার অধিকারী কি তা উন্মুক্ত স্থানে এমনভাবে রেখেছিলেন যা দেখে কেউ প্রলুব্ধ হয় অথবা যা চুরি গেছে তা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ছিল কি না। এসবের উপর নির্ভর করেও একটা ইসলামী রাষ্ট্রে বিচারের রায়ের পার্থক্য হবে বা হতে পারে।

www.pathagar.com

কুর'আনের এমন আরো অনেক আয়াত রয়েছে, যার সত্যিকার নিহিতার্থ নবী (সা.) সেই আয়াতগুলো সম্বন্ধে কি বলেছেন, তা না জানলে বের করা সম্ভব না। নিম্নলিখিত আয়াতে একটা সাধারণ অর্থে 'রক্ত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু নবী (সা.) ব্যাখ্যা করেছেন যে, ঐ সাধারণ বক্তব্যের কিছু ব্যতিক্রম রয়েছেঃ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ ...

"তোমাদের জন্য মৃত পশু (জবাই না করা মৃত পশু) এবং রক্ত এবং শূকরের মাংস নিষিদ্ধ।"(সূরা মায়িদা, ৫:৩)

রাসূল (সা.) মুসলিম জাতির জন্য ব্যাখ্যা করে গেছেন যে, এমন দুই ধরনের রক্ত রয়েছে, যা তাদের জন্য হালাল, আবার এমন দুই ধরনের মৃত প্রাণীও রয়েছে যা তাদের জন্য হালাল। তিনি বলেন, ***"তোমাদের জন্য দুই ধরনের মৃত প্রাণী (মৃত জবাই না করা প্রাণী) হালাল এবং দুই ধরনের রক্ত (রক্তের উৎস) হালাল। দুই শ্রেণীর মৃত প্রাণী হচ্ছে মাছ ও পঙ্গপাল। দুই ধরনের রক্ত হচ্ছে কলিজা ও প্লীহা।"*** (ইবন মাজা, আলবানীর মতে সহীহ)। আল্লাহর রাসূল (সা.) বুঝিয়ে না দিলে মুসলিমরা তাদেরকে কিছু ভাল জিনিস থেকে বঞ্চিত করতো, যা আসলে আল্লাহ্ তাদের জন্য হালাল করে দিয়েছেন। একই ভাবে আল্লাহ্ বলেনঃ

قُل لَّآ أَجِدُ فِى مَآ أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ...

"বলুন, আমার কাছে যে ওহী এসেছে তাতে লোকে যা খায় তার মাঝে আমি মৃত প্রাণী, বহমান রক্ত ও শূকরের মাংস ছাড়া কিছুই হারাম পাইনি।" (সূরা আল-আনআম, ৬:১৪৫)।

www.pathagar.com

কিন্তু এ ছাড়াও রাসূল (সা.) অন্য ধরনের খাদ্যও নিষিদ্ধ করে গেছেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি গাধার মাংস নিষিদ্ধ করে গেছেন যা উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ উল্লেখ করেন নি।

কুর'আনের কোন আয়াতগুলো মানসুখ তা নবী (সা.) চিহ্নিত করে গেছেন

ইমাম আশ-শাফিঈ লিখেছেন, *"কিতাবের বেশীরভাগ নাসিখ আয়াতগুলো (যেগুলো অন্য আয়াতকে বাতিল করেছে) কেবল নবীর (সা.) সুন্নাহ থেকে জানা যায়।"* বাস্তবে ঐ ধরনের জ্ঞান কেবল নবীর (সা.) কাছ থেকেই লাভ করার কথা – যিনি ওহী এবং তার ব্যাখ্যা, দু'টোই লাভ করেছিলেন। কেননা তা না হলে তাঁর জীবদ্দশায় কারো একথা নিশ্চিতভাবে দাবী করার উপায় ছিল না যে, একটি আয়াত অন্য আর একটি আয়াতকে বাতিল করে দিয়েছে। আল্লাহ্ কুর'আনে বলেন:

وَٱلَّٰتِى يَأْتِينَ ٱلْفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُوا۟ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا۟ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِى ٱلْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

"তোমাদের নারীদের মাঝে যারা ব্যভিচার করে, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে চারজন সাক্ষী তলব করবে। যদি তারা সাক্ষ্য দেয় তবে তাদেরকে গৃহে অবরুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু হয় অথবা আল্লাহ্ তাদের জন্য অন্য ব্যবস্থা করেন।" (সূরা নিসা, ৪:১৫)

www.pathagar.com

উপরের এই আয়াতটি সূরা নূরের ২ নম্বর আয়াত কর্তৃক মানসুখ (বাতিল হয়ে যায়)। নবী (সা.) নিম্নলিখিত বাক্যের মাধ্যমে তা ব্যাখ্যা করে গেছেন: *"তোমরা আমার কাছ থেকে জেনে নাও। আল্লাহ্ তাদের জন্য একটা উপায় বাতলে দিয়েছেন। ব্যাপারটা যদি [ক] একজন বিবাহিত মানুষের সাথে অপর একজন বিবাহিত মানুষ অথবা একজন কুমার/কুমারীর মাঝে হয়, অথবা [খ] একজন কুমার ও একজন কুমারীর মাঝে হয়, বিবাহিত ব্যক্তিকে একশ দোররা মারা হবে, তারপরে পাথর নিক্ষেপ করা হবে। অবিবাহিত ব্যক্তিকে একশ দোররা মারা হবে এবং তারপর এক বৎসরের জন্য নির্বাসিত করা হবে।"* (মুসলিম)

{উপরে উল্লিখিত [ক] এবং [খ] হাদীসের অংশ নয়, পাঠকের সুবিধার জন্য আমার সংযোজন}

নবী (সা.) কুর'আনের ঐ সমস্ত আদেশগুলোর বিস্তারিত প্রয়োগ দেখিয়ে গেছেন, যেগুলোর কুর'আনে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ নেই।

নবী (সা.) বিভিন্ন কুর'আনিক আদেশের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন। উদাহরণস্বরূপ আল্লাহ্ মুসলিমদের সালাত কায়েম করতে বলেন, কিন্তু তা কিভাবে সম্পাদিত হবে তা বিস্তারিতভাবে বলেন নি। কিভাবে সালাত সম্পাদন করতে হবে? এই প্রশ্নের উত্তর স্পষ্টভাবে কুর'আনে পাওয়া যাবে না। কিন্তু *"আমাকে যেভাবে সালাত সম্পাদন করতে দেখ সেভাবে সালাত সম্পাদন কর"* [৮৪]– এই বলে আল্লাহর রাসূল (সা.) এই জিজ্ঞাসার জবাব দিয়ে গেছেন।

এ ছাড়াও নবী (সা.) যাকাত, রোজা, হজ্জ, বিয়ে, তালাক, জিহাদ এবং এই ধরনের অন্যান্য বিষয়াদির ব্যাপারে আইনকানুন বা

[৮৪] বুখারী।

www.pathagar.com

অনুশাসনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন। এই সব বিষয়ে কর্তব্য পালন করার জন্য মানুষকে তাগিদ দিয়ে কুর'আনের বহু আয়াত পাওয়া যাবে। কিন্তু ইসলামের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যার অধিকাংশই কুর'আনে পাওয়া যাবে না। নবীর (সা.) পালনীয় ভূমিকার অন্যতম একটি ছিল এই যে, তিনি তাঁর কথা ও কাজ দ্বারা বিষয়গুলোর আইন-কানুন ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা করবেন এবং তার বাস্তব প্রয়োগ দেখিয়ে দেবেন।

কুর'আনের নিরিখে তাঁর এই ভূমিকার কথা বলতে গিয়ে মওদূদী বলেন: *"কুর'আনকে এককথায় আইনগত খুঁটিনাটির একখানি পুস্তক না বলে বরং সাধারণ নীতিমালার একখানি কিতাব বলা যায়।"*[৮৫]

জীবনের জন্য ইসলামের কর্মসূচীর বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক ভিত্তিসমূহ পরিষ্কারভাবে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যাখ্যা করাই হচ্ছে এই কিতাবের লক্ষ্য। মানুষের মস্তিষ্ক ও অন্তর উভয়ের কাছে আবেদন রেখে তা (কুর'আন) সেগুলো সুসংহত করতে চেয়েছে। বাস্তব ইসলামী জীবনধারার জন্য এর পথনির্দেশনার পদ্ধতির মাঝে আইনকানুনের খুঁটিনাটি বিষয়গুলোর উল্লেখ অন্তর্ভুক্ত নয়। তার চেয়ে তা বরং মানব কর্মকান্ডের প্রতিটি দিকের জন্য মৌলিক কাঠামোর একটা রূপরেখা নির্ধারণ করা এবং এমন কিছু দিকনির্দেশনা প্রদান করা, যার আওতায় মানুষ তার জীবনকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুযায়ী সাজিয়ে নিতে পারবে – এসবকেই অগ্রাধিকার দিয়েছে। নবীর (সা.) মিশন ছিল কুর'আনিক নীতিমালার এক জীবন্ত উদাহরণ হিসাবে পৃথিবীকে ব্যক্তিগত চরিত্র

---

[৮৫] মওদূদীর এই বক্তব্য সাধারণ অর্থে সঠিক বলে গণ্য করা যায়, যদিও কুর'আনে এর অনেক ব্যতিক্রম পাওয়া যাবে।

www.pathagar.com

এবং মানবীয় অবস্থা ও সমাজের একটা মডেল উপহার দিয়ে সুন্দর জীবনের ইসলামী ধ্যানধারণাকে একটা বাস্তব রূপ দিয়ে যাওয়া।"[৮৬]

কুর'আনের বিষয়গুলো পরিস্কার করে দেওয়া এবং সেগুলোর প্রয়োগ দেখিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে নবীর (সা.) যে ভূমিকা, তার গুরুত্ব অপরিসীম। কুর'আনের অধিকাংশ অনুশাসনই সেগুলোর প্রয়োজনীয় বিস্তারিত ব্যাখ্যা ছাড়াই কুর'আনে উল্লিখিত হয়েছে। সেইসব প্রয়োজনীয় বিস্তারিত ব্যাখ্যা কেবলমাত্র নবীর (সা.) সুন্নাহর কাছ থেকে জেনে নেয়া যায়।

নবী (সা.) *এমন বক্তব্য রেখেছেন যেগুলোর অর্থ কুর'আনের আয়াতসমূহের মতই, যেগুলো কুর'আনের বক্তব্যকে জোরদার করে এবং আরো পরিস্কার করে দেয়*

আল্লাহর রাসূল (সা.) তাঁর নিজের বক্তব্য দ্বারা কুর'আনের বহু আয়াতের অর্থের উপর আরো জোর দিয়েছেন এবং গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অর্থাৎ তাঁর বক্তব্যের অনেকগুলোই এমন যেগুলোর অর্থ কুর'আনের কিছু আয়াতের সাথে অভিন্ন। এবং সেগুলো হয় কোন আয়াতের অর্থকে কেবল জোরদার করেছে, অথবা অতিরিক্ত ব্যাখ্যা করেছে। এটা এক ধরনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা। কেননা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা অথবা গুরুত্ব আরোপ করে বলাতে একটা সত্য আরো সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এবং যখন একই বক্তব্য ভিন্ন শব্দাবলীতে প্রকাশ করা হয়, তখন তা আরো পরিস্কার হয়। উদাহরণস্বরূপ আল্লাহ্ কুর'আনে বলেনঃ

---

[৮৬] দেখুনঃ Page#44, *An Introductionto Understanding the Quran* - Abul Ala Maudoodi.

www.pathagar.com

فَمَا مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فِى ٱلْءَاخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٨﴾

"আখিরাতের তুলনায় এই জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নগণ্য।" (সূরা তাওবা, ৯:৩৮)

এই আয়াতের ভাবার্থ আরো গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হয়েছে, যখন নবী (সা.) বলেন, ***"আল্লাহর শপথ, আখিরাতের তুলনায় এই পৃথিবীর তুলনা হচ্ছে, তোমাদের কেউ এই আঙ্গুল – এবং ইয়াহিয়া (বর্ণনাকারী) তাঁর তর্জনী দেখালেন – এক সমুদ্রে ঢুকালো এবং তার পরে উঠিয়ে নিয়ে দেখলো তার সাথে কতটুকু উঠে এসেছে। (সেটুকুর সাথে সমুদ্রে যা রয়ে গেল সেটুকুর যে তুলনা - তেমন)।"*** (মুসলিম)

আরেকটি আয়াতে আল্লাহ্ বলেন:

حَتَّىٰٓ إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَٰرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾

"অবশেষে যখন তারা জাহান্নামের কাছে পৌছবে - তখন তাদের কান, চোখ, ত্বক তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।" (সূরা ফুসসিলাত, ৪১:২০)

সে সময় ঠিক কি ঘটবে, তা সহীহ মুসলিমের নিম্নলিখিত হাদীসটি থেকে পরিস্কারভাবে বোঝা যায়:

আনাস ইবন মালিকের (রা.) বর্ণনা থেকে এসেছে যে, ***"আমরা আল্লাহ্র রাসূলের (সা.) সাথে ছিলাম এবং তিনি হেসে উঠলেন। তিনি বললেন, 'তোমরা কি জান আমার হাসি পেল কেন?' আমরা বললাম,***

www.pathagar.com

'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সবচেয়ে ভাল জানেন।' 'মানুষ তার প্রভুকে কি বলবে সেটা মনে করে (আমি হাসলাম)। সে বলবে, 'হে আমার প্রভু, আপনি কি কথা দেননি যে কোন অবিচার করবেন না?' তিনি বলবেন, 'নিশ্চয়ই'। সে তখন বলবে, 'আমি কেবল আমার মধ্য থেকে ছাড়া আর কোন সাক্ষীর আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদানে সন্তুষ্ট হবো না'। তিনি বলবেন, 'আজ তোমার বিরুদ্ধে তোমার নিজের নাফসই সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট হবে, ঠিক যেমন নাম লিপিবদ্ধকারী মহান সাক্ষীগণ।' তিনি তখন বলবেন, 'এর মুখ বন্ধ করে দাও।' তারপর তার শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে বলা হবে, 'কথা বলো।' তখন সেগুলো তার কর্মকান্ড সম্বন্ধে বলতে শুরু করবে। তখন ঐ ব্যক্তিকে আবার কথা বলতে দেওয়া হবে এবং সে তার নিজের হাত-পাকে বলবে, 'দূর হয়ে যাও। তোমাদের উপর আল্লাহ্র লা'নত পড়ুক। তোমাদের পক্ষ হয়ে আমি ফরিয়াদ করছিলাম।' " (মুসলিম)

নবী (সা.) এমন সব ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা করে গেছেন যেগুলোর কুর'আনে উল্লেখ নেই

বহু ক্ষেত্রেই কুর'আনে উল্লেখ রয়েছে এমন ব্যাপারে নবী (সা.) আরো বেশী পরিমাণ তথ্য সরবরাহ করে গেছেন। উদাহরণস্বরূপ কিয়ামতের দিন কি ঘটবে, জাহান্নামের আগুন কেমন হবে ইত্যাদি বিষয়ে নবী (সা.) অতিরিক্ত বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে গেছেন, কিন্তু এমন দুটি উদাহরণ রয়েছে যা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার দাবী রাখে।

সূরা কাহাফের ৬০ থেকে ৮২ নং আয়াতে আল্লাহ্ খিজির (আ.) এবং মূসা (আ.)-এঁর কাহিনীর বর্ণনা দেন। নবীও (সা.) এই ঘটনা নিয়ে আলাপ করেন। কিন্তু নবীর (সা.) বর্ণনায় এমন অনেক বিস্তারিত খুঁটিনাটি রয়েছে, যেসব কুর'আনে পাওয়া যাবে না। উদাহরণস্বরূপ নবীর (সা.) বর্ণনার শুরু হয় এইভাবে:

www.pathagar.com

"মূসা ইসরাইলী গোত্রের সামনে একটা বক্তৃতা দিতে দাঁড়ান এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'মানুষের মাঝে সবচেয়ে জ্ঞানী কে?' মূসা উত্তর দিলেন, 'আমি।' জ্ঞানের জন্য [তথ্যের জন্য] কেবল আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর না করার জন্য আল্লাহ্ তাঁকে তিরস্কার করলেন। তাই আল্লাহ্ তাঁর কাছে ওহী নাযিল করলেন: 'দুইটি সাগরের সন্ধিস্থলে আমাদের এক বান্দা রয়েছে, যে তোমার চেয়ে জ্ঞানী।' মূসা বললেন, 'হে আমার প্রতিপালক, আমি কিভাবে তাঁর সাক্ষাৎ পেতে পারি?' আল্লাহ বললেন, 'একটা মাছ নাও এবং সেটাকে একটা ঝুড়িতে ভর আর তারপর যাত্রা শুরু কর..... ।"

এখানে আল্লাহর রাসূল (সা.) ব্যাখ্যা করেছেন যে, কেন মূসা(আ.), খিজির (আ.)-এঁর খোঁজে বেরিয়েছিলেন এবং কুর'আনের এই সূরায় উল্লিখিত মাছের মাহাত্ম্যই বা কি? এই ভূমিকার মতোই, কুর'আনে বর্ণিত এই ঘটনার সাথে নবী (সা.) বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী তথ্য সরবরাহ করেছেন। এই কাহিনীর উপর মন্তব্য করতে গিয়ে **মুহাম্মাদ আল সিদ** বলেন,

"এই হাদীস এবং আরেকটি হাদীস যেখানে নবী (সা.) বলেন, 'আমাকে কিতাবখানি এবং যা তার সদৃশ তা দান করা হয়েছে'– প্রতীয়মান করে যে, কুর'আনের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে তাঁকে বিস্তর জ্ঞান দান করা হয়েছিল। এর ফলে কেবল তাঁকে কুর'আনের বিস্তারিত ব্যাখ্যার ব্যাপারে একটা একক কর্তৃত্ব দান করা হয়েছিল – কুর'আনে উল্লেখ করা হয়নি এমন সত্য খুঁটিনাটি যোগ করার মাধ্যমে। তাঁর তাফসীরের (বর্ণনার) তাই একটা অদ্বিতীয় মর্যাদা রয়েছে..... ।"[৮৭]

---

[৮৭] দেখুন: Page#208, *The Hermeneutical Problem of the Quran in Islamic History* - Muhammad al-Sid.

www.pathagar.com

এই ধরনের আরেকটি চমৎকার উদাহরণ হচ্ছে সূরা বুরুজের ঘটনাবলী এবং সে সম্বন্ধে নবীর (সা.) বিস্তারিত ব্যাখ্যা যা সহীহ মুসলিমে লিপিবদ্ধ রয়েছে, যেখানে আল্লাহ্য় বিশ্বাস করার জন্য একদল মানুষকে একটা গর্তে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে। এ ছাড়াও আল্লাহর রাসূল (সা.) এমন অনেক অভিব্যক্তির অর্থ ব্যাখ্যা করে গেছেন যেগুলো কুর'আন থেকে স্পষ্ট হয়না। উদাহরণস্বরূপ সূরা ফাতিহার ব্যাপারে আল্লাহ্র রাসূল (সা.) ব্যাখ্যা করে গেছেন যে, যাদের উপর আল্লাহর ক্রোধ পতিত হয়, তারা হচ্ছে ইহুদী সম্প্রদায় এবং যারা বিপথগামী হয়েছে তারা হচ্ছে খৃস্টান সম্প্রদায়[৮৮]।

এই কথাগুলো কেবল সূরা ফাতিহার সংশ্লিষ্ট আয়াত পড়ে কিছুতেই জানা যায় না। কিন্তু যেহেতু নবী (সা.) তা ব্যাখ্যা করে গেছেন, তারপরে তা আমাদের কাছে স্পষ্ট যে, ঐ আয়াতে তাদের কথাই বলা হয়েছে।

কুর'আন বুঝতে গিয়ে নবীর (সা.) জীবন বৃত্তান্তের শরণাপন্ন হওয়া

আরো একটা বিবেচ্য বিষয় রয়েছে, যা আমাদের দেখিয়ে দেয় যে, সঠিকভাবে কুর'আন বুঝতে হলে আমাদের নবীর (সা.) জীবনবৃত্তান্ত ও সুন্নাহর শরণাপন্ন হতে হবে। আরেকভাবে বলতে গেলে, যে কুর'আন বুঝতে চাইবে – তার জন্য আল্লাহ, নবীর (সা.) সুন্নাহ ও তাঁর জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে একটা ভাল জ্ঞান অর্জনকে অপরিহার্য করে দিয়েছেন। কেননা, তা করতে না পারলে, কুর'আনের বহু আয়াতের অর্থ অবোধ্য রয়ে যাবে। এ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে **হাবিবুর রহমান আজামী** বলেন:

---

[৮৮] তিরমিযীতে বর্ণিত - আলবানীর মতে সহীহ্।

www.pathagar.com

“কুর’আন ছাড়া যদি আর কোন নিশ্চিত জ্ঞানের উৎস না থেকে থাকে এবং নবীর (সা.) কাছ থেকে আসা বর্ণনাগুলো যদি অনির্ভরযোগ্য বলে প্রত্যাখ্যান করা হয়, তবে কুর’আনের বহু আয়াতের অর্থ ও গুরুত্ব অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে।” উদাহরণস্বরূপ কুর’আন বলে,

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَـٰكَهَا ﴿٣٧﴾

‘আর যায়েদ যখন তার কাছ থেকে তালাকের প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতাগুলো সম্পন্ন করলো, আমরা তখন তাকে তোমার কাছে বিয়ে দিলাম।’ (আল-আহ্যাব, ৩৩:৩৭)। সুন্নাহ বা হাদীসের শরণাপন্ন না হয়ে এবং সেসবের উপর আস্থা স্থাপন না করে এই আয়াতের পূর্ণ গুরুত্ব কি কখনো অনুধাবন করা যাবে? অথবা কেবল কুর’আন থেকে কি এটা কখনোই জানা সম্ভব যে যায়েদ কে ছিলেন, তাঁর স্ত্রী কে ছিলেন এবং সত্যি সত্যি কি ঘটেছিল..... ।

একইভাবে হাদীসের গোটা ভান্ডারকে যদি অপ্রয়োজনীয় ও অনির্ভরযোগ্য বলে বাতিল করে দেয়া হয়, তবে আহযাব, হুনায়েন ইত্যাদি যুদ্ধ সম্বন্ধে কুর’আনে যেসব ঘটনা উল্লিখিত রয়েছে সেগুলোর বিস্তারিত জানার কি আর কোন উপায়·থাকবে? আবারও আমরা কুর’আনে পড়ি :

وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآئِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ

‘এবং আল্লাহ তোমাদের কাছে দুইটি বাহিনীর একটি যে তোমাদের হবে [অর্থাৎ তোমাদের নিকট পরাজিত হবে] সে সম্বন্ধেও অঙ্গীকার করেছিলেন’ (সূরা আনফাল, ৮:৭) কেউ কি কেবল কুর’আন থেকে বলতে পারবেন যে, ঐ দুটি বাহিনী কি কি ছিল? এই অঙ্গীকার ঠিক

www.pathagar.com

কি ছিল কুর'আনের কোথাও কি বর্ণিত হয়েছে? কুর'আনে যদি তা না থেকে থাকে, তাহলে নবীর (সা.) কাছে আরেক ধরনের ওহী প্রেরিত হওয়াটা কি আবশ্যিক নয় ?

(এ ধরনের বেশ কিছু উদাহরণ দেওয়ার পর আজামী উপসংহারে বলেন:) এগুলো হচ্ছে কতিপয় উদাহরণ এবং এ ধরনের আরো অনেক উদাহরণ দেয়া যেতো। আমরা এখানে দেখাতে চেয়েছি যে, কুর'আনের বহু আয়াতের অর্থ বোঝা বা ব্যাখ্যা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াতো যদি অপ্রয়োজনীয় ও অনির্ভরযোগ্য বলে আমরা হাদীসসমূহকে অস্বীকার করতাম।"[৮৯]

কুর'আনের ব্যাখ্যাকারী হিসাবে নবীর (সা.) ভূমিকার ব্যাপারে উপসংহার

কুর'আনের ব্যাপারে নবীর (সা.) কর্মকান্ডকে নিম্নলিখিত পয়েন্টগুলো দ্বারা সারসংক্ষেপে প্রকাশ করা যায়।

১) কুর'আনের সাধারণ এবং সুনির্দিষ্ট আদেশসমূহকে ব্যাখ্যা করা। বহু সাধারণ বক্তব্যকে এবং অনির্দিষ্ট আদেশকে সুনির্দিষ্ট করে দেয়া।

২) কুর'আনের আদেশ-নিষেধের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা এবং প্রয়োগ বুঝিয়ে দেয়া।

---

[৮৯] দেখুন: Page#29-31, *The Sunnah in Islam: The Eternal Relevance of Teaching and the Example of Prophet Muhammad* - Habib-ur-Rahman Azami.

www.pathagar.com

৩) এমন কিছু বাক্যাংশের সঠিক অর্থ প্রদান করা, যেগুলোর অর্থগুলো জটিল ছিল, অথবা, যেগুলোর বহু সম্ভাব্য অর্থ ছিল, সেই সাথে কুর'আনের আয়াতসমূহের ব্যাপারে বিদ্যমান ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে সেগুলোকে শুদ্ধ করে দেয়া।

৪) অতিরিক্ত অনুশাসন এবং আইন-কানুন প্রদান করা - যেগুলো কুর'আনে পাওয়া যায় না, কিন্তু যেগুলো দ্বীন ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংশবিশেষ।

৫) কোন আয়াতগুলো মানসুখ [বাতিল] হয়ে গেছে এবং কোনগুলো হয়নি সেটা ঠিক করে দেয়া।

৬) তাঁর নিজের বক্তব্য দ্বারা কুর'আনের বহু আয়াতের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করা এবং জোর দেয়া। কুর'আনে উল্লেখ করা ঘটনাবলীর বিস্তারিত খুঁটিনাটি বর্ণনা করা।

এছাড়াও নবীর (সা.) জীবনের বহু ঘটনা ও দিকের কথা কুর'আনে যেভাবে উল্লিখিত হয়েছে, সে সম্বন্ধে কোন সত্যিকার ধারণা লাভ করতে হলে, যে কাউকেই নবীর (সা.) জীবনবৃত্তান্ত ও সুন্নাহর একটা ন্যূনতম জ্ঞান লাভ করতে হবে।

সত্যিকার অর্থে কুর'আন অনুযায়ী কিভাবে জীবন যাপন করতে হবে, তা জানতে চাইলে মুসলিমদের যে অবশ্যই তাঁর সুন্নাহর ভিতর তা খোঁজ করতে হবে, তার প্রমাণ স্বরূপ কুর'আনে আরো একটি নিদর্শন রয়েছে। এ ব্যাপারে, কোন প্রশ্নের অবকাশ নেই যে, কুর'আনে আল্লাহ যে জীবন-পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন, সেটাই হচ্ছে সিরাতুল

www.pathagar.com

মুস্তাক্বীম – আল্লাহর সন্তুষ্টি বয়ে আনবে এমন একটি জীবন পদ্ধতি। কিন্তু একই সময় আল্লাহ্ বলেনঃ

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْءَاخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

"যে আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে এবং বেশী বেশী আল্লাহকে স্মরণ করে, আল্লাহর রাসূলের (সা.) মাঝে নিশ্চয়ই তার জন্য এক চমৎকার উদাহরণ রয়েছে।" (সূরা আহযাব, ৩৩:২১)

যখন আল্লাহ্ ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ্র রাসূল (সা.) হচ্ছেন মুসলিমদের অনুসরণ করার যোগ্য শ্রেষ্ঠ উদাহরণ, তখন সেটা আল্লাহ্র তরফ থেকে এমন একটা ঘোষণা যে, আল্লাহ্র রাসূল (সা.) আসলে **সিরাতুল মুস্তাক্বীমের** উপর রয়েছেন – যে পথটার ব্যাপারে রয়েছে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। অথবা অন্য কথায়, এর অর্থ হচ্ছে এরকম যে, আল্লাহ্র রাসূলের (সা.) জীবন পদ্ধতি বা সুন্নাহই হচ্ছে কুর'আনের শিক্ষা অনুযায়ী এক জীবন পদ্ধতি। মূলত আল্লাহ্ এখানে বিশ্বাসীদের বলছেন, *"তোমরা যদি দেখতে চাও যে, কিভাবে শুদ্ধভাবে ও সর্বোত্তম উপায়ে কুর'আন প্রয়োগ করতে হয়, তবে আল্লাহর রাসূলের (সা.) উদাহরণের দিকে তাকিয়ে দেখ।"* আমরা যেমন আগে আলোচনা করেছি, এই একই কথা নবীর (সা.) স্ত্রী আয়েশার (রা.) কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়েছে, নবীর (সা.) চরিত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে যখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, *"তাঁর চরিত্র হচ্ছে কুর'আন।"*[১০]

[১০] মুসলিম।

www.pathagar.com

সারকথা হচ্ছে নবী (সা.) ছিলেন কুর'আনের বাস্তব প্রয়োগ, 'এক চলমান কুর'আন'– যেমনটা বলে কেউ কেউ তাঁকে সম্বোধন করতেন। আল্লাহ্ আরো বলেন:

وَإِنَّكَ لَتَهْدِيٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝ صِرَٰطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ أَلَآ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ۝

"এবং নিশ্চয়ই তুমি (হে মুহাম্মাদ, মানুষকে) সঠিক পথের দিক নির্দেশনা দাও। সেই আল্লাহর পথ, আকাশমন্ডলীতে যা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার সবকিছুই যাঁর। আল্লাহর কাছেই কিভাবে সব বিষয় পৌঁছে সেটা লক্ষ্য কর।" (সূরা শূরা, ৪২:৫২–৫৩)

এবং আল্লাহ্ বলেন:

كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْكُمْ ءَايَٰتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا۟ تَعْلَمُونَ ۝

"যেমন আমি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য একজন রাসূল পাঠিয়েছি, যিনি তোমাদের কাছে আমাদের বাণীসমূহ পাঠ করবেন এবং তোমাদের পবিত্র করবেন এবং তোমাদের কিতাব ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেবেন, এবং শিক্ষা দেবেন এমন বিষয় যা তোমরা জানতে না।" (সূরা আল–বাক্বারা, ২:১৫১)[৯১]

---

[৯১] আরো দেখুন: কুর'আন, ৩:১৬৪ ও ৬২:২।

www.pathagar.com

উপরে আমরা সূরা শূরার (৪২:৫২-৫৩) যে আয়াতগুলো উদ্ধৃত করেছি, সেখানে আল্লাহ্ বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) সরল পথের দিক নির্দেশনা দেন। পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে যে, কুর'আন নিজেই যে পথের বর্ণনা দেয়, সেটাই হচ্ছে সিরাতুল মুস্তাক্বীম বা সরল পথ। সুতরাং আল্লাহর রাসূল (সা.) এবং কুর'আন উভয়ে মুসলিমদের এক ও অভিন্ন সরল পথ দেখাচ্ছেন ও দিক-নির্দেশনা দিচ্ছেন, যা যে কাউকে আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে নিয়ে যায়। আর তাই তাদের একে অপরের সাথে সহাবস্থান করতে হবে এবং যে কাউকে, তাদের উভয়কেই একত্রে পথ নির্দেশক হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

উপরের আলোচনা থেকে এটা পরিস্কার হয়ে যাওয়া উচিত যে, নবীর (সা.) শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া এবং তিনি যেভাবে কুর'আন প্রয়োগ করেছিলেন, সেটা জানা ছাড়া কুর'আনকে শুদ্ধভাবে বোঝা সম্ভব নয়। সেজন্যেই কুর'আনের তাফসীরের সকল বিশেষজ্ঞগণ এ ব্যাপারে একমত যে কুর'আনের আয়াতসমূহের অর্থ বের করার জন্য প্রথম উৎস হচ্ছে খোদ কুর'আনের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ। আর দ্বিতীয় উৎসই হচ্ছে, নিঃসন্দেহে, আল্লাহর রাসূলের (সা.) বক্তব্য ও কর্মকান্ডসমূহ, কেননা, নিশ্চিতই, **তাঁর মুখ্য ভূমিকার একটি ছিল এই যে তিনি কুর'আন ব্যাখ্যা করবেন এবং সেটাকে এমনভাবে বাস্তব জীবনে প্রায়োগিক রূপ দেবেন, যেমনভাবে জীবনে অনুশীলন করার জন্য তা নাযিল করা হয়েছিল**। সাঈদ বিন যুবায়ের যখন রাসূল (সা.) এঁর একটি হাদীস উদ্ধৃত করছিলেন তখন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এলো এবং বললো, *"আল্লাহর কিতাবে এমন কিছু রয়েছে যা তুমি যা কিছু বললে তার চেয়ে ভিন্ন।"* সাঈদ তখন উত্তরে বাস্তবিক সত্যই

www.pathagar.com

বলেছিলেন, *"আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.), আল্লাহ্‌র কিতাব তোমার চেয়ে ভাল জানেন।"*[৯২]

আসলে এই সৃষ্টিতে যে কারো চেয়ে আল্লাহর রাসূল (সা.) আল্লাহ্‌র কিতাব ভাল জানেন এবং **কেউ যদি দাবী করেন যে, তিনি নবীর (সা.) চেয়ে এ ব্যাপারে বেশী জানেন বা বোঝেন, তবে তিনি আসলে একজন মুরতাদ**। এই আলোচনায় তাফসীরের দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎস প্রতিষ্ঠিত হলোঃ পবিত্র কুর'আন এবং নবীর (সা.) সুন্নাহ। কোন একটি আয়াতের এমন ব্যাখ্যা অনুমোদিত নয়, যা, এই দুটি উৎসের যে কোনটির সাথে বিরোধপূর্ণ হয়। এটা সত্য, কেননা এই দুটো উৎসই আসলে সরাসরি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আসে। এবং কেউই আল্লাহর কিতাবকে, যিনি তা নাযিল করেছেন তাঁর চেয়ে ভাল জানেন না। এই দুটো হচ্ছে তাফসীরের নিশ্চিত দুটো উৎস, যেগুলোকে ব্যক্তিগত যুক্তি-তর্ক বা ইজতিহাদ দ্বারা বিরোধিতা করা উচিত নয়। এ ব্যাপারে **আব্দুর রহিম** সঠিকভাবেই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যখন তিনি বলেন:

"এটা প্রতিষ্ঠিত যে, কুর'আনের তাফসীর ও ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নবী (সা.) যা কিছু বলেছেন, তা ছিল ওহী এবং যা আল্লাহ্‌ তাঁর অন্তরে মুদ্রণ করে দিয়েছিলেন ও জ্ঞান ও বিদ্যার যা কিছু বিশেষভাবে তাঁকে দেওয়া হয়েছিল তার উপর ভিত্তিশীল। আসলে আল্লাহ তাঁর উপর কুর'আন ব্যাখ্যা এবং তাঁর বাণীর অর্থসমূহ ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন .....। সুতরাং যে কেউ, যিনি কুর'আনের তাফসীর করবেন, তার জন্য এটা অবশ্যকরণীয় যে, তার তাফসীর যেন রাসূল (সা.)-এঁর কৃত তাফসীরের উপর ভিত্তি করে করা হয় এবং তা থেকে তিনি যেন বিচ্যুত না হন – তার পরিবর্তে কেবল আরবী বাক্যের দিকে

---

[৯২] দেখুনঃ Page#108, *Miftah al-Jannah fi al-Ihtijaaj bi al-Sunnah* - Jalaal al-Deen al-Suyooti

www.pathagar.com

নজর দিয়ে এর অর্থ বের করতে গিয়ে যেন ইজতিহাদ এবং ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধির শরণাপন্ন না হন।"[৯৩]

(২) এক স্বনির্ভর আইনের উৎস হিসেবে আল্লাহর রাসূলের (সা.) ভূমিকা

আল্লাহ্‌র রাসূলের (সা.) ভূমিকাগুলোর একটি ছিল **'আইনের উৎস'** হিসেবে কাজ করা এবং তিনি যেসব অধ্যাদেশ জারী করে গেছেন, সেগুলোকে অবশ্যই ইসলামী আইন ও শরীয়ার অংশ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। অন্য কথায় বলতে গেলে, আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আসা কিছু আদেশ এবং নির্দেশ কেবলমাত্র নবীর (সা.) মুখ থেকে জানা যায় – যেগুলো স্বনির্ভর, অর্থাৎ, কুর'আনের মাধ্যমে যা নাযিল হয়েছে তার বাইরে।

নবী (সা.) নিজেই এটা পরিস্কার করে দিয়ে গেছেন যে, নতুন আইন ও নিয়ম প্রণয়ন করা ছিল তাঁর দায়িত্বসমূহের একটি এবং মুসলিমদের উচিত তাঁকে সেই অধিকার ও দায়িত্বসম্পন্ন একজন হিসেবে দেখা। ইতিপূর্বে উল্লিখিত একটি হাদীসের বর্ণনায় এসেছে যে, আল্লাহর রাসূল(সা.) গৃহপালিত গাধার মাংস নিষিদ্ধ করেন এবং তারপর জোর দিয়ে বলেন:

"শীঘ্রই এমন একটা সময় আসবে, যখন একজন মানুষকে তার বিছানায় হেলান দেওয়া অবস্থায় পাওয়া যাবে এবং তাকে আমার একটা হাদীস সম্পর্কে বলা হবে এবং [তখন] সে বলবে, 'তোমাদের ও আমাদের মাঝে আল্লাহ্‌র কিতাব রয়েছে। আমরা সেখানে যা অনুমোদিত পাই তা অনুমোদন করি। আর সেখানে যা নিষিদ্ধ দেখতে পাই, তা নিষিদ্ধ করি।' কিন্তু আসলে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) যা নিষিদ্ধ

---

[৯৩] দেখুন: Page#415, *Lughat al-Quran al-Kareem* - Abdul Jaleel Abdul Raheem

www.pathagar.com

করেছেন, তা আল্লাহ যা নিষিদ্ধ করেছেন তার মতই।" (বাইহাকি, আহমাদ, তিরমিযী ও ইবন মাজাহ – আলবানীর মতে সহীহ)

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে এমন উদাহরণ রয়েছে, যেগুলোতে দেখা যায় যে, নবী (সা.) এমন একটি আইন বা অনুশাসনের ঘোষণা দিয়েছেন যা কুর'আনে পাওয়া যায় না। আল্লাহ্, যিনি সর্বোচ্চ এবং সবকিছু জানেন, তিনি ইসলামের সকল আইনকানুনকে কুর'আনের অন্তর্ভুক্ত করেন নি। ইসলামী আইনকানুনের কিছু কিছু আল্লাহ্ কেবল তাঁর রাসূলের (সা.) বক্তব্য ও কাজের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আল্লাহ কুর'আনে বলেন:

ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَٰلَ ٱلَّتِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِهِۦ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُوا۟ ٱلنُّورَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ مَعَهُۥٓ ۙ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

"সেই সমস্ত লোক, যারা এই রাসূলের আনুগত্য করে, যিনি নিরক্ষর নবী, যাঁর সম্পর্কে তারা নিজেদের কাছে রক্ষিত ইনজীল ও তাওরাতে দেখতে পায়, তিনি তাদেরকে সৎকর্মের নির্দেশ দেন, অসৎকর্ম থেকে বারণ করেন; তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল বলে ঘোষণা করেন ও হারাম বস্তুসমূহ নিষিদ্ধ করেন এবং তাদের উপর থেকে সেই বোঝা নামিয়ে দেন এবং বন্দীত্ব অপসারণ করেন যা তাদের উপর বিদ্যমান ছিল। সুতরাং যেসব লোক তাঁর উপর ঈমান এনেছে, তাঁর সাহচর্য অবলম্বন করেছে, তাঁকে সাহায্য করেছে এবং সেই নূরের

www.pathagar.com

অনুসরণ করেছে যা তাঁর সাথে অবতীর্ণ হয়েছে, শুধুমাত্র তারাই সফলতা অর্জন করতে পেরেছে।" (সূরা আ'রাফ, ৭:১৫৭)

এই আয়াত হচ্ছে আল্লাহর রাসূলের (সা.) একটা বর্ণনা। এখানে আল্লাহ রাসূলকে (সা.) এমন একজন বলে বর্ণনা করেন যিনি **'তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল বলে ঘোষণা করেন ও হারাম বস্তুসমূহ নিষিদ্ধ করেন এবং তাদের উপর থেকে সেই বোঝা নামিয়ে দেন এবং বন্দীত্ব অপসারণ করেন যা তাদের উপর বিদ্যমান ছিল।..... ।'** এটা এজন্য যে, আল্লাহর রাসূলকে (সা.) আল্লাহ্ নিজেই তাঁর অনুপ্রেরণার আওতায় আদেশ, নিষেধ ও আইন প্রণয়নের দায়িত্ব দান করেছেন। **এভাবেই আল্লাহর রাসূল (সা.) যা আদেশ করেছেন, তা আল্লাহ্ যা আদেশ করেছেন তার সমপর্যায়ের বলে গণ্য হয়।** উসমানী আরো একটা ব্যাপারের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেন যে, আয়াতের শেষে আল্লাহ্, নবীর (সা.) সাথে পাঠানো নূরের অনুসরণ করার কথা বলেন। আল্লাহ্ সুস্পষ্টভাবে তাঁর কিতাবের কথা উল্লেখ করেন নি, বরং তার পরিবর্তে আলোর কথা বলেছেন, যার ভিতর সব দিকনির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত – কিতাব এবং হিকমাহ দুটোই – যা নবী (সা.) আল্লাহ্র কাছ থেকে লাভ করেছিলেন।[৯৪]

আল-বাইহাকি লিপিবদ্ধ করেছেন যে, *ইমরান বিন হোসেন নবীর (সা.) মধ্যস্থতার কথা উল্লেখ করলেন। এক ব্যক্তি তাঁকে বললো, "হে আবু নাজিদ, তুমি এমন হাদীস বর্ণনা করো যেগুলোর (বিষয়বস্তু সংক্রান্ত) আলোচনা কুর'আনে পাওয়া যায় না।" ইমরান রেগে গেলেন এবং ঐ ব্যক্তিকে বললেন, "তুমি কি কুর'আন পড়েছো?" ঐ ব্যক্তি উত্তর দিল, 'হ্যাঁ'। ইমরান তাকে বললেন, "তুমি কি সেখানে পেয়েছো যে, রাতের সালাত চার রাকাত এবং মাগরিবের সালাত তিন রাকাত এবং ফজরের সালাত দুই রাকাত এবং যোহরের সালাত চার রাকাত*

---

[৯৪] দেখুন: Page#47, *The Authority of Sunnah* - Muhammad Taqi Usmani.

www.pathagar.com

এবং আসরের সালাত চার রাকাত?" ইমরান তাকে আরো বললেন, "তুমি কার কাছ থেকে নিয়মকানুন পাও? তুমি কি সেগুলো আল্লাহ্‌র রাসূলের (সা.) কাছ থেকে পাও না?"[৯৫]

কোন মুসলিমের এমন দাবী করা উচিত নয় যে, ফজরের সালাত দুই রাকাত হওয়াটা ইসলামী আইনের অন্তর্ভুক্ত নয়, কেননা সেটা স্পষ্টত কুর'আনে উল্লেখ করা হয় নি। সুতরাং এ কথাটা মানতে যে কেউ বাধ্য যে, এই নিয়মটা কুর'আন থেকে আসেনি বরং তা আল্লাহ্‌র রাসূলের (সা.) কাছ থেকে এসেছে। আর তাই তিনি হচ্ছেন আইনের এক স্বনির্ভর উৎস।

নবীর (সা.) আইন প্রণয়নের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র অনুমোদন

নবীর (সা.) এই ভূমিকার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র অনুমোদন এবং তাঁর মর্যাদার ব্যাপারটা, এমন সব আনুষ্ঠানিকতা যেগুলো নিশ্চিতভাবেই ইসলামের একটা অংশ বলে বিবেচিত হয় – যেগুলো নবী (সা.) প্রথমে শুরু করেছিলেন এবং আল্লাহ্ পরে কুর'আনে সেগুলো সমর্থন করেছিলেন – আর তার মাধ্যমে সেগুলো আরো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। {অবশ্যই নবীর (সা.) এ সমস্ত কাজের অনুপ্রেরণা ছিলেন স্বয়ং আল্লাহ্}উদাহরণস্বরূপ সেই জানাজার সালাত যার কথা সূরা আত-তাওবায় উল্লেখ করা হয়েছে:

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ ... ﴿٨٤﴾

"আর তাদের মধ্য থেকে [মুনাফিকদের মধ্য থেকে] কারো মৃত্যু হলে আর কখনো সালাত আদায় করবেন না এবং তার কবরে দাঁড়াবেন না.. ।" (আত-তাওবা, ৯:৮৪)

---

[৯৫] দেখুন: Page#21, *Miftah al-Jannah fi al-Ihtijaaj bi al-Sunnah* - Jalaal al-Deen al-Suyooti

www.pathagar.com

এই আয়াত জানাজার সালাত সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে বলে সাধারণভাবে বোঝা হয়। এই আয়াতের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে **হাবিবুর রহমান আজামী** বলেন:

"এই আয়াতের নিহিতার্থ হচ্ছে এই যে, জানাজার আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদন করা তখন শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং নবী (সা.) এই আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বেই মৃতদেহ সমাহিত করার আগে জানাজার সালাত সম্পাদন করতেন; অথচ, এই আয়াতের পূর্বে নাযিল হওয়া এমন কোন আয়াতের উদাহরণ পাওয়া যায় না, যেখানে জানাজার আনুষ্ঠানিকতার ব্যাপারে নবীকে (সা.) এবং মুসলিমদের কোন নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এখান থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে, জানাজার আনুষ্ঠানিকতার আদেশ সুন্নাহর মাধ্যমেই দেওয়া হয়েছিল।"[৯৬]

হাবিবুর রহমান আজামী আর একটা উদাহরণ দিতে গিয়ে আযানের কথা বলেন। তিনি বলেন:

"এমন কেউ নেই যে নিজেকে একজন মুসলিম হিসেবে দাবী করে, অথচ, আযান বা সালাতের জন্য দেয়া ডাক, যা নবীর (সা.) সময় থেকে এই পর্যন্ত মুসলিমরা অনুসরণ করে চলেছেন – সেটা যে একটা ধর্মীয় আচার তা অস্বীকার করে। কুর'আনে আযানের কথা একবার উল্লিখিত হয়েছে সূরা আল মায়িদায় – নির্বোধ, অবিশ্বাসীরা যে বিদ্রূপাত্মকভাবে এটাকে অনুসরণ করে এবং ঠাট্টার অভিব্যক্তি দেখিয়ে এটাকে উপহাস করে, সেটা বলতে গিয়ে। এবং আর একটা প্রসঙ্গে সূরা জুমুআয় এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর একটি আদেশের সাথে সম্পৃক্ততা সহকারে... । যদিও এই আয়াতগুলো থেকে জানা

---

[৯৬] দেখুন: Page#32, *The Sunnah in Islam: The Eternal Relevance of Teaching and the Example of Prophet Muhammad* - Habib-ur-Rahman Azami.

www.pathagar.com

যায় যে, আযান তখনকার মুসলিমদের ভিতরে একটা প্রতিষ্ঠিত প্রথা ছিল, কিন্তু কুর'আনে এমন একটি আয়াতও খুঁজে পাওয়া যাবেনা, যার মাধ্যমে আযানকে বিশ্বাসীদের জন্য নির্ধারিণ করে দেওয়া হয়েছিল। এটা স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যায় যে, আযানের নির্দেশ কুর'আনের মাধ্যমে দেওয়া হয়নি, কিন্তু সুন্নাহর মাধ্যমে দেওয়া হয়েছিল।"[৯৭]

উপরের আলোচনার উদ্দেশ্য এটা দেখানো যে, **নবী (সা.) যা কিছুকে দ্বীনের অংশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন, তা আল্লাহ্ কর্তৃক অনুমোদিত**। উপরের দুটো উদাহরণে নবী (সা.) যেসব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেরকমের কিছু প্রথার স্পষ্ট অনুমোদন পরিলক্ষিত হয়। কুর'আনে পাওয়া যায় না - এ ধরনের কর্মকান্ড প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে কুর'আনের কোথাও নবীর (সা.) বিরুদ্ধে কোন বক্তব্য কেউ খুঁজে পাবে না। উপরন্তু শেষ নবী, যাঁর বাণী এবং শিক্ষা কিয়ামত পর্যন্ত সবার জন্য প্রযোজ্য থাকবে, তিনি যদি এমন কোন বক্তব্য রাখতেন অথবা এমন কোন প্রথা প্রতিষ্ঠিত করতেন, যা দ্বারা দ্বীনের একটা অংশ গঠিত হওয়ার কথা ছিল না, তাহলে যে কেউ আশা করতে পারতো যে, আল্লাহ্ নিশ্চয়ই স্পষ্টভাবে এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় দেখিয়ে দিতেন যে, ঐ সব আচরণগুলো দ্বীনের কোন অংশ নয় – অথবা – নবীর(সা.) দ্বীনের কোন প্রথা প্রতিষ্ঠিত করার অধিকার নেই। কেউ এ ধরনের কিছুই খুঁজে পাবে না। বাস্তবে যে কেউ কেবল উল্টোটাই খুঁজে পাবেঃ **পূর্বে উদ্ধৃত বহু আয়াত যেগুলোতে নবী তাদের যে নির্দেশ দিয়েছেন, তা মেনে নেয়ার এবং অনুসরণ করার ব্যাপারে মুসলিমদের তাগিদ দেওয়া হয়েছে**। সেগুলোর সাথে সাথে বরং নবী যা প্রতিষ্ঠিত করেছেন সেগুলোর অনুমোদন বা স্বীকৃতি দেখতে পাওয়া যায়।

---

[৯৭] দেখুনঃ Page#33, *The Sunnah in Islam: The Eternal Relevance of Teaching and the Example of Prophet Muhammad* - Habib-ur-Rahman Azami.

www.pathagar.com

কুর'আনে কোন ভিত্তি নেই এমন একটি সুন্নাহ

কুর'আনের সাথে সম্পর্কের নিরিখে স্কলারগণ সুন্নাহকে তিনভাগে ভাগ করেছেন:

১> এমন সুন্নাহ যা কিনা কুর'আনে যা রয়েছে তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে কিংবা তাকে সমর্থন করে।

২> এমন সুন্নাহ যা কুর'আনে যেসব আদেশ নিষেধ রয়েছে সেগুলোকে ব্যাখ্যা করে।

৩> এমন সুন্নাহ, খোদ কুর'আনে যার কোনই ভিত্তি নেই।

ইমাম **আল শাফিঈ** বলেন: *"আমি এমন কোন স্কলারকে জানি না যিনি এই কথাটা মানেন না যে, নবীর সুন্নাহ্ তিনটি শ্রেণীর একটিতে পড়ে, যার দুটোর ব্যাপারে সকলের ঐক্যমত রয়েছে। .... প্রথম [শ্রেণীতে রয়েছে], এমন কর্মকান্ড যেগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে অনুমোদন দিয়েছেন – রাসূল (সা.) কেবল কিতাবে যা রয়েছে তা পরিস্কারভাবে সুনির্দিষ্ট করে দিয়ে গিয়েছেন। দ্বিতীয় [শ্রেণীতে রয়েছে], আল্লাহর কিতাবে বর্ণিত রয়েছে এমন জটিল বিষয়সমূহ – নবী সেগুলোর প্রযোজ্য অর্থ নির্দিষ্টভাবে বলে গেছেন। এগুলো হচ্ছে সেই দুটো শ্রেণীর সুন্নাহ্ যে ব্যাপারে স্কলাররা মতানৈক্য পোষণ করেন না। তৃতীয় শ্রেণীতে রয়েছে এমন সব বিষয় যেগুলো রাসূলের (সা.) সুন্নাহয় তিনি প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন এবং যেগুলো সম্বন্ধে [আল্লাহর] কিতাবে কোন বক্তব্য নেই।"*[৯৮]

---

[৯৮] দেখুন: Page#120, *Islamic Jurisprudence: Shafi'i's Risala* - Majid Khadduri.

www.pathagar.com

প্রথম দুটো শ্রেণীর ব্যাপারে সকল স্কলাররা একমত। তৃতীয় শ্রেণীর ব্যাপারে কিছু মতানৈক্য রয়েছে। বেশীর ভাগ স্কলারই তৃতীয় শ্রেণীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। এ ব্যাপারে উদাহরণ দিতে গিয়ে তাঁরা নিম্নলিখিত অনুশাসনগুলো উল্লেখ করেন, যেগুলোর ব্যাপারে দৃশ্যত কুর'আনে কোন উৎস নেই: অবিবাহিত ব্যভিচারীকে এক বছরের জন্য নির্বাসনের বাধ্যবাধকতা, রমাদান মাসে দিবাভাগে সংসর্গে লিপ্ত হবার কাফফারা, সোনা ও রেশম পরিধানের ব্যাপারে পুরুষের উপর নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি। আসলে সকল স্কলারই স্বীকার করেন যে, এই ধরনের সুন্নাহর অস্তিত্ব রয়েছে। তাদের কিছু অবশ্য দাবী করেন যে, এমনকি এগুলোর উৎসও খুঁজতে গিয়ে কুর'আনে পৌঁছা যাবে।

যারা বিশ্বাস করেন যে, এমনকি এই তৃতীয় শ্রেণীর সুন্নাহর উৎসও কুর'আনে খুঁজে পাওয়া যাবে তাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন **আল-শাতিবী**। তিনি বলেন:

*"সুন্নাহর মর্মার্থ সবসময় আল্লাহর কিতাবের উৎসমূলে ফিরে যায় – কেননা এটা হচ্ছে কুর'আন যা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেনি তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা, জটিল বিষয়ের ব্যাখ্যা এবং যা কিছুকে তা (কুর'আন) সংক্ষেপে ছুঁয়ে গেছে তার ব্যাখ্যা। এটা এমন যে, এটা [সুন্নাহ] হচ্ছে কেবলই কিতাবের ব্যাখ্যা। আর আল্লাহর বাণীতে এ ব্যাপারটা ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, **'আমরা তোমার কাছে কুর'আন নাযিল করেছি মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছিল।'** (সূরা নাহল, ১৬:৪৪)। সুন্নাহতে এমন কোন আদেশ পাওয়া যায় না যার অর্থ হয় একটি সাধারণ না হয় সুনির্দিষ্ট নির্দেশের মাধ্যমে কুর'আন কর্তৃক চিহ্নিত না হয়েছে।"*[৯৯]

এই শতাব্দীর ইসলামী আইনতত্ত্বের একজন বিশেষজ্ঞ **মুহাম্মাদ আবু**

---

[৯৯] দেখুন: Page#314-316, Vol. 4, *Al-Muwaafaqaat* - Ibraheem al-Shaatibi.

www.pathagar.com

জাহরা বলেন:

"কেউ কদাচিৎ সুন্নাহ্‌র এমন কোন অনুশাসনের উদাহরণ খুঁজে পাবে যার ব্যাপারে কুর'আনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন সূত্র নেই।"[১০০]

আবার এসব স্কলাররা এটা স্বীকার করবেন যে, কেউ এমন কোন সুন্নাহ খুঁজে পাবে, কুর'আনে যেটার কোন সরাসরি উৎস নেই। তারা আসলে যা দাবী করছেন তা হচ্ছে এই যে, কেউ যদি খোঁজ করে এবং গভীরভাবে চিন্তা গবেষণা করে, তাহলে প্রতিটি সুন্নাহর ব্যাপারেই তারা কুর'আনের এমন একটি আয়াত খুঁজে পাবে, যা কোন না কোনভাবে নবীর সেই সুন্নাহর প্রতি ইঙ্গিত করে – যদিও বা সেই ইঙ্গিত খুব অস্পষ্টও হয়। এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই যে **আল-শাতিবী** এবং **আবু জাহরার** মতামত হচ্ছে দুর্বলতম। কখনো কখনো তাদের তত্ত্বকে গ্রহণযোগ্যতা দিতে তাদেরকে যে অনেক দূরে সরে যেতে হয়েছে, সেটা স্বীকার করতে এমনকি আল-শাতিবী বাধ্য হয়েছেন।

কিন্তু তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে এই যে, নবীর (সা.) আনুগত্য করার ব্যাপারে কুর'আনের আদেশ হচ্ছে এক শর্তহীন আদেশ। অর্থাৎ, তিনি যা কিছু প্রচার করেছেন – তা কুর'আনের ব্যাখ্যাই হোক অথবা নতুন কোন আইন প্রণয়নই হোক – সব ব্যাপারেই তার আনুগত্য করা আবশ্যক।

আল সিয়াবী, আল তুর্কী এবং অন্যান্যরা যেমন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন – বাস্তবে এ ব্যাপারে মতপার্থক্য হচ্ছে কেবলই শব্দার্থিক। অন্য কথায় বলতে গেলে, স্কলারদের উভয় পক্ষই সুন্নাহ্‌য় যা কিছু পাওয়া যায় তা গ্রহণ করেন। তাদের কেউই কখনোই এমন দাবী করেন নি যে, তিনি

[১০০] দেখুন: Page#88, *Usool al-Fiqh* - Muhammad Abu Zahrah.

www.pathagar.com

একটি সুন্নাহকে কেবল তখনই মানবেন, যদি তিনি সে সম্বন্ধে গবেষণা করে কুর'আনে সেটার উৎস খুঁজে পান।

প্রতিটি সুন্নাহরই কুর'আনে একটি ভিত্তি থাকবে - এই মতের দুর্বলতা অনুধাবন করাটা কেন গুরুত্বপূর্ণ সেটা আলোচনা করা উচিত। এই মত, মানুষজনের জন্য এমন দাবী করার সুযোগ করে দেয় যে, কোন নির্দিষ্ট সুন্নাহর ব্যাপারে যদি কুর'আনে সংশ্লিষ্ট উৎস খুঁজে না পাওয়া যায়, তবে কাউকে আর সেটার অনুসরণ করতে হবে না। অপর কথায়, ***একটি হাদীসে যা রয়েছে কুর'আনে তার কোন ভিত্তি নেই*** – তাদের এই দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে, তারা ঐ হাদীস অনুসরণ করতে অস্বীকার করতে পারে এই যুক্তি উপস্থাপন করে যে, ইসলামের ভিত্তি হচ্ছে কুর'আন এবং প্রতিটি অনুশাসনের কুর'আনে অবশ্যই কোন উৎস থাকতে হবে।[১০১]

যদিও কখনো কখনো মানুষ এই যুক্তির শরণাপন্ন হয়, তবুও এই ধরনের যুক্তিতর্ক ভ্রান্ত। নবী (সা.) নিজে একটি হাদীসে এই ব্যাপারে সাবধান করে দিয়ে গেছেন যা আমরা ইতিমধ্যেই উদ্ধৃত করেছি: ***"শীঘ্রই এমন একটা সময় আসবে, যখন একজন মানুষকে তার বিছানায় হেলান দেওয়া অবস্থায় পাওয়া যাবে এবং তাকে আমার একটা হাদীস সম্পর্কে বলা হবে এবং [তখন] সে বলবে, 'তোমাদের ও আমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব রয়েছে। আমরা সেখানে যা অনুমোদিত পাই তা অনুমোদন করি। আর সেখানে যা নিষিদ্ধ দেখতে পাই, তা নিষিদ্ধ করি।' কিন্তু আসলে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) যা নিষিদ্ধ করেছেন, তা আল্লাহ্ যা নিষিদ্ধ করেছেন তার মতই।"*** (বাইহাকি,

---

[১০১] অনেক সময়ই মানুষকে প্রশ্ন করতে দেখা যায়: *"এই ব্যাপারটার প্রমাণ কি? আমি কুর'আনের আয়াত থেকে প্রমাণ চাই, হাদীস থেকে নয়!"* আমাকে একবার বাংলাদেশের একজন স্বনামধন্য ডাক্তার একটি সহীহ্ হাদীস সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছিলেন, *"এটা কি কুর'আন দ্বারা authenticated?"* এসব প্রশ্ন নিশ্চিতই সুন্নাহ্ সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা ও ভুল ধারণা প্রমাণ করে।

www.pathagar.com

আহমাদ, তিরমিযী ও ইবন মাজাহ – আলবানীর মতে সহীহ্)। যেহেতু আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) ইসলামী আইনের এক স্বাধীন উৎস, সেহেতু কেউ এমন কিছু সুন্নত কর্মকান্ডের জ্ঞান লাভ করতে পারে, যার কুর'আনে কোন উৎস নেই বলে -অথবা- সে সম্বন্ধে কুর'আনে কোন সংশ্লিষ্ট বক্তব্যও নেই বলে মনে হতে পারে। এ ব্যাপারে **ইমাম শাফিঈ** বলেন:

"যেসব বিষয়ে আল্লাহ্‌র কিতাবে বক্তব্য রয়েছে, সেগুলো এবং অন্যান্য বিষয়ে যেগুলোর ব্যাপারে সেখানে কোন নির্দিষ্ট বক্তব্য নেই, সেসবের জন্যও নবী (সা.) সুন্নাহ্ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কিন্তু তিনি যা কিছুকে সুন্নাহ্ বলে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন, আল্লাহ আমাদের সেগুলো মেনে চলতে বলেছেন এবং তিনি [আল্লাহ] তাঁর [নবীর (সা.)] প্রতি আনুগত্যকে তাঁর নিজের প্রতি আনুগত্য বলে গণ্য করেন। এবং তাঁকে মান্য করতে অস্বীকার করাকে তাঁর [আল্লাহর] প্রতি অবাধ্যতা বলে গণ্য করেন। সেজন্য কোন মানুষকে ক্ষমা করা হবে না।"[১০২]

সবশেষে, **আল-আমিন** বলেন যে, **এমন যদি কোন সুন্নাহ্ না থাকতো যেগুলোকে কোন না কোন ভাবে কুর'আনের আয়াতসমূহ থেকে বের করে আনা হয়নি, তাহলে নবীকে (সা.) মেনে চলার ধারণাটার কোন তাৎপর্যই থাকতো না।** অপর কথায়, যে কেউ বাস্তবে তখন কেবল কুর'আনেরই আনুগত্য করতো, নবীর নয় – কেননা তিনি যাই আদেশ করতেন, তার উৎস হতো কুর'আনের সংশ্লিষ্ট কোন আয়াত। **সেক্ষেত্রে কুর'আনের বহু সংখ্যক আয়াত যেগুলোতে নবীর (সা.) আনুগত্য করার আদেশ দেয়া হয়েছে সেগুলো বাহুল্য ও অর্থহীন হয়ে যেতো।**[১০৩]

---

[১০২] দেখুন: Page#119, *Islamic Jurisprudence: Shafi'i's Risala* - Majid Khadduri.
[১০৩] দেখুন: Page#51, Vol.1, *Mauqaf al-Madrasah al-Aqliyyah min al-Sunnah al-Nabawiyyah* - Al-Ameen al-Saadiq al-Ameen.

www.pathagar.com

(৩) আচরণের আদর্শ হিসেবে নবীর (সা.) ভূমিকা

আল্লাহ্ কুর'আনে বলেন:

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْءَاخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

"তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতের আশা করে ও আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করে, তাদের জন্য আল্লাহ্র রাসূলের মাঝে রয়েছে এক চমৎকার আদর্শ।" (সূরা আহ্যাব, ৩৩:২১)

এই আয়াত রাসূলের (সা.) আরেকটি ভূমিকাকে সামনে নিয়ে আসে। ইসলামের বাণী নিয়ে ফেরেশতা বা ফেরেশতা-সদৃশ কাউকে না পাঠিয়ে, আল্লাহ্ সব সময় মানুষকে নবী ও রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন।

আল্লাহ্ এমনকি কুর'আনে এটাও উল্লেখ করেন যে, এসব মানুষেরা [সাধারণত] বিয়ে করেছেন এবং সন্তান লাভ করেছেন ও জনগোষ্ঠীর মাঝে বসবাস করেছেন। আসলে, আল্লাহ্ কখনো কখনো মানুষের মাঝে পাঠ করার জন্য, একটা নির্দিষ্ট কিতাব ছাড়াও রাসূল প্রেরণ করেছেন। কিন্তু এমনটা কখনোই হয়নি যে আল্লাহ, উদাহরণস্বরূপ, একটা পাহাড়ের উপর একখানা কিতাব প্রেরণ করেছেন – একজন রাসূলের মাধ্যম ছাড়া।

এই কর্মপদ্ধতির পিছনে পূর্ণ প্রজ্ঞা সম্বন্ধে একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন। তবু কোন কোন স্কলার এই সত্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, আল্লাহ্ এসব মানুষদের [নবী-রাসূলদের] এজন্য পাঠিয়েছেন যে,

www.pathagar.com

দৈনন্দিন জীবনে আল্লাহ্‌র বাণীকে কিভাবে প্রয়োগ করতে হবে সে ব্যাপারে তাঁরা যেন বিশ্বাসীদের একটা নিখুঁত উদাহরণ দেখিয়ে যেতে পারেন। বিশ্বাসীদের নিজেদের সামনে একজন রক্তমাংসের মানুষের উদাহরণ থাকছে। সেই উদাহরণ [অর্থাৎ নবী/রাসূল] বিশ্বাসীদের একজন মানুষের কর্মক্ষমতা (এবং সেইসাথে সীমাবদ্ধতাও) দেখিয়ে দিয়ে গেছেন এবং তাদের কাছে প্রমাণ করে গেছেন যে, তারা নিজেরা আসলে তাদের ধর্মের প্রয়োজনীয় দিকগুলো এবং আদেশ-নিষেধগুলো বাস্তবায়ন করতে সক্ষম – নবীগণ নিজেরা যেভাবে সেগুলো বাস্তবায়ন করে গেছেন তার দিকে দৃষ্টি রেখে। এ ছাড়াও এই সব নবীরা আল্লাহ্‌র বাণী কিভাবে বুঝতে ও প্রয়োগ করতে হবে, সে ব্যাপারে মানুষকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দান করে গেছেন।

এটা কল্পনা করা যায় না যে, এ ধরনের নিখুঁত উদাহরণ ছাড়া বিশ্বাসীদের কি ঝামেলায়ই না পড়তে হতো। কেউ খৃস্টধর্মের কৃচ্ছ্রতা অবলম্বনকারীদের কথাটাই ভেবে দেখতে পারেন [ঐতিহাসিক সামগ্রী (বা তাদের সুন্নাহ্‌) হারিয়ে যাওয়ায়, তাদের কাছে তাদের রাসূলের শুদ্ধ উদাহরণের কিছুই আর অবশিষ্ট নেই] যে, আজ তারা তাদের প্রভুকে সন্তুষ্ট করতে কি চরম পন্থাই না অবলম্বন করে থাকেন। আল্লাহ্‌ উপবাসের প্রশংসা করেন, কিন্তু কত ঘন ঘন কেউ রোজা রাখবে? সম্ভবত প্রতিদিন! আর একটানা উপবাসের ব্যাপারটা কেমন? ইসলামে এই ধরনের সকল প্রশ্নের উত্তর নবীর জীবনের উদাহরণের মাঝে খুঁজে পাওয়া যাবে। তাঁর আচরণের খুঁটিনাটি জানা আছে এবং তা হাদীস সাহিত্যে সংরক্ষিত রয়েছে। সুতরাং একজন মুসলিম জানেন যে, তার প্রভুকে সন্তুষ্ট করতে তাকে ‘কতদূর’ যেতে হবে। তিনি এটাও বুঝবেন যে, কখন তিনি ‘বাড়াবাড়ি’ করছেন। এমন পর্যায়ের বাড়াবাড়ি যা, আল্লাহ্‌ তাঁর সৃষ্টির কাছ থেকে যা চান তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

www.pathagar.com

সূরা আহ্‌যাবের একুশ নম্বর আয়াতে, আমাদের এ ধরনের তিনজন লোকের কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয় যারা রাসূলের (সা.) সুন্নাত সম্বন্ধে জানতে চেয়ে বলেছিলেন যে, তারা নবী (সা.) যা করছিলেন, তার চেয়েও অতিরিক্ত কিছু করবেন। একজন বলেছিলেন যে, তিনি প্রতিদিন রোজা রাখবেন, অপরজন বলেছিলেন তিনি সারারাত সালাত আদায় করে কাটাবেন, আর তৃতীয়জন বলেছিলেন যে, তিনি কখনো বিয়ে করবেন না। এসব শুনে, রাসূল (সা.) রেগে গিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে, তিনি কখনো রোজা রাখেন এবং কখনো রাখেন না। তিনি রাতের একাংশ ঘুমিয়ে কাটান ও অপর অংশে সালাত আদায় করেন এবং তিনি বিয়েও করেন। এইটুকু বলার পর তিনি পরিস্কার ভাষায় সতর্ক করে দেন: *"যে আমার সুন্নাহ্ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে আমার কেউ নয়।"* (বুখারী ও মুসলিম)

অন্য কথায় যে নবীর সুন্নাহকে প্রত্যাখ্যান করে, সে আসলে রাসূল হিসাবে এবং বিশ্বাসীদের জন্য এক উদাহরণ হিসাবে তাঁর ভূমিকাকে প্রত্যাখ্যান করলো এবং সেই সুবাদে সে আল্লাহ্‌র নবী হিসাবেই তাঁকে অস্বীকার করলো। *আরেকটা ঘটনায় একজন সাহাবী রোজা রাখা অবস্থায় চুমু খাওয়া নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। নবীর (সা.) একজন স্ত্রী তাঁকে এই তথ্য প্রদান করলেন যে, তিনি এবং নবী (সা.) রোজা রাখা অবস্থায় চুম্বন করে থাকেন। ঐ সাহাবী তখন উত্তর করলেন যে, তার স্বভাব আল্লাহর রাসূলের (সা.) স্বভাবের মত নয়, আর তাই তিনি রোজা রাখা অবস্থায় চুম্বন করা থেকে বিরত থাকবেন, যদিও তিনি জানলেন যে নবী (সা.) ব্যাপারটাকে বৈধ মনে করেন। নবী (সা.) তখন ঐ লোকের ভ্রান্ত ধারণাকে শুধরে দিতে গিয়ে বললেন যে, তিনি আল্লাহ্ সম্পর্কে সবচেয়ে সচেতন এবং আল্লাহ্ কি পছন্দ করেন আর করেন না – সে সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী জ্ঞানী। তিনি বলেন: "মানুষজনের সমস্যা কোথায় যে, তারা আমি যা করি তা থেকে বিরত থাকে? আল্লাহ্‌র শপথ, আল্লাহ্ সম্বন্ধে আমি নিশ্চিতই সবচেয়ে জ্ঞানী*

www.pathagar.com

এবং তাঁর ভয়ে সবচেয়ে বেশী ভীত।" (বুখারী)। সুতরাং তিনি হচ্ছেন সেই উদাহরণ যাঁকে বিশ্বাসীদের অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে।

আল্লাহ্র অশেষ রহমতে একজন মুসলিম আল্লাহ্র রাসূলের (সা.) হাদীসসমূহ পড়তে পারে এবং কার্যত এই নিখুঁত মডেল বা উদাহরণের ছবি মানসচক্ষে দেখতে পায়। এটা কেবল মুহাম্মাদের (সা.) উম্মাহর প্রতি আল্লাহ্র এক বিশেষ রহমত। পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলো কখনোই তাদের নবীর হাদীস সংকলনের এমন পদ্ধতি অনুসরণ করেনি, যা তাদের নবীদের জীবনের বিস্তারিত খুঁটিনাটি সংরক্ষিত রেখেছে। তাদের জন্য সেই মূল্যবান তথ্য হারিয়ে গেছে, কিন্তু শেষ নবীর (সা.) বেলায় সেগুলো সংরক্ষিত রয়েছে, যেন গোটা মানবকুল সেখান থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে এবং ঐ চমৎকার উদাহরণ অনুসরণ করতে পারে।

অনেক লেখক/গবেষকই নবীর (সা.) এই ভূমিকার গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। **অনেক সময়ই যারা নবীর (সা.) সুন্নাহ্কে অস্বীকার করার ব্যাপারে জেদ ধরেন, তারা আসলে ইসলামের মহৎ শিক্ষার বাস্তব অনুশীলন থেকে পালিয়ে বেড়াবার চেষ্টা থেকেই তা করেন। মুখে যদিও তারা পরহেজগারীর দাবী করেন এবং বলেন যে, তারা ইসলামের নৈতিক দিকগুলোয় বিশ্বাস করেন। তাদের এ সমস্ত দাবী যদিও নবীর কোন কর্মকান্ড দ্বারা সমর্থিত নয় – বরং তারা যেসবকে গ্রহণযোগ্য ও সহজ মনে করেন, সে সবের উপর ভিত্তি করেই গঠিত। নবী (সা.) যে মানদন্ডের উদাহরণ রেখে গেছেন, তার পরিবর্তে তারা নিজেরাই নিজেদের পরহেজগারীর মানদন্ড ঠিক করে নিয়েছেন। যদিও আল্লাহ্ বলেছেন যে, নবী (সা.) হচ্ছেন সিরাতুল মুস্তাক্বীমের নিখুঁত দৃষ্টান্ত। কোন ব্যক্তি যদি নবীর (সা.) দৃষ্টান্ত অনুসরণ করাটা প্রত্যাখ্যান করে, তবে সে পরহেজগারীর অথবা**

www.pathagar.com

ইসলামের নৈতিক শিক্ষায় বিশ্বাসের যত বড় দাবীদারই হোক, সে আসলে শুদ্ধ নৈতিকতার ভিত্তিতে আচরণ করা বলতে কি বোঝায় সেটাই ঠিকমত বোঝেনি।

উপরন্তু সদগুণ এবং সৎকর্ম সম্বন্ধে বায়বীয় কথা বলা সহজ। কিন্তু কিভাবে আচরণ করতে হবে এবং কর্ম সম্পাদন করতে হবে সে ব্যাপারে একটা সঠিক ধ্যান-ধারণা লাভ করতে হলে বাড়তি কিছুর প্রয়োজন রয়েছে। এ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে **এস,এম,ইউসুফ** আল্লাহ্‌র রাসূলের (সা.) উদাহরণকে এক বাস্তব রূপ বলে আখ্যায়িত করেন:

"আসমানী পথ-নির্দেশনার প্রশ্ন যখন আসে, তখন একজন সাধারণ মেধার মানুষও একটা বাস্তব রূপকে (উদাহরণকে) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে। মূল্যবোধগুলোর কথা যখন আসে, তখন বলতে হয় এগুলো 'মা'রুফের' আওতাভুক্ত, অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের মাঝে ভাল ও মন্দের যে জ্ঞান থাকে। কিন্তু কোন একটা নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে কিভাবে সৎকাজ সম্পন্ন করতে হবে তা নির্ধারণ করতে গিয়ে, একজন সাধারণ মানুষ কিছুটা অনিশ্চিত ও অসহায় বোধ করবে। এবং এরকম একটা পরিস্থিতিতে মানুষের সহজাত প্রজ্ঞা অকার্যকর হতে পারে এবং সে একটা নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে দ্বিধান্বিত হতে পারে – এবং এখানেই তাকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুযায়ী একজন নবী ঐ পরিস্থিতিতে কি করেছেন তা জানানো হয়। সকল আকার ও প্রকারে একটা সৎকাজকে কিভাবে বাস্তবায়িত করতে হয়, তার বর্ণনা একজন মানুষের জন্য, সহজাত মূল্যবোধকে কিভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে তার ব্যাপারে 'বাইরে থেকে' আসা একটা সাহায্য হিসাবে কাজ করে। আর এজন্যই একজন বিশ্বাসীর, সুন্নাহ্‌র সম্পদ কাজে লাগানো এবং সুন্নাহ্‌র নিয়মকানুনের সাথে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকা উচিত, কারণ এটাই হচ্ছে সদগুণাবলীর বাস্তব রূপ – যা কিনা ধর্মকে মহিমান্বিত করে। -----

www.pathagar.com

কিন্তু যখনই বাস্তব পরিস্থিতিতে একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি বেছে নেয়ার প্রশ্ন ওঠে, তখনি সহজাত প্রবণতা এবং যুক্তিভিত্তিক চিন্তার অপর্যাপ্ততা ধরা পড়ে। তখন কেবলমাত্র দুইটি বিকল্প পথ খোলা থাকে ; বিনীতভাবে এটা স্বীকার করে নেয়া যে, এই ব্যাপারে পদ্ধতিটি নির্ধারণ করা হবে সুন্নাহ্ দিয়ে, অর্থাৎ আল্লাহ্র দিক-নির্দেশনা দ্বারা পরিচালিত এক ব্যক্তির (অর্থাৎ, নবীর) উদাহরণ দিয়ে – ***অথবা,*** *ব্যাপারটাকে ধামাচাপা দিয়ে এমন ভাব করা যে, পদ্ধতিতে কিছু যায় আসে না। প্রথমটি হচ্ছে ধর্মের পথ, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে অধর্মের পথ।* ***প্রকৃতিবাদ, মানবতাবাদ এবং উদারতাবাদ সবকটি নিশ্চিতভাবে অধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী*** *– এজন্য নয় যে, তারা জীবনের কোন নৈতিক মূল্যবোধকে অস্বীকার করে, বরং এইজন্য যে, তারা সদগুণের বাস্তব প্রয়োগের যে পদ্ধতিগুলো ধর্ম নির্ধারণ করে দেয়, সেগুলোকে অবজ্ঞা করে।...*[১০৪]

নবী (সা.) সম্বন্ধে আল্লাহ্ আরো বলেন:

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَٰبُ وَلَا ٱلْإِيمَٰنُ وَلَٰكِن جَعَلْنَٰهُ نُورًا نَّهْدِى بِهِۦ مَن نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِىٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾

"এভাবে আমরা তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি রূহ তথা আমাদের নির্দেশ; তুমি তো জানতে না কিতাব কি ও ঈমান কি। কিন্তু আমরা একে এক আলো রূপে নির্ধারণ করেছি যা দ্বারা আমরা আমাদের বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে পথনির্দেশ করি। তুমি তো শুধু সরল পথ প্রদর্শন কর।"(সূরা শূরা, ৪২:৫২)

---

[১০৪] দেখুন: Page#3-6, *An essay on the Sunnah:It's Importance, Transmission, Development and Revision* - S.M.Yusuf.

www.pathagar.com

কুর'আনে আল্লাহ্ **দুই ধরনের** সাধারণ দিকনির্দেশনার কথা বলেন। এক ধরনের দিকনির্দেশনা হচ্ছে, যা কেবল আল্লাহ্ দিয়ে থাকেন, যা আসলে সত্যের প্রতি অন্তরের এক ধরনের উন্মুক্তকরণ, যেমনটা এই আয়াতে বলা হয়েছে, **"আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাকে হিদায়েত দেন"**; আর দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে, কাউকে শুদ্ধ পথটা কি সেটা দেখিয়ে দেয়া, যেমনটা নিম্নলিখিত আয়াতে আল্লাহ্ বলেনঃ

ذَٰلِكَ ٱلْكِتَٰبُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾

"এই সেই কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য এটা পথনির্দেশক....." (সূরা বাক্বারা, ২:২)

উপরে উদ্ধৃত সূরা শূরার আয়াত থেকে কেউ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে যে, নবী (সা.) তাঁর আচরণ, কথা ও উদাহরণ দিয়ে বিশ্বাসীদের জন্য নিজেকে সিরাতুল মুস্তাক্বীমের এক পথপ্রদর্শক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যে পথের নির্দেশনার কথা সূরা বাক্বারার দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে। সকল মুসলিম দু'আ করেন, **"আমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করুন।"** আল্লাহ্ স্পষ্টতই এই প্রার্থনার জবাব দিয়েছেন কুর'আন দ্বারা [যেমনটা আমরা সূরা বাক্বারার দুই নম্বর আয়াতে দেখতে পাই] এবং রাসূলের (সা.) সুন্নাহ্‌র প্রতি ইঙ্গিত করেও আল্লাহ এই প্রার্থনার জবাব দিয়েছেন [যেমনটা আমরা সূরা শূরার ৫২ নম্বর আয়াতে দেখতে পাই]। বলা আবশ্যক যে, কুর'আনে আল্লাহ্ ঘোষণা করেন যে, রাসূল (সা.) নিজে এই সিরাতুল মুস্তাক্বীম বা সরল পথের উপর প্রতিষ্ঠিত:

إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٣﴾ عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٤﴾

"নিশ্চয়ই আপনি সরল পথের উপর অবস্থিত রাসূলদের অন্তর্গত" (সূরা ইয়াসীন, ৩৬:৩-৪)।

www.pathagar.com

এছাড়া আল্লাহ্ আরো বলেন যে, তিনি সত্য পথের উপরও রয়েছেন:

فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ﴿٧٩﴾

"সুতরাং আল্লাহর উপর আপনার আস্থা ও নির্ভরতা স্থাপন করুন। নিশ্চয়ই আপনি স্পষ্ট সত্য পথের উপর রয়েছেন।" (সূরা নামল, ২৭:৭৯)

কখনো আমরা দেখতে পাই যে, যারা নবীর (সা.) উদাহরণ অবহেলা করেন, তাদের মধ্যে এমন অনেক লোকও থাকেন যারা দাবী করেন যে, তাদের আল্লাহ্র উপর প্রবল আস্থা রয়েছে এবং তাদের এক ধরনের আধ্যাত্মিক সচেতনতাও রয়েছে। **কিন্তু আল-শাওকানী এ ব্যাপারে মনোযোগ আকর্ষণ করেন যে, সূরা আহ্যাবের যে আয়াতে নবীকে (সা.) নিখুঁত উদাহরণস্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে সেখানে এটাও বলা হয়েছে যে, "যার আল্লাহর উপর ভরসা রয়েছে" তার জন্যই নবী (সা.) এক নিখুঁত উদাহরণ। এ হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ্কে বিশ্বাস করে এবং তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে এবং তাঁর কাছ থেকে প্রতিফল আশা করে। সুতরাং এই আয়াতের নিহিতার্থ হচ্ছে এই যে, কেউ যদি সত্যি সত্যি আল্লাহ্য় ও শেষ দিনকে বিশ্বাস করে, আল্লাহর উপর ভরসা করে এবং প্রায়শই আল্লাহ্কে স্মরণ করে, তার উচিত স্বয়ং আল্লাহ্ যাঁকে চমৎকার উদাহরণ বলে সম্বোধন করেছেন তার আদর্শে নিজের জীবনকে গড়ে তোলা।** [১০৫]

সুতরাং একজন মুসলিমের কাছে কিতাব ও সুন্নাহ্ রয়েছে। এগুলো হচ্ছে সেই দুটো পথনির্দেশনা, মানবকুলকে সরল পথে এবং পরিস্কার সত্যের পথে দিকনির্দেশনা দেবার জন্য আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন। যে কারো এই সত্যটা অনুধাবন করা উচিত এবং সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ নবী মুহাম্মাদ (সা.) এঁর দৃষ্টান্ত অনুসারে নিজের জীবন গঠন করা উচিত।

---

[১০৫] দেখুন: Page#270, Vol.4, *Fath al-Qadeer* - Muhammad ibn Ali al-Shaukaani.

www.pathagar.com

(৪) আনুগত্যের দাবীদার হিসেবে নবীর (সা.) ভূমিকা

রাসূল (সা.)-এঁর শেষ ভূমিকা, যেটা আমরা এখানে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ নবীকে (সা.) এমন এক ব্যক্তি হিসেবে প্রেরণ করেছেন, **আমাদেরকে যাঁর আনুগত্য করতেই হবে**। আল্লাহ্ কুর'আনে বলেন:

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ... ﴿٦٤﴾

"আমরা কখনোই এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি, আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে যার আনুগত্য করতে হবে না।" (সূরা নিসা, ৪:৬৪)

ইসলামের বাণীকে আল্লাহ্ এক স্পষ্ট ও সুন্দর উপায়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে, সমগ্র মানবকুল আল্লাহ্র ডাকে এবং তাঁর দিক নির্দেশনার প্রতি সাড়া দেয়। সত্য এবং মিথ্যার মাঝে থেকে বেছে নেবার স্বাধীনতা আল্লাহ্ মানুষকে দিয়েছেন। আল্লাহ্ কুর'আনে বলেছেন:

تَبَـٰرَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ ﴿٢﴾

"তিনিই মহিমান্বিত, সর্বময় কর্তৃত্ব যাঁর; তিনি সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। তিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন - তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য, কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম। তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।" (সূরা মূলক, ৬৭:১-২)

www.pathagar.com

আল্লাহ্ যেভাবে মানবকুলকে সৃষ্টি করে পরীক্ষা করেছেন যে, তারা তাঁর কিতাব অনুসরণ করছে কিনা, একইভাবে তিনি পরীক্ষা করে দেখছেন যে, তারা তাঁর নবীর সুন্নাহ অনুসরণ করে কিনা এবং তা মেনে চলে কিনা। তাঁরা যে বিশ্বাসী, এটা কেবল তাদের জিহ্বা দ্বারা দাবী করাটা পর্যাপ্ত নয়, বরং কুর'আন এবং সুন্নাহ্র পরিপূর্ণ সত্যের কাছে নিজেদেরকে স্বেচ্ছায় পূর্ণ সমর্পণের মাধ্যমে তাদেরকে নিজেদের দাবীর সত্যতা প্রমাণ করতে হয়। আল্লাহ কুর'আনে বলেন:

أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓا۟ أَن يَقُولُوٓا۟ ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۝٢ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَٰذِبِينَ ۝٣

"মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' – একথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেয়া হবে? আমরা তো এদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম; কারা সত্যবাদী এবং কারা মিথ্যাবাদী - আল্লাহ্ তা অবশ্যই জানবেন (অথবা আল্লাহ্ তা অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন)।" (সূরা আনকাবুত, ২৯:২-৩)

অতি সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত এমন মুসলিমের সংখ্যা খুবই কম ছিল, যারা কিনা কুর'আন অনুসরণের প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন অথচ সুন্নাহ অনুসরণের দ্বিতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। কিন্তু হালে এমন অনেক মানুষই পাওয়া যাবে, যারা দাবী করেন যে, তারা কুর'আন অনুসরণ করছেন এবং সুন্নাহ অনুসরণ করার প্রয়োজন তাদের নেই। অথচ যে কোন ব্যক্তির জন্য ঈমানের পূর্বশর্ত হচ্ছে এই যে, সে কুর'আন ও সুন্নাহ দুটোই অনুসরণ করবে। কুর'আনের বহু আয়াত দ্বারা এই বাস্তবতা প্রমাণ করা যায়, যার কিছু কিছু আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি। কুর'আনে যে কেউ এমন কথা দেখতে পাবে:

www.pathagar.com

قُلۡ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡكَٰفِرِينَ ۝٣٢

"বলুন, আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর আর তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও তবে জেনে রেখো যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ **অবিশ্বাসীদের** **ভালবাসেন না।"** (৩:৩২)

এই আয়াতে যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের (সা.) দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদেরকে প্রকারান্তরে **অবিশ্বাসী ও কাফির** বলা হচ্ছে। **ইবন কাসীর** দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, এই আয়াত প্রমাণ করে এমন **যে কেউ যে কিনা রাসূলের(সা.) সাথে ভিন্নমত পোষণ করে এবং তাঁর সুন্নাহ অনুসরণ করতে অস্বীকার করে সে কাফির হয়ে যায়।**[১০৬] আল্লাহ্‌র রাসূলকে (সা.) অনুসরণ করা ছাড়া আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী হবার এবং তাঁর অনুগ্রহ লাভ করার আসলে আর কোন উপায় নেই। যেমনটি নিম্নলিখিত আয়াতে বলা হয়েছে:

قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ۝٣١

"বলুন [হে রাসূল], তোমরা যদি সত্যিই আল্লাহ্‌কে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর এবং আল্লাহ্ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবেন।" (সূরা আলে-ইমরান, ৩:৩১)

আল্লাহ্ কুর'আনে আরো বলেন:

---

[১০৬] দেখুন: Page#236, *Tafseer al-Quran al-Adheemal-Maroof bi Tafseer ibn Katheer* - Ismaeel Ibn Katheer

www.pathagar.com

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ... ﴿٨٠﴾

"কেউ রাসূলের আনুগত্য করলে সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করলো।" (সূরা নিসা, ৪:৮০)

এর সাথে রাসূল (সা.) যোগ করেছেন, ***"যে কেউ রাসূলকে অমান্য করলো সে আল্লাহকে অমান্য করলো।"*** এই আয়াতের আর কোন ব্যাখ্যার বা "গুরুত্ব দেখানোর" প্রয়োজন নেই।

ইমাম শাফি'ঈ বলেনঃ

"ব্যাপারটা যেভাবেই দেখা হোক না কেন, আল্লাহ্ ব্যাপারটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তাঁর রাসূলকে মেনে নেয়ার ব্যাপারে তিনি বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছেন, এবং আল্লাহ্র রাসূলের কাছ থেকে এসেছে জেনে থাকলে, কোন আদেশ অমান্য করার ব্যাপারে মানবকুলের কাউকে কোন অজুহাতের অবকাশ দেয়া হয়নি। আল্লাহ্ বরং দ্বীনের সকল ব্যাপারে মানুষের জন্য তাঁকে অপরিহার্য করে রেখেছেন এবং সেটার প্রমাণ হিসেবে তাঁর কিতাবে লিপিবদ্ধ কর্তব্যসমূহের অর্থ পরিস্কার করে দেয়ার ক্ষেত্রে সুন্নাহর ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। যেন এটা জানা যায় যে – আল্লাহ্র কিতাবে লিপিবদ্ধ কোন আদেশের সুনির্দিষ্ট অর্থ বের করার ব্যাপারেই হোক, অথবা, আল্লাহ্র কিতাবে উল্লেখ নেই এমন কোন বিষয়ের আইন প্রণয়নের ব্যাপারেই হোক – এর যে কোন অবস্থাই আসলে আল্লাহ্র আদেশ উপস্থাপন করে এবং তা তাঁর রাসূলের (সা.) আদেশের সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। দুটোই সকল অবস্থায় সমান

www.pathagar.com

বাধ্যবাধকতাসম্পন্ন।"[১০৭]

উপসংহার: নবীর (সা.) ভূমিকাসমূহ, সুন্নাহ অনুসরণের অপরিহার্যতা নির্দেশ করে

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে নবীর (সা.) সুন্নাহর কর্তৃত্ব ও গুরুত্ব সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত করে - কুর'আনের এমন আয়াত ও হাদীস উপস্থাপন করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে সুন্নাহ্‌র অবস্থান ও মর্যাদা দেখাতে আরো অতিরিক্ত প্রমাণাদি উপস্থাপন করা হয়েছে। নবীর (সা.) ভূমিকাসমূহ আলোচনা করতে গিয়ে বাস্তবে এটাই দেখানো হয়েছে যে, ইসলামের জন্য সুন্নাহ একটা অপরিহার্য বিষয় এবং তা ইসলামী আইনের একটা উৎস। **সত্যি বলতে কি সুন্নাহ ছাড়া কোন প্রকৃত ইসলামই নেই।**

নবী (সা.) কুর'আন ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁর ব্যাখ্যা এবং প্রয়োগ ছাড়া ঠিক কিভাবে শুদ্ধভাবে কুর'আনকে প্রয়োগ করতে হবে কারো পক্ষে তা জানার কোন উপায় থাকবে না। অন্য কথায় বলতে গেলে আল্লাহ্ কুর'আন নাযিল করেছেন, কিন্তু সেটা এমনভাবে নাযিল করেছেন, যাতে কখনোই সেটাকে নবীর সুন্নাহ থেকে বিচ্ছিন্ন না করা যায়। আর সেরকমটা করার যে কোন রকম প্রচেষ্টার পরিণতি ভয়াবহ ও করুণ।

কুর'আন এবং হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণ করা হয়েছে যে, নবী (সা.) ছিলেন 'আইনের এক স্বনির্ভর উৎস'। মুসলিমরা কুর'আনকে মেনে চলতে যেরকম বাধ্য, ঠিক একইভাবে রাসূলকে (সা.) মেনে চলতেও তারা বাধ্য – কেননা [দ্বীন সংক্রান্ত] তাঁর কথা এবং কুর'আন উভয়ের উৎসমূল হচ্ছেন আল্লাহ্ এবং যে কেউ [এসব মেনে] আসলে আল্লাহ্‌রই ইবাদত করছে। সুতরাং কেউ যদি সঠিকভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে চায়, তবে তাকে অবশ্যই নবীর (সা.) কাছ থেকে

---

[১০৭] দেখুন: Page#121 -122, *Islamic Jurisprudence: Shafi'i's Risala* - Majid Khadduri.

www.pathagar.com

আসা ব্যাপারগুলো অনুসরণ করতে হবে এবং মেনে চলতে হবে, কুর'আনে সেই ব্যাপারগুলোর উৎস থাকুক আর না থাকুক।

নবী (সা.) ছিলেন নিখুঁত উদাহরণ। তিনি সিরাতুল মুস্তাক্বীম বা সরল পথ অনুসরণ করছিলেন, আর তাই কেউ যখন সেই পথ সম্বন্ধে জানতে চায় এবং সেটা অনুসরণ করতে চায়, তখন সেটার বাস্তব উদাহরণের খোঁজ করাটা তার জন্য অবশ্যকরণীয় হয়ে পড়ে। তাঁর জীবনের ধরনের চেয়ে শ্রেয় আর কোন জীবনযাত্রা হতে পারে না। একজন মুসলিম যদি সঠিক উপায়ে নবীর (সা.) অনুসরণ করে, তবে সে নিশ্চিত হতে পারে যে, সে এমন এক আচরণ করছে যা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বয়ে আনে।

সবশেষে, নবীর (সা.) আনুগত্য করা না করাটা মানবকুলের জন্য এক ধরনের পরীক্ষার ব্যাপার। কেউ কুর'আন পড়তে পারে এবং তা তার কাছে সুন্দর লাগতে পারে, কিন্তু তারপরে প্রশ্ন থেকে যায়, সে কি আসলে সেটাকে সঠিক পন্থায় বাস্তব রূপ দিতে চায়? যেভাবে নবী (সা.) দেখিয়ে দিতে চান? একইভাবে কেউ নবীর (সা.) জীবনী পড়তে পারে এবং তাঁর চরিত্র ও সংগ্রামের বর্ণনা পড়ে চমৎকৃত হতে পারে। কিন্তু এখানেও প্রশ্ন থেকে যায়, নবী (সা.) যা আদেশ করে গেছেন, সে সবের কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে কি সে ইচ্ছুক? কেউ যদি নিজেকে সমর্পণ করতে না চায়, তবে তার বাকী বোধ বা অনুভূতিগুলো অর্থহীন। কারো যদি নিজেকে সমর্পণ করার ইচ্ছা না থাকে, তবে সে আসলে আল্লাহ্‌র কাছে ঐ পরীক্ষায় বিফল হবার প্রমাণ রেখে যাচ্ছে, আল্লাহ্ তাঁর অসীম প্রজ্ঞা ও জ্ঞানবলে মানবকুলকে যাচাই করতে চেয়ে তাদেরকে যে পরীক্ষার মাঝে রেখেছিলেন।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

সুন্নাহর মর্যাদা বনাম কুর'আন

আইনের উৎস হিসেবে সুন্নাহর মর্যাদা যখন সন্দেহাতীতভাবে কুর'আনের বহু আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা হলো, এরপর প্রশ্ন থাকছে, সুন্নাহর অবস্থান বা পদমর্যাদা কতটুকু? আরো সুনির্দিষ্টভাবে কুর'আনের তুলনায় এর অবস্থান কোথায়? তার মর্যাদা কি কুর'আনের পরেই, নাকি কর্তৃত্ব ও মর্যাদার দিক দিয়ে তা কুর'আনের সমতুল্য? সবশেষে এই প্রশ্নের সুরাহা করার গুরুত্বই বা কতটুকু? এই প্রশ্নের ব্যাপারে স্কলারদের মাঝে তিনটি মত রয়েছে। আমরা প্রতিটি মতকে আলাদা আলাদাভাবে আলোচনা করবো এবং তার পরবর্তীতে প্রতিটি সম্বন্ধে একটি উপসংহার উপস্থাপন করবো ইনশা' আল্লাহ্।

প্রথম মত ঃ কুর'আন সুন্নাহর উপরে প্রাধান্য বা অগ্রাধিকার পাবে

বহুল প্রচলিত মত হচ্ছে কুর'আন সুন্নাহর উপর অগ্রাধিকার পাবে, অথবা, অপর কথায় বলতে গেলে কুর'আনের মুকাবিলায় সুন্নাহ্ দ্বিতীয় স্থানের মর্যাদা পাবে। এই মতের সমর্থকদের একজন হচ্ছেন প্রখ্যাত আইনতাত্ত্বিক বা উসূলী আল-শাতিবী[১০৮]। আল-সালাফিও এই মতকে সমর্থন করে পরিস্কারভাবে বলেন:

"মর্যাদার দিক দিয়ে এবং শরীয়ার অনুশাসনের উৎস হিসাবে ব্যবহার করতে চাইলে যে কুর'আনের তুলনায় সুন্নাহ্ দ্বিতীয় অবস্থানে থাকবে

---

[১০৮] দেখুন: Page#294-313, Vol. 4, *Al-Muwaafaqaat* - Ibraheem al-Shaatibi.

www.pathagar.com

এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। একজন মুজতাহিদ ততক্ষণ পর্যন্ত সুন্নাহ্‌র শরণাপন্ন হন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে কুর'আনে কোন অনুশাসন খুঁজে পেতে ব্যর্থ হন..... ।'[১০৯]

এই মতের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হচ্ছে:

১)কুর'আন হচ্ছে এক অলৌকিক নিদর্শন, যার ব্যাপারে গোটা মানবজাতিকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে যে, সম্ভব হলে তারা এর সমতুল্য কিছু উপস্থাপন করার চেষ্টা করে দেখুক। কিন্তু সুন্নাহর ব্যাপারে এমনটা ঘটেনি। কেবল এই ব্যাপারটাই কুর'আনের উৎকৃষ্টতার প্রমাণ রাখে যার নিহিতার্থ হচ্ছে এই যে, কুর'আনের অবস্থান সুন্নাহ্‌র উপরে ও সুন্নাহকে ছাড়িয়ে।

২)কুর'আনের সবটুকুই হচ্ছে **মুতাওয়াতির** অথবা **ক্বাতঈ আস-সাবুত** (সুনির্দিষ্টভাবে নিশ্চিত অথবা সত্যায়িত)। এক্ষেত্রে মুতাওয়াতির অর্থ দাঁড়ায় এই যে, কুর'আনের বিষয়াবলী এমনভাবে এবং এত বেশী সংখ্যক লোকের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের সবার একই ভুল করার অথবা কোন রকম জালিয়াতির ব্যাপারে একমত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। **ক্বাতঈ আস-সাবুত** এর অর্থ হচ্ছে এই যে, তা সঠিক বলে সুনির্দিষ্টভাবে নিশ্চিত হয়েছে। এ ব্যাপারটাও এটা (কুর'আন) যে মুতাওয়াতির সেই সত্য থেকেই আসে। অপরপক্ষে, হাদীসের একটা ক্ষুদ্র অংশকে মুতাওয়াতির বলে গণ্য করা হয়। সুতরাং এই বাস্তবতার উপর ভিত্তি করে কুর'আনকে একটা অগ্রাধিকার দিতেই হবে।

---

[১০৯] দেখুন: Page#93, *Al-Sunnah: Hujiyyatuhaa wa Makaanatuhaa fi-l-Islaam wa al-Raad ala Munkireehaa* - Muhammad Luqmaan al-Salaafi

www.pathagar.com

৩)কেবল কুর'আনের তিলাওয়াত করাটা নিজেই ইবাদতের একটা ব্যাপার বলে মর্যাদা পেয়ে থাকে যার ফলস্বরূপ বিশেষ প্রতিফল আশা করা হয়। এই ধারণাটা নবীর (সা.) নিম্নলিখিত বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত:

"যে আল্লাহ্‌র কিতাবের একটি হরফ পাঠ করে তার পক্ষে একটি সৎকর্ম লিপিবদ্ধ হয় এবং প্রত্যেকটি সৎকর্মের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিফল পাওয়া যাবে। আমি বলছি না আলিফ-লাম-মীম একটি হরফ, বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ।"[১১০]

৪)নিম্নলিখিত হাদীসে আমরা দেখতে পাই যে, সুন্নাহ্‌ নিজেই এটা প্রমাণ করে যে, কুর'আন সুন্নাহ্‌র উপর অগ্রাধিকারের দাবী রাখে:

মুয়ায বিন জাবাল (রা.) এঁর সঙ্গীদের ভিতর হিমস-এর ব্যক্তিদের বর্ণনায় পাওয়া যায়: যখন রাসূল (সা.) মুয়াযকে (রা.) ইয়েমেন পাঠাতে চাইলেন, তখন বললেন, ***"তোমার কাছে যখন বিচারের জন্য কোন একটা বিষয় উপস্থাপন করা হবে, তখন তুমি কিভাবে বিচার করবে?"*** *তিনি উত্তর দিয়েছিলেন,* ***"আমি আল্লাহর কিতাব দ্বারা বিচার করবো।"*** *তিনি [নবী (সা.)] তখন বললেন,* ***"আর তুমি যদি তা আল্লাহর কিতাবে না পাও তখন?"*** *তিনি (মুয়ায) উত্তর দিলেন,* ***"তখন আমি আল্লাহর রাসূলের (সা.) সুন্নাহ দ্বারা বিচার করবো।"*** *তখন তিনি বললেন,* ***"আর তুমি যদি তা আল্লাহর রাসূলের অথবা আল্লাহর কিতাব কোনটিতেই তা না পাও?"*** *তিনি (মুয়ায) উত্তর দিলেন,* ***"আমি তখন নিজের মতের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো এবং আমি চেষ্টার ত্রুটি করবো না।"*** *আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) তখন তাঁর বুকে ধাক্কা দিলেন এবং বললেন,* ***"সকল প্রশংসা আল্লাহর***

---

[১১০] তিরমিযী ও অন্যান্য বর্ণনায় এসেছে - আলবানীর মতে সহীহ্‌।

www.pathagar.com

যে আল্লাহর রাসূলকে (সা.) যা সন্তুষ্ট করে, আল্লাহর রাসূলের বাণীবাহকও সেই মতের উপরই রয়েছে।" (আবু দাউদ, আহমাদ, তিরমিযী)

৫)উপরোক্ত হাদীস ছাড়াও আবুবকর, উমর ও অন্যান্যদের (রা.) পদ্ধতিতে দেখতে পাওয়া যায় যে, তাঁরা প্রথমেই কুর'আনের শরণাপন্ন হতেন, এবং তারপরে কুর'আনে সংশ্লিষ্ট কিছু না পেলে তখন তাঁরা নবীর (সা.) সুন্নাহর শরণাপন্ন হতেন। বিচারক শুরাইহের কাছে লিখিত তাঁর বিখ্যাত চিঠিতে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) লিখেছিলেন, *"যদি তোমার কাছে এমন কোন ব্যাপার আসে, যে সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র কিতাবে রয়েছে, তবে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী বিচার কর। তোমার কাছে যদি এমন একটা ব্যাপার আসে যা আল্লাহর কিতাবে নেই, তবে রাসূলের (সা.) প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি অনুযায়ী তার বিচার কর..... ।"* ইবন মাসউদ (রা.) এবং ইবন আব্বাসের (রা.) সূত্র থেকেও একই ধরনের বক্তব্য লিপিবদ্ধ রয়েছে।[১১১]

৬)কুর'আন হচ্ছে সেই বিষয়, যা সুন্নাহ্‌র মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করে। সুতরাং, সুন্নাহ হচ্ছে ফার'অ (শাখা) এবং আসল বা মূল (অর্থাৎ কুর'আন) শাখার উপর প্রাধান্য পেয়ে থাকে।

৭)নবীর (সা.) কাছ থেকে যা এসেছে, তা তাঁর নিজের ইজতিহাদের ফলাফলও হতে পারে। আর তাই তাতে ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে [১১২]। সুতরাং, কেউ সেটাকে কুর'আনের সমপর্যায়ের বলে মনে করতে পারে না।

---

[১১১] দেখুন: Page#94, *Al-Sunnah: Hujiyyatuhaa wa Makaanatuhaa fi-l-Islaàm wa al-Raad ala Munkireehaa* - Muhammad Luqmaan al-Salaafi

[১১২] রাসূল (সা.) আদৌ কখনো ইজতিহাদ করেছেন কি না, তা নিয়ে উসূলীদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

www.pathagar.com

৮)সুন্নাহ হচ্ছে হয় কুর'আনের একটা ব্যাখ্যা অথবা কুর'আনের অনুশাসনের অতিরিক্ত কোন বিষয়। যদি সেটা ব্যাখ্যা হয়ে থাকে, তবে তো তা যেটার ব্যাখ্যা করছে, তার পরেই তার অবস্থান হওয়ার কথা। কখনো যদি যে বিষয়টা ব্যাখ্যা করা হচ্ছে, সেটাকে বাদ দেওয়া হয়, তবে ব্যাখ্যাটা বাদ পড়ে যায়। কিন্তু যদি ব্যাখ্যাটিকে বাতিল করা হয়, তবে তার ফলে যে বিষয়টা ব্যাখ্যা করা হচ্ছে সেটা আপনাআপনি বাতিল হয়ে যায় না। আর কুর'আনে যা পাওয়া যায়, সুন্নাহ যদি তার অতিরিক্ত একটা বিষয় হয়, তবে কুর'আনে যখন ঐ সংশ্লিষ্ট বিষয় খুঁজে দেখা হয় এবং দেখা যায় যে, কুর'আনে সে সম্বন্ধে কিছু নেই, তখনই কেবল সুন্নাহর শরণাপন্ন হওয়ার কথা আসে। আবারও, এ থেকেই দেখা যাচ্ছে যে কুর'আন সুন্নাহর আগে আসে।

উপরোক্ত প্রথম মতের প্রমাণের উপরে মন্তব্য

উপরের প্রমাণগুলোর সমালোচনায় নিম্নলিখিত পয়েন্টগুলো উল্লেখ করা যায়:

১)কুর'আন যে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ অলৌকিক ব্যাপার সেই যুক্তিটা আমাদের বর্তমান আলোচনায় অপ্রাসঙ্গিক। অলৌকিক হওয়ার কারণে ইসলামী আইনের ব্যাপারে এর কোন বাড়তি মর্যাদা নেই। এটা এজন্য যে, নবী (সা.)-কে যদি এমন একটা কিতাব দেয়া হতো যার আশ্চর্যজনক অলৌকিক গুণাবলী নাও থাকতো, তবুও সেটার আইনী মর্যাদা কুর'আনের মতোই হতো। উপরন্তু কুর'আনের অলৌকিক বৈশিষ্ট্যসমূহের অনেক দিক রয়েছে, যার একটি হচ্ছে এই যে, শেষ দিবস পর্যন্ত সমগ্র মানবকুলের জন্য তা আইন ও শিক্ষণীয় বিষয়গুলো বর্ণনা করে। কিন্তু এই নির্দিষ্ট দিকটি আসলে সুন্নাহকেও ধারণ করে এবং সেহেতু সুন্নাহরও একটি অলৌকিক দিক রয়েছে।

www.pathagar.com

২)কেউ যদি তর্কের খাতিরে প্রমাণের এই দিকটি মেনেও নেয় (যে কুর'আন হচ্ছে মুতাওয়াতির এবং তাই সুনির্দিষ্টভাবে নিশ্চিত অথচ সুন্নাহ তা নয়) তারপরও এই কথাটা এটা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট নয় যে, কুর'আন সুন্নাহর উপর অগ্রাধিকার লাভ করে। এটা এইজন্য যে এর ঐতিহাসিক নিশ্চিতকরণ অথবা সত্যায়ন প্রমাণ হিসাবে ব্যবহৃত হবার জন্য কেবল একটি দিক। আরেকটি দিক হচ্ছে এই যে, কোন একটি বক্তব্য তার অর্থ অথবা ইঙ্গিতের ব্যাপারে কতটুকু সুনির্দিষ্ট। আইন প্রণয়নের ব্যাপারে কোন একটা বক্তব্য যদি সুনির্দিষ্ট ও সিদ্ধান্তমূলক হয় তবে সেটাকে "ক্বাতঈ আদ দালালা" বলা হয়।[১১৩]

নীচে আমরা একটা উদাহরণ দিচ্ছি, যেটা এই পয়েন্টটিকে আরো পরিস্কার করে দেবে:

ঐ সমস্ত মহিলা যাদেরকে একজন পুরুষের জন্য বিয়ে করা বৈধ নয়, তাদের কথা বলার পরে আল্লাহ্ বলেন:

وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ ۚ... ﴿٢٤﴾

"এরা ছাড়া আর সবাই বৈধ, যদি তোমরা তাদের তোমাদের সম্পদ থেকে একটা কিছু উপহার দিয়ে বিয়ে করতে চাও – ব্যভিচারের জন্য নয়।" (সূরা নিসা, ৪:২৪)

ঠিক তার আগের আয়াতে অর্থাৎ ৪:২৩ নম্বর আয়াতে দুই বোনের সাথে একত্রে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু

---

[১১৩] "ক্বাতঈ আদ-দালালা"-র বিপরীত হচ্ছে "যান্নি আদ-দালালা" - যেখানে একটা বক্তব্যে কোন একটা কিছুর ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে তা বলা হয় নি।

www.pathagar.com

একজন স্ত্রীলোক এবং তার খালার সাথে একত্রে বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ থাকার ব্যাপারটা সুনির্দিষ্ট ভাবে আলোচনা করা হয়নি। বরং 'এরা ছাড়া অন্য সকলে বৈধ' বলে সাধারণভাবে এ ব্যাপারটাকে বক্তব্যের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। সুতরাং আয়াতটি তাদের ব্যাপারে যান্নী অথবা অপেক্ষাকৃত কম সিদ্ধান্তমূলকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 'এরা ছাড়া আর সকলেই বৈধ' এই কথাগুলো সাধারণ এবং এগুলোকে নির্দিষ্টকরণের পথ খোলা রয়েছে। যেমন নবী (সা.) বলেছেন, *"একজন মহিলা এবং তার ফুফুকে একত্রে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা যাবে না, না তো একজন মহিলা ও তার খালাকে একত্রে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করা যাবে।"* (বুখারী, মুসলিম)

কুর'আনের আয়াতের তুলনায় এই হাদীসের সত্যতা অতটুকু নিশ্চিত নয় এরকম একটা যুক্তি দেখানো যেতে পারে। **কিন্তু একজন মহিলা এবং তাঁর ফুফুকে একত্রে বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ করার ব্যাপারে এই হাদীসের ইঙ্গিত সুনির্দিষ্ট ও সিদ্ধান্তমূলকঃ আর সেজন্যেই, উপরে উল্লিখিত আয়াতের উপর এই হাদীসটিই অগ্রাধিকার পাবে।** কেননা এই নির্দিষ্ট বিষয়ে উল্লিখিত আয়াতটি সিদ্ধান্তমূলক নয়। অতএব, ইসলামী আইনের ব্যাপারে মুতাওয়াতির বলে এবং ক্বাতঈ আস-সাবুত বলে কুর'আন সবসময় সুন্নাহর উপর অগ্রাধিকার পাবে – এই যুক্তি অসার, কেননা কুর'আনের "ক্বাতঈ আস-সাবুত" হওয়ার বাড়তি সুবিধা থাকলেও, একটা নির্দিষ্ট বিষয়ে "ক্বাতঈ আদ-দালালা" হবার সুবাদে একটা হাদীস তার উপর প্রাধান্য পেতে পারে।

এছাড়াও কেউ যদি কুর'আন ও সুন্নাহর বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে কথা বলেন, তাহলে এই যুক্তির ধারা অসার হয়ে যায়। একজন সাহাবী যদি কুর'আনের একটা আয়াত অথবা একটা হাদীস সরাসরি নিজে নবীর (সা.) কাছ থেকে শোনেন, তাহলে উভয়ই তাঁর চোখে নিশ্চিত বিষয়। এর নিহিতার্থ হচ্ছে এই যে, ঐ সাহাবীর কাছে দুটোই নিশ্চিত সত্য।

www.pathagar.com

আল-শাতিবী এবং অন্য যারা এই যুক্তি প্রদর্শন করেছেন, তারা নিশ্চয়ই এমন বোঝাতে চাননি যে, সাহাবীদের কাছে কুর'আন ও সুন্নাহর একই মর্যাদা ছিল, কিন্তু পরবর্তী প্রজন্মের বেলায় প্রথমে কুর'আন আসবে এবং তারপরে সুন্নাহর কথা আসবে। আল-শাতিবী কখনো এভাবে যুক্তি প্রদর্শন করেননি এবং সেজন্য কুর'আনের গোটাটাই মুতাওয়াতির বলেই কুর'আন অধিকতর মর্যাদা সম্পন্ন, এই দাবী ধোপে টেকে না।

৩)কুর'আন ও সুন্নাহর ভিতর কোনটা অগ্রাধিকার পাবে এই সুনির্দিষ্ট প্রশ্নের বেলায় কুর'আন আবৃত্তি করা যে একটা ইবাদত, এই বাস্তবতার কোন ভূমিকা নেই। আমরা আবারও বলতে চাই যে, কুর'আন পড়াটা যদি ইবাদতের কাজ নাও হতো, তবু ইসলামী আইনের উৎস হিসাবে কুর'আনের অবস্থানকে যে কারো মেনে নিতে হতো। এ ছাড়াও জ্ঞান অন্বেষণও একটা ইবাদতের কাজ হতে পারে, যার আওতায় হাদীসের পড়াশুনাও আসবে। সেজন্যেই হাদীস শাস্ত্রের পড়াশুনাটাও একটা ইবাদতের কাজ বলে গণ্য হতে পারে। এদিক থেকে কুর'আন এবং সুন্নাহর মাঝে একটা সাদৃশ্য রয়েছে।

৪)মুয়ায(রা.)-এঁর হাদীসটি একটা বিখ্যাত হাদীস। আবু দাউদ আত-তায়ালিসী, আহমাদ, আবু দাউদ আল-সিজিস্তানী, আত-তিরমিজী এবং অন্যান্যরা এই হাদীস লিপিবদ্ধ করে গেছেন। ফিকহ্ ও ইসলামী আইনতত্ত্বের বেশ কিছু সনাতন কাজে এই হাদীসটির উদ্ধৃতি দেখতে পাওয়া যায়। এমন কিছু বিখ্যাত স্কলার রয়েছেন যারা এই হাদীসটিকে হাসান অথবা সহীহ বলে গণ্য করেন। **ইবন কাসীর** বা **ইবনুল কাইয়্যিম** হচ্ছেন তাঁদের অন্যতম। হাদীস শাস্ত্রের পরবর্তী সময়ের স্কলার **নাসিরুদ্দীন আলবানী** এবং **মাশহুর হাসান সালমান**–এঁরা হাদীসটির ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। দুজনেই এই হাদীসকে জয়ীফ বা দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন। এই

www.pathagar.com

হাদীসের তিনটি ত্রুটি রয়েছে। **প্রথমত**, সবচেয়ে শক্তিশালী যে সনদগুলো পাওয়া যায়, সেখানে দেখা যায় যে, মুয়ায বিন জাবালের (রা.) সঙ্গী-সাথীরা হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁরা একথা উল্লেখ করেন নি যে, তারা সরাসরি মুয়াযের (রা.) মুখ থেকে বর্ণনাটি শুনেছেন কিনা। সুতরাং তাঁদের এবং নবীর (সা.) মধ্যে সূত্রটা এখানে ছিন্ন হয়ে গেছে। **দ্বিতীয়ত**, কোন বর্ণনায় এই কথাটা উল্লেখ করা হয়নি যে মুয়াযের (রা.) এই সাথীরা কারা ছিলেন। এঁরা হচ্ছেন অজানা বর্ণনাকারী এবং অজানা বর্ণনাকারীরা গ্রহণযোগ্য নয়। **তৃতীয়ত**, হাদীসের সনদে একজন বর্ণনাকারী হচ্ছেন আল-হারিস ইবনে আমর, যিনি অপরিচিত। বহু পৃষ্ঠা জুড়ে হাদীসটি নিয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের পরে আলবানী এবং সালমান দুজনেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, হাদীসের ভিন্ন ভিন্ন সনদের কোনটিই সকল দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। আর তাই এটাকে দুর্বল হাদীস বলে গণ্য করা হয়। এছাড়া আলবানী এটাও উল্লেখ করেন যে বুখারী, তিরমিজী, উকাইলী, দারা-কুতনী, ইবন হাজম, ইবন তাহির, ইবন আল জাওযী, আয-যাহাবী, আল-সুব্কী এবং ইবন হাজর এঁরা সবাই হাদীসটিকে দুর্বল বলে জেনেছেন। আলবানী এবং সালমানের যুক্তিতর্ক শক্তিশালী এবং এই হাদীসকে দুর্বল বলেই বিচার করতে হবে। **সুতরাং নবীর (সা.) সুন্নাহর উপর কুর'আন ইসলামী আইনের ভিত্তি হিসাবে অথবা আক্বীদাহ্র বিষয়ে প্রাধান্য পাবে, সেটার প্রমাণস্বরূপ এই হাদীসকে ব্যবহার করা যাবে না।**

৫)আবু বকর, উমর এবং অন্যান্যদের (রা.) কর্মপদ্ধতি এবং বক্তব্য এই ধারণা দেয় যে, তাঁরা প্রথমেই কুর'আনের শরণাপন্ন হতেন এবং সেখানে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন কিছু না পেলে তখনই তাঁরা নবীর (সা.) সুন্নাহর শরণাপন্ন হতেন। এই যুক্তিটা আগের যুক্তির চেয়ে শক্তিশালী। তবু এটা স্বীকার করতে হবে যে, এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব বহু ঘটনায় নবীর (সা.) সুন্নাহ থেকে তাঁদের অজানা একটা বিষয় জেনে

www.pathagar.com

সাথে সাথে তা মেনে নিয়েছেন বা পালন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ তাঁদের কারো ব্যাপারেই এমনটা জানা যায় না যে, কেবল কুর'আন নিষিদ্ধ করেনি বলেই একজন নারী ও তার ফুফুর সাথে একত্রে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকাটাকে তাঁরা বৈধ মনে করেছেন। আমরা উপরে যেমনটা দেখেছি – সূরা নিসার ২৪ নম্বর আয়াতে আসলে কুর'আন কিছু নারীদের কথা উল্লেখ করে বলে যে, এদের ছাড়া বাকী সবাই তোমাদের জন্য বৈধ। তবু সাহাবীদের কেউই ঐ আয়াতের আপাত অর্থ যা, তা থেকে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছাননি। **তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে এই যে, যখন সুন্নাহ কুর'আনের কোন প্রয়োগকে বাতিল করেছে অথবা সীমাবদ্ধ করেছে, তখন তাঁরা বাস্তবে সুন্নাহকেই প্রয়োগ করেছেন। তারা যদি দুটো বিষয়কে (কুর'আন ও সুন্নাহ) একত্রে একটি একক হিসাবে ধরে নিয়ে প্রয়োগ না করতেন, তাহলে তারা কুর'আনের এই আয়াতে থেমে যেতেন এবং সুন্নাহ কর্তৃক কুর'আনকে ছাড়িয়ে বাড়তি কোন সিদ্ধান্তকে তাঁরা অগ্রাহ্য করতেন** – যা এই মতাবলম্বীদের কথা থেকে মনে হতে পারে [অর্থাৎ কুর'আন কোন ব্যাপারে কথা বলে থাকলে সেটা অগ্রাধিকার পাবে, এর পরে সুন্নাহ সে সম্বন্ধে কি বললো সেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়]। উদাহরণস্বরূপ কুর'আনে আল্লাহ বলেন:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

"তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে, সে যদি ধন-সম্পত্তি রেখে যায়, তবে প্রথমে তাঁর পিতা মাতা ও আত্মীয়গণের জন্য অসিয়ত করার জন্য তোমাদেরকে বিধান দেওয়া হলো। এটা মুত্তাক্বীদের জন্য একটা কর্তব্য।" (সূরা বাক্বারা, ২:১৮০)

www.pathagar.com

নবীর (সা.) নিম্নলিখিত বক্তব্য দ্বারা এই আয়াত মানসুখ হয়ে গেছে বলে ধরে নেওয়া হয় যেখানে তিনি বলেন, *"স্বাভাবিক উত্তরাধিকারীদের জন্য কোন অসিয়ত নেই ।"* (তিরমিজীতে লিপিবদ্ধ হাদীস, আলবানীর মতে সহীহ্)। নবীর (সা.) এই বক্তব্যের পরে কারো পিতামাতার জন্য অসিয়ত করা আর বৈধ রইলো না, যা কিনা উপরের আয়াতে একটা আদেশ ছিল। সাহাবীরা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলেন এবং সেজন্য তাঁরা করণীয়ের ব্যাপারে ঐ আদেশে থেমে থাকেন নি। যেমনটা কুর'আনের অগ্রাধিকারের ব্যাপারে তাঁদের কারো কারো বক্তব্যের ব্যাপারে আমাদের মনে হতে পারে – তাঁরা বরং বাস্তবে নবীর (সা.) সুন্নাহকেই প্রয়োগ করেছেন, যদিওবা কুর'আন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আগে কথা বলেছিল। সুতরাং এটা প্রতীয়মান হয় যে, তাঁদের (সাহাবীদের) বক্তব্য মূল্যায়ন করতে গেলে খণ্ডিত চিত্রের বদলে বরং সামগ্রিকভাবে পরিস্থিতিকে মূল্যায়ন করা উচিত। এটা তখনই সবার জানা ছিল এবং প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, সুন্নাহ কুর'আনকে ব্যাখ্যা করে। এ বিষয়ে কামালী বলেন: *"উপরন্তু অধিকাংশের মতে কুর'আনের একটা নিয়ম বা রীতি প্রয়োগের আগে, যে কারো উচিত সুন্নাহর শরণাপন্ন হওয়া এবং নিশ্চিত হওয়া যে, উক্ত নিয়ম বা রীতিকে এমন কোন অর্থ দেওয়া হচ্ছে না, যে ব্যাপারে কুর'আনের বক্তব্য স্বয়ংসিদ্ধ নয়।"*[১১৪] কামালী যা বললেন তা ছিল সাহাবীদের পন্থা। সুতরাং সাহাবীদের কোন একটা নির্দিষ্ট বক্তব্য উদ্ধৃতি দিয়ে যদি এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয় যে, তাঁদের কাছে সুন্নাহর উপরে কুর'আন অগ্রাধিকার পেতো, তাহলে বাস্তবে সেটা হবে ঐ ধরনের বক্তব্য দ্বারা তাঁরা যা বোঝাতে চেয়েছেন তার বিকৃতি।

৬)উপরে ষষ্ঠ যে প্রমাণ উপস্থিত করা হয়েছিল, তা হচ্ছে এই যে, সুন্নাহর কর্তৃত্ব ও মর্যাদা কুর'আন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আর তাই

---

[১১৪] দেখুন: Page#76, *Principles of Islamic Jurisprudence* - Mohammad Hashim Kamali.

www.pathagar.com

সুন্নাহ হচ্ছে এর ফার্ (শাখা) আর তাই আসল (মূল, অর্থাৎ কুর'আন) শাখার উপর অগ্রাধিকার পাবে। এই যুক্তিভিত্তিক তর্ক অনেক দিক থেকেই ত্রুটিযুক্ত। **প্রথমত, কোনটা কুর'আনের অংশ আর কোনটা নয়, তা যে কেউ নবীর (সা.) সাক্ষ্য থেকে জানতে পারে।** অপর কথায় বলতে গেলে *"এটা কুর'আনের অংশ এবং এটা অমুক সূরার অংশবিশেষ"* – নবীর (সা.) এ ধরনের বক্তব্যের ভিত্তিতেই প্রাথমিকভাবে কুর'আন প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং সুন্নাহ্ই [নবীর (সা.) বক্তব্য] বলে দিচ্ছে কুর'আন কি বা কতটুকু। তাই যারা এ ধরনের যুক্তি দেখান, তাদের বলা উচিত যে এক্ষেত্রে সুন্নাহই হচ্ছে মূল, তা শাখা নয়। **দ্বিতীয়ত**, কুর'আনের আয়াতসমূহে এমন কিছু নেই, যা আমাদের বলে যে, কুর'আনের তুলনায় মর্যাদার দিক দিয়ে সুন্নাহ দ্বিতীয় স্থানে আসে। আমরা যেমন আগেই দেখেছি যে, এমন একটি আয়াতও পাওয়া যায় না, যেখানে নবীর (সা.) প্রতি আনুগত্য ছাড়া আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের কথা বলা হয়েছে। অথচ অপরপক্ষে, যে কেউ এমন আয়াত পাবে যেখানে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের উল্লেখ ছাড়াই নবীর (সা.) প্রতি আনুগত্যের কথা বলা হয়েছে। **তৃতীয়ত, আব্দুল খালেক** যেমনটা বলেন, কুর'আন অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তাটা আমরা সুন্নাহ থেকেই জানতে পারি। এর অর্থ এই নয় যে, সুন্নাহই হচ্ছে মূল, আর তাই আপনি কুর'আনকে শাখা হিসেবে গণ্য করতে পারেন।[১১৫] তবে এখানে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি যে, ঐ লাইনের যুক্তিতর্ক অপ্রাসঙ্গিক এবং অর্থহীন।

৭) উপরে ৭ নম্বর যুক্তি ছিল এই যে, রাসূল (সা.)-এঁর কাছ থেকে যা এসেছে, অর্থাৎ সুন্নাহ থেকে যা এসেছে, সেটা তাঁর নিজস্ব ইজতিহাদের ফলাফল হতে পারে, আর তাই সেখানে ভুল-ভ্রান্তি থাকতে পারে। এটা হচ্ছে খোঁড়া যুক্তি। [দ্বীনের ব্যাপারে] নবী (সা.)

---

[১১৫] দেখুন: Page#486-487, *Hujjiyah al-Sunnah* - Abdul Ghani Abdul Khalique

www.pathagar.com

যদি কখনো কোন ভুল করে থাকতেন, তবে আল্লাহ নিশ্চয়ই তাঁকে সেই লাইনে ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত অবস্থায় এগিয়ে যেতে ও তা অন্যের কাছে প্রচার করতে দিতেন না; তার পরিবর্তে বরং আল্লাহ তাঁকে সাথে সাথে সংশোধন করে দিতেন [যেমনটা আমরা নবীর (সা.) জীবনের কিছু ঘটনায় দেখতে পাই।] সুতরাং তাঁর সুন্নাহ তাঁর ভুল ইজতিহাদ হবার কথা নয়, বরং তা আল্লাহ্ কর্তৃক সংশোধিত ও অনুমোদিত ব্যাপার। তাঁর সুন্নাহ্র সংজ্ঞা এভাবেই দেয়া হয়, আর তাই, সেসবের ভিতর কোন ভ্রান্তি থাকতে পারে সে ভয় অমূলক।

৮)অষ্টম যুক্তি ছিল এই যে, সুন্নাহ হচ্ছে কুর'আনের ব্যাখ্যা। সুন্নাহর উপর কুর'আনের শ্রেষ্ঠত্বের প্রশ্নের এই যুক্তিটির কেউ চাইলে বরং কুর'আনের শ্রেষ্ঠত্বের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করতে পারবে। সাধারণভাবে কোন কিছুর ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ মূল ব্যাপারটির যত না মুখাপেক্ষী হয়, তার চেয়ে বরং মূল ব্যাপারটিই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় মত: কর্তৃত্ব ও মর্যাদার ব্যাপারে কুর'আন ও সুন্নাহ সমান গুরুত্ব বহন করে

দ্বিতীয় মতটা হচ্ছে কর্তৃত্ব ও মর্যাদার দিক দিয়ে কুর'আন ও সুন্নাহ সমমানের। আর তাই তাদের একত্রে শরীয়াহ্র উৎস হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। এটা ছিল **ইবনে হাজমের** স্পষ্ট মত। **আবদুল গণি আব্দুল খালেক** তাঁর 'হুজ্জিয়া আল-সুন্নাহ' থিসিসে এই মতকে শক্তভাবে সমর্থন করেন। শুরুতে তিনি বলেন:

"এ ব্যাপারে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই যে, কিতাবখানি [কুর'আন] সুন্নাহর চেয়ে স্পষ্টতই আলাদা এবং শ্রেয়, কেননা এর শব্দাবলী আল্লাহ্র কাছ থেকে আসা ওহী, এর তিলাওয়াত এক ধরনের ইবাদত

www.pathagar.com

এবং মানবকুল এর মত কিছু রচনা করতে অক্ষম। এ সকল বিবেচনায় সুন্নাহ্ এর চেয়ে নিম্ন মর্যাদার। কিন্তু হুজ্জাহ (কর্তৃত্ব, মর্যাদা, প্রমাণ) হিসাবে যখন বিবেচনা করা হবে, তখন উপরে উল্লিখিত গুণাগুণগুলোর উৎকৃষ্টতা এমন কোন প্রয়োজনীয় ব্যাপার নয় যার ফলে উভয়ের ভিতর কোন আপাত বিরোধিতা দেখা দিলে কেউ কেবল কুর'আনই মানবে [এবং সুন্নাহকে অগ্রাহ্য করবে]। এটা এজন্য যে, আইন প্রণয়নের ব্যাপারে কুর'আনের যে কর্তৃত্ব ও মর্যাদা তার পিছনে মূল কারণ হচ্ছে এই যে, তা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আসা ওহী এবং পূর্বে উল্লিখিত অন্যান্য গুণাগুণ এখানে ধর্তব্যের বিষয় নয়। কিতাবখানি যদি অলৌকিক নাও হতো অথবা এর আবৃত্তি যদি একটা ইবাদতের কাজ না হতো এবং [রাসূল (সা.) এঁর] রিসালাত যদি অন্যান্য অলৌকিক কর্মকান্ড দ্বারা নিশ্চিত করা হতো, তবুও আমাদের বলতে হতো যে কুর'আন হচ্ছে এক হুজ্জাহ – যেমনটা এর পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর বেলায়ও প্রযোজ্য। কিন্তু এই দিক থেকে বিচার করলে সুন্নাহ্ কুর'আনের সমপর্যায়ের, কেননা এটাও হচ্ছে এক ধরনের ওহী। সুতরাং কাউকে বলতেই হচ্ছে [আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে দলিল হিসেবে] মর্যাদার ব্যাপারে সুন্নাহ কুর'আনের পরে আসে না।"[১১৬]

ইউসুফ বলেন যে, ইমাম শাফিঈ'র মত এটাই ছিল:

"আল-শাফি'ঈ কুর'আন এবং সুন্নাহ্‌কে একত্রে এবং একই মর্যাদা সহকারে বিবেচনার ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করেন, যেন কখনো এদের একটাকে অপরটির বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর সম্ভাবনাটা নির্মূল করা যায়। সুন্নাহ্‌র সত্যতার প্রমাণ হচ্ছে কুর'আন – এই ধারণাটিকে তিনি যে অস্বীকার করেছিলেন সেটা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাই যদি হতো তাহলে সুন্নাহর একটা বিরাট অংশকে একপাশে সরিয়ে রাখাটা সহজ হতো। ***কুর'আন এবং সুন্নাহ উভয়েরই***

[১১৬] দেখুন: Page#485, *Hujjiyah al-Sunnah* - Abdul Ghani Abdul Khalique

www.pathagar.com

উৎস যেহেতু আল্লাহ্, তাই, কুর'আন এবং সুন্নাহ্‌র মাঝে কোন সহজাত বিরোধ বা বৈপরীত্য থাকতে পারে না – এই প্রশ্নাতীত মৌলিক তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই আল-শাফি'ঈ তাঁর মতামতকে জোরালোভাবে ব্যক্ত করেন। তাঁর নিম্নলিখিত বিখ্যাত সূত্রের মাধ্যমে এই তত্ত্ব ঘোষিত হয়: কুর'আন কেবল কুর'আন দ্বারা বাতিল হতে পারে এবং সুন্নাহ কেবল আরেকটি সুন্নাহর দ্বারা বাতিল হতে পারে। এর মিলিত ফল হচ্ছে 'কিতাব ও সুন্নাহর' একত্রীকরণ।"[১১৭]

এই অবস্থার পক্ষে প্রমাণগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ:

১) কোন রাসূলকে মানার বাধ্যবাধকতা, তিনি কোন কিতাব লাভ করেছেন কিনা তার উপর নির্ভরশীল নয়। কুর'আনে আল্লাহ্ বলেন:

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذۡنِ ٱللَّهِ ﴿٦٤﴾

"আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে তাঁর আনুগত্য করতে হবে, এমন নির্দেশ ছাড়া আমরা কখনোই কোন রাসূল প্রেরণ করি নাই।" (সূরা নিসা, ৪:৬৪)

ব্যাপারটা যদি এরকমই হয়, তবে নবী (সা.) যা বলেছেন তা অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে বা মেনে চলতে হবে – তা কোন কিতাবে রয়েছে কিনা সে বিবেচনা ছাড়াই। **তাঁর কর্তৃত্বের ভিত্তি হচ্ছে এই সত্য যে, তিনি একজন রাসূল** এবং এটা নয় যে, তাঁর কাছে একখানি কিতাব রয়েছে।[১১৮]

---

[১১৭] দেখুন: Page#19, *An essay on the Sunnah:It's Importance, Transmission, Development and Revision* - S.M.Yusuf.

[১১৮] দেখুন: Page#486-487, *Hujjiyah al-Sunnah* - Abdul Ghani Abdul Khalique

www.pathagar.com

২)কুর'আনের মর্যাদা ও কর্তৃত্বের মূল কারণটি হচ্ছে এই যে, তা আল্লাহর কাছ থেকে আসা ওহী। এছাড়া বাকী যে পয়েন্টগুলো উল্লেখ করা হয়েছে (যেমন গোটা কুর'আনই মুতাওয়াতির, তা অলৌকিক, এর তিলাওয়াত করা একটা ইবাদতের কাজ) সেসব কুর'আনের কর্তৃত্ব ও মর্যাদার প্রশ্নে অপ্রাসঙ্গিক, যেমনটা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। উপরন্তু, কুর'আনের আয়াত দ্বারাই এটা ইতিমধ্যে প্রমাণ করা হয়েছে যে, সুন্নাহও আল্লাহ্র কাছ থেকে আসা এক ধরনের ওহী। সুতরাং যারা বলেন যে, সুন্নাহ্র উপর কুর'আন অধিকার পাবে, তারা আসলে বলছেন: **"আল্লাহ্র কাছ থেকে নবীর (সা.) কাছে আসা বা প্রেরণ করা এই ওহী (কুর'আন), আল্লাহ্র কাছ থেকে নবীর (সা.) কাছে আসা ঐ ওহীর (সুন্নাহর) উপর প্রাধান্য পাবে।"** যেহেতু তারা উভয়েই আল্লাহ্র কাছ থেকে আসা ওহী সেহেতু এই দাবী অর্থহীন।

৩)কুর'আনের আয়াতসমূহ নবীর (সা.) প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্যের আদেশ করে। আল্লাহর প্রতি আনুগত্য এবং নবীর (সা.) প্রতি আনুগত্যের প্রশ্নে কুর'আনে সবসময় 'وَ' বা 'এবং' অব্যয় ব্যবহার করা হয়েছে এবং কখনোই "ثُمَّ" বা 'তারপর' ব্যবহার করা হয়নি। এ **সংক্রান্ত সকল আয়াতগুলোর এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের নিহিতার্থ হচ্ছে এই যে, ইসলামে আইনের ব্যাপারে আল্লাহ্র কিতাবের আনুগত্য এবং নবীর (সা.) সুন্নাহর আনুগত্যের মর্যাদা একই।** জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য। কিন্তু আল্লাহ বলেন,

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ... ﴿٨٠﴾

"যে রাসূলের আনুগত্য করে, সে নিশ্চিতভাবে আল্লাহরই আনুগত্য করলো।" (সূরা নিসা, ৪:৮০)

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র ইবাদতের একটা কাজ হিসাবে আল্লাহ্‌র কিতাব অনুসরণ করা হয়। আল্লাহর রাসূলকেও (সা.) অনুসরণ করা হয় আল্লাহ্‌র ইবাদতের একটা কাজ হিসাবে। আল্লাহর রাসূলের কাছ থেকে যা কিছু আসে, তা এই ভেবে মেনে চলা হয় বা অনুসরণ করা হয় যে, তা হচ্ছে ইবাদতের অংশ – নবীর ইবাদত নয় কিন্তু স্বয়ং আল্লাহ্‌র ইবাদত। সুতরাং আল্লাহ্‌র ওহী থেকে নবী (সা.) যা পেশ করেন – তা তাঁর কিতাব থেকেই হোক অথবা সুন্নাহ থেকেই হোক – আল্লাহ্‌র ইবাদতের একটা কাজ হিসেবে প্রশ্নাতীত ভাবে সেটাকে মেনে চলা হয়। নবীর (সা.) মাধ্যমে আসা দুই শ্রেণীর ওহীর মধ্যে পার্থক্য করার কোন অবকাশ নেই।

তৃতীয় মতঃ কুর'আনের উপরে সুন্নাহ প্রাধান্য পাবে

তৃতীয় মত হচ্ছে: কুর'আনের উপর সুন্নাহ্ প্রাধান্য পাবে। এই মতের ভিত্তি হচ্ছে এই যে, নিজেকে ব্যাখ্যা করানোর ব্যাপারে এবং বাস্তবে একে কিভাবে প্রয়োগ করা হবে তা দেখিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে, কুর'আনের সুন্নাহকে প্রয়োজন রয়েছে। এছাড়াও কুর'আনের অনুপস্থিতিতে কেউ তবুও সুন্নাহ্ প্রয়োগ করতে পারে যা কুর'আনের সমস্ত শিক্ষাগুলোকে ধারণ করে। **আল-আওযায়ী** বলেছেন বলে উদ্ধৃতি পাওয়া যায় যে: *"সুন্নাহ্‌র কিতাবখানির যতটুকু প্রয়োজন রয়েছে, তার চেয়ে কিতাবখানির কাছে সুন্নাহর প্রয়োজন বেশী।"*[১১৯]

মাকহুলের কাছ থেকে একই বক্তব্যের বর্ণনা রয়েছে। ইয়াহিয়া ইবন কাসীর এমনকি এরকমও বলেন: *"সুন্নাহ্ কুর'আনকে নিরীক্ষণ (পরীক্ষা নিরীক্ষা) করে কিন্তু কুর'আন সুন্নাহর নিরীক্ষণ করে না।"*[১২০]

---

[১১৯] দেখুন: Page#1193 -1194 (footnote), Vol.2, *Jaami Bayaan al-Ilm wa Fadhlihi* - Yoosuf ibn Abdul Barr.

[১২০] দেখুন: Page#1194, Vol.2, *Jaami Bayaan al-Ilm wa Fadhlihi* - Yoosuf ibn Abdul Barr.

www.pathagar.com

অপর কথায় বলতে গেলে সুন্নাহ্ দেখিয়ে দেয় যে, কুর'আন কিভাবে প্রয়োগ করতে হবে। সুন্নাহ্ যদি দেখিয়ে দেয় যে, কোন একটি নির্দিষ্ট আয়াত কোন সুনির্দিষ্ট ইস্যুতে প্রযোজ্য নয়, তবে সুন্নাহ্র এই নির্দেশনাই ঐ আয়াতের আপাত অর্থের উপর প্রাধান্য লাভ করে – এমনকি যদি ঐ আয়াতটির বাহ্যিক অর্থ, সংশ্লিষ্টতা প্রমাণও করে থাকে। এটা থেকে কার্যত এটাই প্রতীয়মান হয় যে, সুন্নাহ্ কুর'আনের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। এই মতের সপক্ষে আরেকটা যুক্তি হচ্ছে এই যে, নবীর (সা.) বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে কেউ জানতে পারে কুর'আন কি। নবী (সা.) যদি বলে থাকেন **'এটা কুর'আনের অংশ'** তবে সেটাকে কুর'আনের অংশ বলে গণ্য করা হয়। নবী (সা.) যদি বলে থাকেন: **'আল্লাহ্ বলেছেন যে .....'** - যেমনটা হাদীস কুদসীতে দেখতে পাওয়া যায়, অথচ তিনি কখনো বলেন নি যে সেটা কুর'আনের অংশ, আর তাই সেটাকে কুর'আনের অংশ বলে গণ্য করা হয় না। এভাবে যখন বিবেচনা করা হয়, তখন এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, **সুন্নাহ্, অর্থাৎ নবীর (সা.) বক্তব্যই হচ্ছে কুর'আন কি তা বিচার করার ভিত্তি**। সুতরাং তা অগ্রাধিকার বা প্রাধান্য পাবে।

এই তৃতীয় মতটির সপক্ষে সম্ভবত প্রথমটির চেয়ে বেশী যুক্তি-প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু বেশীরভাগ স্কলারই ব্যাপারটাকে এই পর্যন্ত নিয়ে যেতে সংকোচ বোধ করবেন। সুন্নাহ্ কুর'আনকে নিরীক্ষা করে [কুর'আনের বিচার করে], উদাহরণস্বরূপ এই ধরনের বক্তব্যের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে **আহমদ বিন হাম্বল** বলেন, *"আমি অতটুকু যাওয়ার মত স্পষ্টবাদী হবো না। তবে আমি বলবো যে, সুন্নাহ্ (কুর'আনকে) ব্যাখ্যা করে ও নিশ্চিত করে।"*[১২১]

---

[১২১] দেখুন: Page#1194, Vol.2, *Jaami Bayaan al-Ilm wa Fadhlihi* - Yoosuf ibn Abdul Barr.

www.pathagar.com

কুর'আনের বিপরীতে সুন্নাহ্‌র কর্তৃত্ব ও মর্যাদার ব্যাপারে উপরে উল্লিখিত তিনটি মতের পর্যালোচনা করলে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১)সুন্নাহ্‌র উপর কুর'আন অগ্রাধিকার পাবে - যারা এই মতাবলম্বী তারা মনে হয় তাদের মতের পক্ষে বেশ শক্ত যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। তবে একটু নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, আপত্তির মুখে তাদের কোন প্রমাণই ধোপে টেকে না। শেষ পর্যন্ত এরকমটাই মনে হয় যে তাদের মতের সপক্ষে আসলে কোন যুক্তি প্রমাণই নেই।

২)কুর'আন এবং সুন্নাহকে একত্রে একীভূত বা একক হিসেবে সমান অংশীদারীর ভিত্তিতে গ্রহণ করতে হবে। এই মতাবলম্বীদের যুক্তি প্রমাণই সবচেয়ে শক্তিশালী। আসলে **এখানে মূল পয়েন্টটা হচ্ছে কুর'আন এবং সুন্নাহ উভয়েই আল্লাহর কাছ থেকে আসা ওহী**। আর এই কারণেই তাদের কাছে আমরা নিজেদের সমর্পণ করি ও সেগুলো মেনে চলি। এই দুই ধরনের ওহীর একটি অপরটির উপর অগ্রাধিকার পাবে এই কথা যারা দাবী করবেন, যুক্তি-প্রমাণের দায়দায়িত্ব তাদের উপর বর্তাবে। যদিও কেউ কেউ এমনটা প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আমরা উপরে যেমনটা দেখলাম যে, তাদের যুক্তি-প্রমাণ ত্রুটিযুক্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে।

৩)তৃতীয় মতটা হচ্ছে এই যে, সুন্নাহ্ কুর'আনের উপর অগ্রাধিকার পাবে। এখানেও আবার এই মতকে সেই প্রবল সমালোচনার সম্মুখীন হতে হবে: **"যে কারো হাতে এমন কথা বলার জন্য খুব শক্ত প্রমাণ থাকতে হবে যে, দুই শ্রেণীর ওহীর ভিতর এক শ্রেণীর ওহী আরেক**

www.pathagar.com

শ্রেণীর ওহীর উপর প্রাধান্য লাভ করবে।" এমন কোন প্রমাণ আছে বলে মনে হয় না। উপরন্তু এই তৃতীয় মতে কুর'আন এবং সুন্নাহ্‌কে আলাদা আলাদা ব্যাপার বলে গ্রহণ করার ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করে, অথচ, তারা অপরিহার্যভাবে একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত [সম্পূরক ও পরিপূরক]। কোন ব্যক্তি একটাকে বাদ দিয়ে অপরটাকে সঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারে না।

এসব থেকে পরিস্কার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ইসলামী আইনের উৎস ও সূত্র হিসাবে বিবেচনা করার প্রশ্ন যখন আসবে, তখন কুর'আন ও সুন্নাহ্‌র মর্যাদা সমপর্যায়ের। সৌভাগ্যবশত স্কলারদের ভিতর এই মতপার্থক্য তাদের ফিক্‌হী সিদ্ধান্তের উপরে তেমন একটা প্রভাব ফেলেনি। অন্যকথায় বলতে গেলে, আবারো বলতে হয় যে, স্কলারদের মতপার্থক্যগুলো বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই কেবলি শব্দার্থিক – একটা মাত্র ব্যতিক্রম ছাড়া যেখানে সুন্নাহ্‌কে কুর'আনের কোন আয়াতকে বাতিল করতে দেয়া হয়, যে ব্যাপারটাকে আল-শাফি'ঈ সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন।

আমাদের এই সিদ্ধান্ত কিছুতেই কুর'আনের গুরুত্বকে খাটো করে দেখার প্রয়াস নয়। বরং এটা হচ্ছে সঠিকভাবে কুর'আন বোঝা ও প্রয়োগ করার বিষয়। **আল-মুতরাফ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আল শুখায়েরকে** কেউ একবার বলেছিলেন, *"কুর'আন ছাড়া আমাদের সাথে কথা বলো না।"* তিনি বলেছিলেন, *"আল্লাহর শপথ, আমরা কুর'আনের কোন বিকল্প চাই না। কিন্তু যিনি কুর'আনের ব্যাপারে আমাদের চেয়ে জ্ঞানী [রাসূল (সা.)], আমরা তাঁকে চাই।"* [১২২]

---

[১২২] দেখুন: Page#1193, Vol.2, *Jaami Bayaan al-Ilm wa Fadhlihi* - Yoosuf ibn Abdul Barr.

www.pathagar.com

যে কাউকে অবশ্যই আল্লাহ্‌কে মানতে হবে এবং রাসূলকে (সা.) মানতে হবে – এ কথাটা আল্লাহ্‌ বারবার কুর'আনে উচ্চারণ করেছেন। দুটো ব্যাপার একত্রে হাতে হাত রেখে চলে। আরেকটি আয়াতে আল্লাহ্‌ বলেন রাসূল (সা.)-এঁর প্রতি আনুগত্য আসলে আল্লাহ্‌রই প্রতি আনুগত্য। সুতরাং 'প্রথমে কুর'আন পরে সুন্নাহ্‌' এমনটা ভাবার কারো কোন অবকাশ নেই।

বাস্তবে কুর'আন এবং সুন্নাহ্‌র ভিতর কোন পরস্পর বিরোধিতা নেই, কারণ দুটোই আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আসা ওহী। দুটোই একত্রে যায়। দুটোই অপরিহার্য। শরীয়াহ্‌ দুটো উৎসের সমন্বয়ে গঠিত যেমনটা নবী (সা.) নিজে সকল মুসলিমকে মনে করিয়ে দিয়েছেন: ***"আমি তোমাদের মাঝে দুটো বিষয় রেখে গিয়েছি, যেগুলোর সাথে যদি তোমরা লেগে থাক তাহলে তোমরা কখনোই পথভ্রষ্ট হবে না: আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর (সা.) সুন্নাহ্‌।"*** (মালিক, আল-হাকিম ও আল-বাইহাকি, হাদীসটি সহীহ)

আবারও কুর'আন না সুন্নাহ্‌ কোনটা অগ্রাধিকার পাবে এই ইস্যুটি কেবলই শব্দার্থিক, যেমনটা আল-সালাফী তার উপসংহারে বলেন – কেননা সংশ্লিষ্ট সকল স্কলারই এ ব্যাপারে একমত যে, সুন্নাহ্‌ কুর'আনের একটি আয়াতকে সুনির্দিষ্ট করতে পারে, তার প্রয়োগকে শর্তসাপেক্ষ করতে পারে ইত্যাদি।[১২৩] স্কলাররা কিভাবে কুর'আন এবং সুন্নাহ প্রয়োগ করেন, সে প্রশ্ন যখন আসে, তখন নিশ্চিতভাবে এসব বাকবিতণ্ডা তার উপরে কোন প্রভাব ফেলে না। কিন্তু অন্যদের,

---

[১২৩] দেখুন: Page#95, *Al-Sunnah: Hujiyyatuhaa wa Makaanatuhaa fi-l-Islaam wa al-Raad ala Munkireehaa* - Muhammad Luqmaan al-Salaafi

www.pathagar.com

যাদের মাথায় এ ব্যাপারটা প্রতিষ্ঠিত যে প্রথমে কুর'আন আসবে তারপর সুন্নাহ্, তাদের উপর এসবের কোন প্রভাব থাকতে পারে। এসব বাকবিতন্ডার ফলে তারা হয়তো কুর'আন অধ্যয়নের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করতে পারেন এবং একই সময়ে সুন্নাহ্কে উপযুক্ত মনোযোগ না দিতে পারেন এবং তা অধ্যয়নের পিছনে পর্যাপ্ত সময়ও না দিতে পারেন। তার ফলে হয়তো সূক্ষ্মভাবে হলেও, তারা সুন্নাহ্র ভূমিকাকে খাটো করে দেখতে পারেন এবং কোন হাদীস শুনলে সেটাকে উপযুক্ত গুরুত্ব নাও দিতে পারেন। অতএব, এই ভুলবোঝাবুঝি অবশ্যই দূর করতে হবে। যখন কেউ এটা অনুধাবন করবেন যে, দুটো বিষয়ই আল্লাহ্র কাছ থেকে আসা ওহী বলে তাদের মর্যাদা সমপর্যায়ের, তখনই এটাও অনুধাবন করা উচিৎ যে তারা উভয়েই সমান গুরুত্ব, মর্যাদা ও নিয়মিত অধ্যয়ন বা গবেষণার দাবীদার।

উপরন্তু কিছু কিছু লেখক, **"প্রথমে কুর'আন এবং তারপরে সুন্নাহ"** এই ধারণাকে এমনভাবে ব্যবহার করেছেন যা সত্যিই বিভ্রান্তিকর। **আবদুল খালেক** এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, কিছু লেখক **আল-শাতিবী**র মতের সঙ্গে ঐকমত্য প্রকাশ করে বলেন যে, আইন প্রণয়নের সূত্র হিসাবে সুন্নাহর স্থান দ্বিতীয়, অর্থাৎ কুর'আনের পরে – কিন্তু তা থেকে তারা যা দেখাতে চান বা প্রমাণ করতে চান সেটা গ্রহণযোগ্য নয়। তারা তাদের ঐ মতামতকে একটা ধুম্রজাল হিসাবে ব্যবহার করে তার আড়াল থেকে **এটা দেখাতে চান যে, বাস্তবে যে সকল সুন্নাহ কুর'আনকে ব্যাখ্যা করে, সেগুলো আসলে কুর'আনের বাহ্যিক অর্থের বিরোধিতা করে।** সুন্নাহ্ যেহেতু কুর'আনের পরে দ্বিতীয় স্থানে আসে, সেহেতু ঐ ধরনের সুন্নাহ প্রত্যাখ্যান করতে হবে এবং সেই ক্ষেত্রে যে কাউকে কেবল কুর'আনের বাহ্যিক অর্থটাই

www.pathagar.com

অনুসরণ করতে হবে।[১২৪] একবার যখন এটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় যে, সুন্নাহ্র কুর'আনের সমমানের একটা পদমর্যাদা রয়েছে, তখন ঐ ধরনের বিভ্রান্তিকর যুক্তিতর্কের দ্বার চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।

সুন্নাহর মর্যাদা কুর'আনের সমমানের, এটা প্রতিষ্ঠিত হবার পরে এর উপর ভিত্তি করে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় – সেটা হচ্ছে **কোন একটা বিশ্বাস বা কর্মকান্ড বৈধ হবার জন্য কুর'আনে তার উল্লেখ থাকতেই হবে এমন কোন কথা নেই**। ইতিপূর্বে নবীকে (সা.) 'আইনের এক স্বনির্ভর উৎস' হিসেবে আমরা যখন বর্ণনা করেছিলাম, তখন এই সিদ্ধান্তটির কথা আলোচিত হয়েছিল। তবু এখানে কথাটা আবার উল্লেখ করা ভাল। কারণ এই বিষয়টা নিয়ে কেউ কেউ বিভ্রান্ত, আর অন্যরা পথভ্রষ্ট।

উপসংহার

এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, কুর'আন ও সুন্নাহ্ দুটোই আল্লাহ্র কাছ থেকে এসেছে। দুটোই আল্লাহর কাছ থেকে আসা ওহী, আর তাই দুটোকে সমান মর্যাদা দিয়েই তাদের কাছে আমাদের নিজেকে সমর্পণ করতে হবে। আইন প্রণয়নের ব্যাপারে কর্তৃত্বের প্রশ্নে এবং উদ্দেশ্যের প্রশ্নে, যে ওহী কিতাবের অংশ হিসেবে তিলাওয়াত করা হয় এবং যে ওহী কিতাবের অংশ হিসেবে তিলাওয়াত করা হয় না - তাদের মাঝে কোনই তফাৎ নেই। তারা উভয়ে মানবকুলের জন্য পথনির্দেশনা গঠন করে।

---

[১২৪] দেখুনঃ Page#489, footnote#4, *Hujjiyah al-Sunnah* - Abdul Ghani Abdul Khalique

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

আল্লাহ কর্তৃক সুন্নাহর সংরক্ষণ

আল্লাহ্ যে সুন্নাহ্ সংরক্ষণ করেছেন, সে ব্যাপারে কিতাবী (নাকলী) ও যুক্তিভিত্তিক (আকলী) দুই ধরনের প্রমাণই রয়েছে। কিতাবী প্রমাণের ভিত্তি হচ্ছে নিম্নলিখিত আয়াত যেখানে আল্লাহ্ বলেছেন:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَـٰفِظُونَ ۝٩

"আমরাই এই স্মরণিকা (যিক্‌র) নাযিল করেছি এবং নিশ্চিতই আমরাই এর সুরক্ষাকারী।" (সূরা হিজর, ১৫:৯)

কুর'আনে "আল-যিক্‌র" শব্দটি এবং তা থেকে উদ্ভূত শব্দাবলীর বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। যেমন নিম্নলিখিত আয়াতে 'কুর'আন' বুঝিয়ে বলা হচ্ছে:

وَهَـٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَـٰهُ ۝٥٠

"এটা এক কল্যাণময় স্মরণিকা (যিক্‌র) যা আমরা নাযিল করেছি।" (সূরা আম্বিয়া, ২১:৫০)

আবার কখনো সুন্নাহ্ বোঝাতে এই অভিব্যক্তি ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন নিম্নলিখিত আয়াত:

www.pathagar.com

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

"তোমার কাছে আমরা এই স্মরণিকা (যিক্‌র) নাযিল করেছি যেন তুমি মানবকুলকে, তাদের জন্য যা নাযিল করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা করতে পার... ।" (সূরা নাহল, ১৬:৪৪)

এছাড়া আল্লাহ্‌র দ্বীন ও আইনকে সর্বতোভাবে বোঝাতেও 'যিক্‌র' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। যেমনটি আমরা নিম্নলিখিত আয়াতে দেখিঃ

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالاً نُّوحِىٓ إِلَيْهِمْ ۚ فَسْـَٔلُوٓاْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾

"সুতরাং তোমরা যদি না জান, তাহলে যারা ওহী (যিক্‌র) সম্বন্ধে জ্ঞানী তাদের জিজ্ঞাসা কর ।" (সূরা নাহল, ১৬:৪৩)

এখানে "যিক্‌র" বলতে আল্লাহ্‌র দ্বীন বোঝানো হয়েছে অথবা মানবকুলের পথ নির্দেশনার জন্য আল্লাহ যা কিছু নাযিল করেছেন, তার সবকিছুকেই বোঝানো হয়েছে। সুতরাং এটা নিশ্চিত করে বলা যায় না যে, সূরা হিজরের ৯ নং আয়াত যেখানে আল্লাহ্‌ বলেছেন **"আমরাই এই স্মরণিকা নাযিল করেছি এবং নিশ্চিতভাবেই আমরাই এর সুরক্ষাকারী"** – সেখানে কেবল কুর'আনের কথাই বলা হয়েছে। বাস্তবে আমরা যুক্তি দেখাব যে, এই আয়াতে "আল-যিক্‌র" বলতে হয় কুর'আন ও সুন্নাহ দুটোকেই বুঝানো হয়েছে, অথবা, কেবল সুন্নাহ্‌র কথা বোঝানো হয়েছে। কিন্তু এটা সম্ভব নয় যে, এখানে শুধু কুর'আনের কথাই বলা হয়েছে। এটা এজন্য সত্যি যে, কেবল

www.pathagar.com

কুর'আনের অক্ষরগুলোই সংরক্ষণ করা হবে - এই ধারণাটা অকল্পনীয়। কুর'আন সংরক্ষণের অর্থ অবশ্যই কেবল অক্ষরগুলো (বা শব্দাবলী) সংরক্ষণ নয় বরং এর শব্দাবলী ও অর্থ দুটোই সংরক্ষণ করা বোঝায়। আমরা আগে যেমন দেখেছি কুর'আনের অর্থ নবীর (সা.) সুন্নাহয় ধারণকৃত অবস্থায় রয়েছে এবং সুন্নাহ ছাড়া এর অর্থ উদ্ধার করা সম্ভব নয়। সুতরাং এই আয়াতে যখন আল্লাহ্ যিক্‌রকে সংরক্ষণ করার অঙ্গীকার করেন, তখন সম্ভবত তিনি কুর'আন ও সুন্নাহ্ দুটোর কথাই বোঝাচ্ছেন অথবা কেবল সুন্নাহ্‌র কথাই বোঝাচ্ছেন। [এমন অনেক আয়াত আছে যেখানে বলা হয়েছে যে, কুর'আনকে বিকৃত করা যাবে না। সুতরাং সূরা হিজরের এই আয়াত যে কেবল কুর'আনের বেলায়ই প্রযোজ্য হবে - এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই।] এখানে গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হচ্ছে এই বাস্তবতা যে, আল্লাহ্ যা কিছু সংরক্ষণ করার অঙ্গীকার করেছেন, তার মাঝে নিশ্চিতভাবেই সুন্নাহ্ অন্তর্ভুক্ত।

আসলে **"আমরাই এই ... সুরক্ষাকারী"**– এই আয়াতে যিক্‌র বলতে যে কুর'আন এবং সুন্নাহ দুটোই বোঝানো হয়েছে এবং দুটোকেই সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে এই মতটাই সবচেয়ে শক্তিশালী। এ ব্যাপারে **ইবন হাজম** বলেন: *"ভাষা বিশেষজ্ঞ অথবা সিরাত বিশেষজ্ঞ এদের কারোই এ ব্যাপারে মতপার্থক্য নেই যে, আল্লাহ্ যা কিছু নাযিল করেছেন, তার সবকিছুকে এখানে নাযিলকৃত "যিক্‌র" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এবং ওহীর সবটুকুই আল্লাহ্ কর্তৃক সংরক্ষণের আওতায় সংরক্ষিত রয়েছে। আল্লাহ্ তাঁর সংরক্ষণের আওতায় যা কিছুকে সংরক্ষণ করে থাকেন তার কিছুই হারাবে না। অথবা এর কিছুই কখনো বিকৃতও হবে না – মিথ্যা আরোপের (বিকৃতির) পরিষ্কার প্রমাণ স্পষ্ট হওয়া ছাড়া [অর্থাৎ সেসবকে কেউ যদি বিকৃত করেও,*

www.pathagar.com

তবে তা স্পষ্টত ধরা পড়ে যাবে]।"[১২৫]

উপরন্তু কেউ যদি দাবী করেন যে, সূরা হিজরের ৯ নং আয়াতে "যিক্‌র" বলতে কেবল কুর'আনই বোঝানো হয়েছে, তবে দলিল প্রমাণের দায়-দায়িত্ব তার উপরই বর্তাবে। কেননা এই ধরনের একটা ব্যাখ্যা "যিক্‌র" শব্দের সাধারণ অর্থকে সীমিত করে ফেলবে। অথচ, নিশ্চিত প্রমাণ ছাড়া যে কেউ কোন একটা শব্দের অর্থকে সংকীর্ণ বা সীমিত করতে পারেন না। এ ক্ষেত্রে 'যিক্‌র' অভিব্যক্তিটিকে সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করার পক্ষে কোন ভাল যুক্তি বা প্রমাণ নেই, পক্ষান্তরে আমরা উপরে যেমন দেখিয়েছি, এই শব্দের আওতায় কুর'আন অথবা সুন্নাহ এই দুটোকেই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে – ওহীর বা যিক্‌রের দু'টো ধরন যার উভয়ই নবী (সা.) লাভ করেছিলেন।[১২৬]

যুক্তিভিত্তিক একটা তর্ক উপস্থাপন করতে হলে, তা এভাবে করতে হবে: **ইসলামী বিশ্বাস অনুযায়ী কুর'আন হচ্ছে শেষ ওহী বা সর্বশেষ নাযিলকৃত কিতাব এবং নবী মুহম্মদ (সা.) হচ্ছেন আল্লাহ্‌র সর্বশেষ রাসূল। আল্লাহ্ যদি সুন্নাহ্ সংরক্ষণ না করতেন, তাহলে সহীহ সুন্নাহ হারিয়ে যেতো। আর সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ মুসলিমদের এমন কিছু অনুসরণ করার আদেশ দিতেন, যা তাদের পক্ষে সম্ভবত অনুসরণ করা সম্ভব হতো না। সেই ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আল্লাহ্‌র দয়া, প্রজ্ঞা ও সুবিচার সম্বন্ধে আমরা যা জানি তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে না। তাই যুক্তি এটাই বলে যে, আল্লাহ্ অবশ্যই সুন্নাহ্‌কেও সংরক্ষণ করে রেখেছেন।**

এরকম যুক্তিতর্কের অর্থ এই নয় যে, কুর'আন ও সুন্নাহ্ সংরক্ষণ করতে গিয়ে আল্লাহ্ কোন জাগতিক উপায় অবলম্বন করেন নি।

---

[১২৫] দেখুন: Page#109, Vol.1, *Al-Ihkaam fi Usool al-Ahkaam* - Ali ibn Hazm

[১২৬] দেখুন: Page#109-110, Vol.1, *Al-Ihkaam fi Usool al-Ahkaam* - Ali ibn Hazm

www.pathagar.com

সাহাবাদের মাধ্যমে আল্লাহ্ যেভাবে কুর'আনকে সংরক্ষণ করেছেন তা স্পষ্ট ও সর্বজনবিদিত।[১২৭] কিন্তু যে সমস্ত উপায়ে ও পদ্ধতিতে সুন্নাহ্‌কে সংরক্ষণ করা হয়েছে, সেগুলো সম্বন্ধে অনেকেরই স্পষ্ট ধারণা নেই। আর তাই, যে সমস্ত উপায়ে সুন্নাহ্‌কে সংরক্ষণ করা হয়েছিল, তার কয়েকটি আমরা এখানে আলোচনা করবো ইনশা'আল্লাহ।

কতগুলো উপায় যার মাধ্যমে আল্লাহ সুন্নাহ সংরক্ষণ করেছেন

মানুষের মাধ্যমে আল্লাহ্ অনেক উপায়ে সুন্নাহ্ সংরক্ষণ করেছেন। এর কিছু কিছু কেবল মুসলিম জাতির মাঝেই বিদ্যমান। এটা হচ্ছে মুসলিমদের প্রতি আল্লাহ্‌র তরফ থেকে বিরাট আশীর্বাদ ও দয়ার দান, সেজন্য প্রত্যেক মুসলিমের উচিত আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বস্তভাবে কৃতজ্ঞ থাকা – আল্লাহ্‌র কাছে কৃতজ্ঞ থাকা ও সেই সকল ব্যক্তির কাছে কৃতজ্ঞ থাকা যাঁরা শেষ নবীর (সা.) শিক্ষাকে সংরক্ষণ করতে গিয়ে তাদের সময় ও সম্পদ কুরবানী করেছেন।

হাদীস সংরক্ষণ করতে গিয়ে যেসব বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে, সেগুলোর বিস্তারিত আলোচনা করা এই বইয়ের আওতা বহির্ভূত। কেননা এই অধ্যায় বা এই সংক্রান্ত আলোচনা আমাদের এই বইয়ের মূল বিষয় নয়। তবু এইসব বিভিন্ন পন্থার কয়েকটি সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করছি। কেননা সুন্নাহ্ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, তার অন্যতম প্রধান একটি হচ্ছে এই যে, হাদীসসমূহ কিভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছিল সে সম্বন্ধে অনেকের মনেই একটা ভুল ধারণা রয়েছে।

[১২৭] দেখুনঃ Page#31-56, *Ulum al-Quran:An Introduction to the Sciences of the Quran* - Ahmad von Denfer

www.pathagar.com

স্পষ্টতই নবীর (সা.) হাদীসের সত্যিকার সংরক্ষণের জন্য সংরক্ষণের পদ্ধতিগুলোর প্রয়োগ শুরু থেকেই থাকাটা আবশ্যক। সুতরাং হাদীস সংরক্ষণের শুরুর দিকের সময় পর্যন্ত পেছনে গিয়ে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলো পর্যালোচনা করব :

১)প্রথমত, হাদীস সংরক্ষণের ব্যাপারে তাদের যে গুরুদায়িত্ব রয়েছে, সে বিষয়টা সাহাবীরা অনুধাবন করেছিলেন। উপরন্তু তাঁরা নিশ্চয়ই এটাও বুঝেছিলেন যে, নবীর (সা.) কথাগুলোকে তাঁদের অবিকৃতভাবে সম্ভাব্য চূড়ান্ত শুদ্ধতা সহকারে উপস্থাপন করতে হবে।

২)শুরুর দিকের বছরগুলোতে হাদীস ও সেগুলোর বর্ণনাকারীদের বিচার-বিশ্লেষণের কাজ শুরু হয়। এ থেকে একটা নতুন বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়, যেটাকে বলা হয় **'আল জার ওয়া আল তা'দীল'**।

৩)নবীর (সা.) হাদীস লিখে রাখার একটা প্রথাও প্রচলিত ছিল। স্পষ্টতই কোন কিছুকে সংরক্ষণ করার একটা উপায় হচ্ছে তা লিপিবদ্ধ করা। হাদীস লিখে রাখার ব্যাপারে অনেক কিছুই দাবী করা হয়ে থাকে এবং ঐ ব্যাপারে বহু ভুল ধারণাও রয়েছে। সুতরাং, এই পর্যায়ে সে সব আলোচনার দাবী রাখে।

৪)সুন্নাহ সংরক্ষণ করার ব্যাপারে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অদ্বিতীয় বিষয় কাজ করছিল – যা হচ্ছে ইসনাদ বা বর্ণনাকারীদের যোগসূত্র। যা অনুসরণ করে যে কোন একটা বক্তব্যের উৎস খোদ নবী (সা.) পর্যন্ত পৌঁছায়।

৫)আরো একটি অদ্বিতীয় পন্থা - যার মাধ্যমে সুন্নাহ্ সংরক্ষিত হয় তা হচ্ছে উৎস খুঁজতে গিয়ে এবং হাদীস সংগ্রহ করতে গিয়ে হাদীস শাস্ত্রবিদদের দূরদূরান্ত ভ্রমণ।

www.pathagar.com

সবশেষে সংক্ষেপে আমরা আরো একটি ব্যাপার আলোচনা করতে চাই, যেটা হচ্ছে জাল হাদীসের প্রথম আবির্ভাব বা প্রচলন।

এছাড়া সুন্নাহ সংরক্ষণের ব্যাপারে আরো নানান দিক রয়েছে, যেগুলো ঠিক কিতাবী আলোচনায় আসে না। উদাহরণস্বরূপ, কেবল হাদীসের সনদের দিক দিয়ে তাকিয়ে এটা বোঝার উপায় নেই যে, নবীর (সা.) হাদীস লেখন, মুখস্থ করা ও সংরক্ষণ করার ব্যাপারে প্রথম যুগের মুসলিমদের কি দারুণ উৎসাহ ছিল। নবীর (সা.) হাদীস শিক্ষার ব্যাপারে এই দারুণ উৎসাহ বা আকাঙ্খা নানাভাবে প্রতিফলিত হয়। যেমনটা আমরা আগেই বলেছি, এই উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রতিফলিত হয় এমন একটা ব্যাপার নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করব: **যেটা হচ্ছে হাদীস শিক্ষা লিপিবদ্ধ ও সংগ্রহ করতে নিজের সময় ও সম্পদ ব্যয় করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভ্রমণ।**

নিজেদের গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে সাহাবীদের অনুধাবন

নবী (সা.) সাহাবীদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি যা বলছেন তা গ্রহণ করা এবং অন্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার গুরুদায়িত্ব তাঁদের উপর বর্তায়। নবীর (সা.) এই নির্দেশনা তাঁর বেশ কিছু বক্তব্যে পাওয়া যায় – যার কয়েকটি বহু সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ নবী (সা.) বলেন, ***"আমি যা বলেছি তা যে শুনলো এবং অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত তা তার স্মৃতিতে সংরক্ষিত রাখলো, আল্লাহ্ যেন তার মুখ উজ্জ্বল করেন। হয়তোবা যার কাছে কথাটা পৌঁছে দেয়া হয় তার অনুধাবন তার চেয়ে গভীরতর হতে পারে।"***[১২৮]

---

[১২৮] এখানে উদ্ধৃত হাদীসটির শব্দাবলী হচ্ছে তিরমিযীর। আব্দুল মুহ্সীন আল আব্বাদ শুধু এই হাদীসটি নিয়ে ২৬৩ পৃষ্ঠার একখানা বই লিখেছেন। হাদীসটি নিঃসন্দেহে একটা মুতাওয়াতির

www.pathagar.com

এই হাদীস বহু সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। এই হাদীস থেকে সাহাবীরা বুঝেছিলেন যে সুন্নাহ্ অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়াটা তাদের দায়িত্ব – এবং ঠিক সেইভাবে পৌঁছে দেওয়া যেমনটি তারা নবীর (সা.) কাছে শুনেছেন।

আরেকটি হাদীসে এসেছে:

"আমার কথা পৌঁছে দাও, এমনকি তা যদি একটি আয়াতও হয়। এবং বনী ইসরাঈলের গোত্রগুলোর কাহিনী থেকে বর্ণনা কর তাতে কোন ক্ষতি নেই। আর আমার নামে যে কেউ মিথ্যা আরোপ করলো সে জাহান্নামের আগুনে নিজের আসন বানিয়ে নিলো।" (বুখারী)

এখানেও নবীর (সা.) কাছ থেকে তাঁর বক্তব্য পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশনা এসেছে। তার সাথে সাথে এসেছে কঠোর সতর্কবাণী: **"আর আমার নামে যে মিথ্যা .....।"** আপাতদৃষ্টিতে নবী (সা.) ঐ সাবধানবাণী কয়েকটি ঘটনায় উল্লেখ করেছেন কেননা, ঐ কথাগুলো নবীর (সা.) মুখ থেকে উচ্চারিত বলে পঞ্চাশজনের বেশী সাহাবী বর্ণনা করেছেন। সাহাবীরা পবিত্র কুর'আন থেকে জেনেছিলেন যে, বাণী পৌঁছে দেবার ব্যাপারে তাদের একটা বাধ্যবাধকতা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ আবু হুরায়রার (রা.) জীবদ্দশায় তিনি অন্যদের চেয়ে অধিক হারে হাদীস বর্ণনা করেছিলেন। কেউ কেউ এ ব্যাপার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন যে, যেসব সাহাবী তাঁর চেয়ে নবীর (সা.) বেশী কাছের ছিলেন, তাঁদের চেয়েও তিনি বেশী হাদীস কেন বর্ণনা করেছিলেন। এই সব প্রশ্নের জবাবে আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, *"লোকেরা বলছে, 'আবু হুরায়রা খুব বেশী সংখ্যায় বর্ণনা করে।' কুর'আনের দুইটি আয়াতের ব্যাপার না হলে আমি একটি হাদীসও বর্ণনা করতাম না।"*

হাদীস। তিনি এই উপসংহারে পৌছেন যে, হাদীসটি ২৪ জন সাহাবী (রা.), রাসূল (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তা ৪৫টিরও বেশী হাদীসগ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

www.pathagar.com

তারপর তিনি কুর'আনের নিম্নলিখিত আয়াত দুটো তিলাওয়াত করেনঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَـٰبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا ۙ أُو۟لَـٰٓئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٤﴾

"আল্লাহ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যারা তা গোপন রাখে ও বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করে, তারা তাদের উদরে অগ্নি ছাড়া আর কিছু পুরে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না। তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে।" (সূরা বাক্বারা, ২:১৭৪)

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَـٰتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا بَيَّنَّـٰهُ لِلنَّاسِ فِى ٱلْكِتَـٰبِ ۙ أُو۟لَـٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّـٰعِنُونَ ﴿١٥٩﴾

"কিতাবে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পরও যারা মানুষের জন্য আমরা যেসব স্পষ্ট নিদর্শন ও পথ-নির্দেশনা অবতীর্ণ করেছি তা গোপন রাখে, তাদের উপর আল্লাহর লা'নত এবং অভিশাপকারীগণের অভিশাপ।" (আল বাক্বারা, ২:১৫৯)

এরপরে আবু হুরায়রা (রা.) তাঁর বক্তব্যের রেশ ধরে বলেন যে, যখন অন্যান্য মুসলমানগণ তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণে ব্যস্ত ছিলেন, তিনি তাঁর সমগ্র সময়টুকুই নবীর (সা.) সাহচর্যে কাটিয়েছেন – উপস্থিত থেকে - যখন অন্যরা অনুপস্থিত ছিলেন। (বুখারী, মুসলিম)। সাহাবীরা এটাও অনুধাবন করেছিলেন যে, বর্ণনার

www.pathagar.com

ব্যাপারে তাঁদেরকে অত্যন্ত সাবধান থাকতে হবে। তাঁরা বুঝেছিলেন যে, নবীর (সা.) প্রতি কোন মিথ্যা আরোপ সম্বন্ধে উপরে উদ্ধৃত সতর্কবাণী - যারা ইচ্ছা করে মিথ্যা বলবে তাদের বেলায় যেমনটি প্রযোজ্য, তেমনি অনিচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা আরোপকারীর বেলায়ও প্রযোজ্য। সহীহ্ বুখারীর বর্ণনায় এসেছে, সাহাবী **আল যুবায়েরকে** জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, অন্যদের মত তিনি কেন তেমন সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেন নি? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, *"আমার ব্যাপার হচ্ছে, আমি তাঁর থেকে [নবীর (সা.) কাছ থেকে] কখনো বিচ্ছিন্ন হইনি। কিন্তু আমি তাঁকে বলতে শুনেছি,* ***'আমার নামে যে কেউ মিথ্যা আরোপ করবে সে জাহান্নামের আগুনে তার স্থান করে নেবে'****।"* এই বক্তব্যের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে **ইবন হাজর** বলেন যে, *"এখানে আল যুবায়ের স্পষ্টতই তাঁর নিজের নবীর (সা.) নামে বানোয়াট কিছু বলার কথা উল্লেখ করছেন না। তিনি বরং ভয় পাচ্ছিলেন যে তিনি যদি অনেক বর্ণনা করতেন, তবে তিনি হয়তো ভুল করতেন। আর সেই ভুল হয়তো তাঁকে ঐ হাদীসে যাদের বিরুদ্ধে সাবধানবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে তাদের দলভুক্ত করতো।"* [১২৯]

আনাস বিন মালিক (রা.) আরো বলেছেন, *"আমি ভুল করবো এমন ভয় না থাকলে, আমি হয়তো তোমাদের কাছে এমন কিছু ব্যাপার বর্ণনা করতাম, যা আমি আল্লাহ্র রাসূলের (সা.) কাছে শুনেছি। কিন্তু আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, 'যে আমার নামে মিথ্যা কিছু আরোপ করবে, সে জাহান্নামের আগুনে নিজের আসন গ্রহণ করে'।"* এখান থেকে আমরা দেখতে পাই যে, সাহাবীদের একজন **আনাস** (রা.) বুঝেছিলেন যে, ঐ সাবধানবাণী যে **অনিচ্ছাকৃতভাবে** হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে ভুল করবে, **তার বেলায়ও প্রযোজ্য**।

---

[১২৯] দেখুন: Page#201, Vol.1, *Fath al-Baari bi Sharh Saheeh al-Bukhari* - Ahmad ibn Hajr.

www.pathagar.com

বাস্তবে কিছু সাহাবী, যেমন আবু হুরায়রা (রা.), নবীর (সা.) কাছ থেকে পাওয়া হাদীসগুলোর গবেষণা ও স্মৃতিতে ধারণের চর্চা জারী রেখেছিলেন। সুতরাং, ভুল করার ব্যাপারে তাদের তেমন ভয়ের কোন কারণ ছিল না। অপর পক্ষে যারা হাদীসের গবেষণায় নিজেদেরকে উৎসর্গ করেন নি, তাদের ভয় পাওয়ার কারণ ছিল। কেননা তারা যখন রাসূলুল্লাহ্‌র (সা.) কাছ থেকে কিছু বর্ণনা করছিলেন, তখন তাদের স্মরণে ভুল-ভ্রান্তি হবার সম্ভাবনা ছিল বেশী।

হাদীসের নথিভুক্তি বা লিপিবদ্ধকরন

এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় যাবার আগে একটা বিষয় উল্লেখ করার প্রয়োজন রয়েছে, যা হলো এই যে, কোন কিছু সংরক্ষণ করার জন্য, তা যে লিখে রাখতেই হবে এমন কোন শর্ত বা বাধ্যবাধকতা নেই। সাদামাটাভাবে এটা এইজন্য যে, কোন কিছু লেখা হয়নি তার মানে এই নয় যে তা শুদ্ধ ও সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হয়নি। উপরন্তু, কিছু লিখে রাখাটাই সংরক্ষণের জন্য যথেষ্ট নয়। এটা সম্ভাব্য যে কোন কিছু ভুলভাবেও লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকতে পারে। হাদীসের স্কলাররা এ দুটো বিষয়ই যথাযথভাবে অনুধাবন করেছিলেন। হাদীস গ্রহণ করার জন্য তাই হাদীস লেখা থাকতে হবে, এই শর্ত তারা আরোপ করেন নি। যদিও নথিভুক্ত থাকার গুরুত্বটা তারা অনুধাবন করেছিলেন এবং অনেক সময়ই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিত্বের নিরিখে মৌখিক বর্ণনার চেয়ে তারা হয়তো লিখিত সংগ্রহকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। এসব স্কলাররা এটাও বুঝতে পেরেছিলেন যে, কোনকিছু কেবল লিখে রাখাটা যথেষ্ট নয়। এটাও নিশ্চিত করতে হবে যে, তা সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তাই হাদীসের স্কলাররা পূর্ববর্তী স্কলারদের লিখিত বর্ণনাকে তখনই কেবল অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন যখন এটা জানা থাকে যে, ঐসব পূর্ববর্তী স্কলারগণ তাদের লেখার ব্যাপারে দক্ষ ও শুদ্ধ ছিলেন।

www.pathagar.com

ওরিয়েন্টালিস্ট বা প্রাচ্য-বিশেষজ্ঞদের প্রিয় প্রসঙ্গ-সমূহের একটি হচ্ছে, প্রতিনিয়ত এই বাস্তবতা উল্লেখ করা যে, প্রথম দিকে হাদীসসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়নি বরং হিজরতের পরের দুই শতাব্দী জুড়ে সেগুলো কেবলই মৌখিকভাবে প্রসার লাভ করেছিল। আর তাই তারা বলতে চেয়েছেন যে, বহু বছর ধরে মৌখিকভাবে এবং অপরিকল্পিতভাবে ছড়িয়ে পড়া লোকগাথা ও উপকথার চেয়ে হাদীসসমূহ তেমন ভিন্ন কিছু নয়। দুর্ভাগ্যবশত আজকের মুসলিমদের অনেকের মাঝেই এই ধরনের একটা ভুল ধারণা রয়েছে বলে দেখতে পাওয়া যায়। একজন সদ্য ধর্মান্তরিত মুসলিমের এমন একটা ধারণা হতে পারে যে, 'হাদীসসমূহ বাইবেলের [নতুন নিয়মের] চেয়ে অধিকতর নির্ভরযোগ্য কোন বিষয় নয়' [অর্থাৎ বাইবেল যেমন অনির্ভরযোগ্য তেমনি হাদীসসমূহও অনির্ভরযোগ্য বা ততটা নির্ভরযোগ্য নয়]।[১৩০]

অনেক হাদীসেই আমরা নবীর (সা.) এমন সচিবগণের কথা জানতে পারি, যারা নবীর (সা.) কাছ থেকে শুনে কুর'আন এবং চিঠিপত্র লিপিবদ্ধ করতেন। **আল-কাত্তানী** বলেন যে, নবীর (সা.) এই ধরনের অন্তত পঞ্চাশজন সচিব ছিলেন। **আল-আজামী**ও এই ক্ষেত্রে গবেষণা করেছেন এবং গবেষণালব্ধ তথ্যসমূহ 'কুতাব-আল নবী' নামক একটি কাজে প্রকাশ করেছেন। এখানে তিনি বলেন যে, তাঁর ৬০ জনেরও বেশী লিপিকার ছিলেন। এছাড়া **ইবন হাজর** ও **ইবন সা'দ** বলে গেছেন যে, **আবদুল্লাহ ইবন সাঈদ ইবন আস, সাদ ইবন আল রাবিঈ,**

---

[১৩০] যারা হাদীসশাস্ত্রকে আক্রমণ করতে চান, এটা হচ্ছে তাদের ব্যবহার করা একটা দুরভিসন্ধিমূলক অভিব্যক্তি। অনেক ধর্মান্তরিত নও মুসলিমই কখনো বাইবেল (নতুন নিয়ম) পড়ে থাকবেন এবং তাই তারা জেনে থাকবেন যে, তা আসলে কত অনির্ভরযোগ্য! তাই এরকম একটা বক্তব্য তৎক্ষণাৎই হাদীসে তাদের বিশ্বাসকে দুর্বল করে দেবে। "হাদীসের লিপিবদ্ধকরণ" হচ্ছে এমন একটা বিষয়, যা নিয়ে ইংরেজী ভাষায় হাদীস সংক্রান্ত সাহিত্যে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। আগ্রহী পাঠকগণ, *Studies in Hadith Methodology and Literature* - by **Mustafa Muhammad Azami** - এই বইখানি পড়ে দেখতে পারেন।

www.pathagar.com

বশীর ইবন সা'দ ইবন সালাবা, আবান ইবন সাঈদ ইবন আল-আস এবং এরকম আরো সাহাবীগণ খোদ মসজিদ নববীর ভিতরই অন্যদের পড়তে এবং লিখতে শিখাতেন। আর স্বভাবতই নবীর (সা.) স্পষ্ট অনুমোদন ও উৎসাহ ছাড়া তাদের পক্ষে এরকম করাটা সম্ভব ছিল না। [১৩১]

হাদীস লিপিবদ্ধকরণ নবীর (সা.) জীবদ্দশায়ই শুরু হয়েছিল। আল-বাগদাদী এমন বেশ কিছু হাদীস নথিভুক্ত করেছেন, যেগুলো থেকে বোঝা যায় যে, নবী (সা.) স্পষ্টতই হাদীস লিখে রাখা অনুমোদন করেছিলেন। নীচে আমরা কিছু উদাহরণ তুলে দিলামঃ

১)আল দারিমী এবং আবু দাউদ তাঁদের সুনানে লিপিবদ্ধ করে গেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন আল-আস (রা.) বলেছেন যে, নবীর (সা.) কাছে তাঁরা যা কিছু শুনতেন তাই লিখে রাখতেন। তাঁদেরকে তা থেকে বিরত রাখতে সাবধান করে বলা হয় যে নবী (সা.) একজন মানুষ ছিলেন, তিনি কখনো রাগ করেছেন আর কখনো সন্তুষ্টও ছিলেন। আবদুল্লাহ (রা.) হাদীস লেখা বন্ধ রাখেন যতক্ষণ না তাঁরা নবীকে (সা.) এই ব্যাপারে জিজ্ঞেস করার সুযোগ পেলেন। এ বিষয়ে আল্লাহ্র রাসূল (সা.) তাঁকে বললেন, ***"(আমার হাদীস) লেখ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ তার শপথ, এ থেকে (নবীর মুখ থেকে) সত্য ছাড়া কিছুই বের হয় না।"*** (সুনান আবি দাউদ) [আলবানীর মতে হাদীসটি সহীহ অর্থাৎ তিনি রাগত অথবা সন্তুষ্ট যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন, সবসময় সত্য কথাটাই বলেছেন]।

---

[১৩১] দেখুনঃ Page#531, Vol.3, *Fath al-Baari bi Sharh Saheeh al-Bukhari* - Ahmad ibn Hajr.

www.pathagar.com

২)সহীহ বুখারীতে লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, **আবু হুরায়রা** (রা.) বলেন, "আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা.) ছাড়া কেউ সাহাবীদের ভিতর এমন আর কাউকে খুঁজে পাবে না, যে আমার চেয়ে বেশী হাদীস বর্ণনা করেছেন, কেননা তিনি হাদীস লিখে রাখতেন কিন্তু আমি তা করিনি।"[১৩২]

৩)বুখারীর বর্ণনায় এসেছে যে, মক্কা বিজয়ের দিনে ইয়েমেন থেকে এক ব্যক্তি নবীর (সা.) কাছে এসেছিল এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল যে, সে নবীর (সা.) বক্তৃতা লিখে রাখতে পারে কিনা এবং নবী (সা.) তাকে অনুমতি দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, ***"অমুকের বাপের জন্য এটা লিখে রাখ।"***

৪)আনাস (রা.) ***'লিখে রেখে জ্ঞান সংগ্রহ কর'*** এই বক্তব্যটি বর্ণনা করেন। এই হাদীসটি বহু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে কিন্তু বেশীর ভাগেরই সনদ দুর্বল। এই বক্তব্য আসলে নবীর (সা.) না কি কোন সাহাবীর তা নিয়েও মতপার্থক্য রয়েছে। কিন্তু আলবানীর মতে আল-হাকিম এবং অন্যান্যরা যেভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তা সহীহ।

আল-আজামী বলেন, *"নবী (সা.) নিজে শত শত চিঠি পাঠিয়েছিলেন। এসবের অনেকগুলোই ছিল দীর্ঘ। যার মাঝে সালাত ও ইবাদতের অনেক দোয়া ইত্যাদি লিখিত ছিল।"*[১৩৩] বাস্তবে এগুলো নবীর (সা.) হাদীস ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। সুতরাং, এই ব্যাপারে প্রশ্নের অবকাশ নেই যে, নবীর (সা.) জীবদ্দশায়ই হাদীসের লিপিবদ্ধকরণ শুরু

---

[১৩২] দেখুন: Page#206-208, Vol.1, *Fath al-Baari bi Sharh Saheeh al-Bukhari* - Ahmad ibn Hajr - যেখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে: কি ভাবে আবু হুরায়রা (রা.), আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা.)-এঁর চেয়ে অনেক বেশী হাদীস বর্ণনা করেছিলেন। আরো একটা বাস্তবতা হচ্ছে এই যে আবু হুরায়রা (রা.), আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা.)-এঁর মৃত্যুর পরে প্রায় ১৬ বছর বেঁচে ছিলেন।

[১৩৩] দেখুন: Page#23, *Studies in Early Hadith Literature* - Mustafa Muhammad Azami.

www.pathagar.com

হয়েছিল। হাদীস লিখে রাখার এই প্রথা নবীর (সা.) মৃত্যুর পর পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। '*Studies in Early Hadith Literature*' বইয়ে আল-আজামী প্রায় পঞ্চাশজন সাহাবীর তালিকা করেছেন। বিশেষ করে তাঁদের সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, যাঁরা হাদীস লিখে রেখেছিলেন।[১৩৪] তিনি বলেন:

"আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা.) (হিজরতের তিন বৎসর পূর্ব থেকে ৬৮ হিজরী.....) জ্ঞান আহরণে এতই উৎসাহী ছিলেন যে, কেবল একটি ঘটনা সম্বন্ধে তিনি তিরিশজন সাহাবীকেও প্রশ্ন করতেন ..... । মনে হয় তিনি যা কিছু শুনতেন, সব লিখে রাখতেন এবং কখনো কখনো, এমনকি তাঁর ক্রীতদাসদের এই কাজে নিয়োজিত করতেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ তাঁর লিখিত সংগ্রহ থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন: আলী ইবন আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস, আমর বিন দিনার, আল-হাকাম বিন মিকসাম, ইবন আবু মুলায়কা, ইকরিমা.....কুরাইব, মুজাহিদ, নাজদা,..... সাঈদ বিন যুবায়ের।[১৩৫]

আবদুল্লাহ্ ইবন উমর ইবন আল খাত্তাব (হিজরী পূর্ব ১০ থেকে ৭৪ হিজরী)। তিনি বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তিনি সে সব হাদীস বর্ণনায় এতই সাবধানী ছিলেন যে, তিনি শব্দসমূহের বিন্যাস পরিবর্তন করা অনুমোদন করতেন না - এমনকি যদি তাতে অর্থের কোন পরিবর্তন নাও হতো। ..... তাঁর কিতাব ছিল। একটা বই ছিল যা মূলত ওমরের (রা.) ছিল এবং সেটা তাঁর মালিকানায় ছিল, যেটা নাফি তাঁকে বহুবার পড়ে শুনিয়েছেন..... । তাঁর কাছ থেকে লিখিত অবস্থায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা হাদীস গ্রহণ করেছিলেন: জামিল বিন যাইদ আল তাঈ, ... ইবন ওমরের ভৃত্য নাফি, সাঈদ বিন যুবায়ের,

---

[১৩৪]দেখুন: Page#34-60, *Studies in Early Hadith Literature* - Mustafa Muhammad Azami.
[১৩৫] দেখুন: Page#40-42, *Studies in Early Hadith Literature* - Mustafa Muhammad Azami.

www.pathagar.com

আবদুল আজিজ বিন মারওয়ান, আবদুল মালেক বিন মারওয়ান, ওবায়দুল্লাহ বিন উমর, উমর বিন ওবায়দুল্লাহ..... ।[১৩৬]

***আনাস বিন মালিক** (জন্ম হিজরী পূর্ব দশম বর্ষ, মৃত্যু ৯৩ হিজরী)। ..... তিনি তাঁর ছেলেদের উপদেশ দিয়েছিলেন নবীর (সা.) হাদীস লিখে রাখতে ও মুখস্থ করতে। তিনি বলতেন, **"যারা লিখে রাখেন না তাদের জ্ঞানকে আমরা মূল্য দিই না।"** এখানে জ্ঞান অর্থ হচ্ছে নবীর (সা.) হাদীসসমূহ। তাঁর বইসমূহ: **হুবায়রাহ বিন আবদাল রহমান** বলেন, **"আনাস বিন মালিক যখন হাদীস বর্ণনা করতেন, তখন অনেক লোক জমায়েত হতো। আর তিনি তাঁর বইগুলি নিয়ে এসে তাদের দিয়ে বলতেন, 'আমি এই সব হাদীসগুলো নবীর (সা.) মুখে শুনেছি, তারপর লিখে রেখেছি এবং তারপর তাঁকে পড়ে শুনিয়েছি'।"** নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ তাঁর লিখিত সংগ্রহ থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন: আবদুল্লাহ বিন দিনার তাঁর কাছ থেকে একটা বড় বই সংগ্রহ করেছিলেন..... ইব্রাহিম বিন হোদবা তাঁর কাছ থেকে একখানি নুসখা কিতাব সংগ্রহ করেছিলেন....... ।"*[১৩৭]

সাহাবীদের মাঝে এক চমকপ্রদ উদাহরণ হচ্ছেন **আবু হুরায়রা** (রা.)। আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন আল আস (রা.) সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য থেকে পরিস্কারভাবে জানা যায় যে, নবীর (সা.) জীবদ্দশায় তিনি হাদীস লিখে রাখেন নি। কিন্তু নিম্নলিখিত বর্ণনা থেকে এটাও স্পষ্ট বোঝা যায় যে, নবীর (সা.) মৃত্যুর পরে তিনি যে সমস্ত হাদীস মানতেন, সেগুলো হয় তিনি নিজে লিপিবদ্ধ করেছিলেন অথবা অন্যদের দিয়ে করিয়েছিলেন। **আমর ইবন উমাইয়া** বলেন, *"আমি আবু হুরায়রার উপস্থিতিতে একটা হাদীস বর্ণনা করলাম এবং তিনি*

---

[১৩৬] দেখুন: Page#45-46, *Studies in Early Hadith Literature* - Mustafa Muhammad Azami.

[১৩৭] দেখুন: Page#49, *Studies in Early Hadith Literature* - Mustafa Muhammad Azami.

www.pathagar.com

সেই হাদীস প্রত্যাখ্যান করলেন। আমি বললাম, 'আমি তো এ হাদীস আপনার কাছ থেকে শুনেছি।' তিনি বললেন, 'তুমি যদি আমার কাছ থেকে ঐ হাদীস শুনে থাক, তবে তা আমার বইগুলির মাঝে লিখিত অবস্থায় পাওয়া যাবে।' তিনি আমার হাত ধরে তাঁর বাসায় নিয়ে গেলেন এবং আমি নবীর (সা.) হাদীসের অনেক বই দেখতে পেলাম। আর (তার একটিতে) আমি সংশ্লিষ্ট হাদীসটি পেয়ে গেলাম।"[১৩৮]

বাশীর ইবন নাহিক বলেন, *"আবু হুরায়রার কাছ থেকে আমি যা শুনতাম, তা লিখে রাখতাম। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় আমি আমার [নোট] বই নিয়ে তাঁর কাছে যেতাম এবং সেটা তাঁকে পড়ে শোনাতাম। আর বলতাম, 'আমি কি আপনার কাছ থেকে এরকম শুনিনি?' এবং তিনি তখন বলতেন, 'হ্যাঁ।' "*[১৩৯] এসব ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর নিজের সংগৃহীত হাদীসের একটা লিখিত সংকলন ছিল এবং অন্যরা তাঁর কাছে হাদীস লিখে নিলেও তিনি বাধা দেননি।

মুস্তাফা আল আজামী 'প্রথম শতাব্দীর উত্তরাধিকারী' শিরোনামে ৪৯ জন এমন ব্যক্তিত্বের প্রত্যেকের চরিত্র নিয়ে গবেষণা করেছেন, যারা হাদীস লিপিবদ্ধ করতেন।[১৪০] এই তালিকার একজন হচ্ছেন **আবিদাহ ইবন আমর আল সালমানী** যার কাছে বহু বই ছিল, কিন্তু এগুলো ব্যবহার করতে গিয়ে কেউ ভুল করতে পারে, এই ভয়ের বশবর্তী হয়ে সেগুলো যেন পুড়িয়ে ফেলা হয় অথবা মুছে ফেলা হয় এমন অসিয়ত

---

[১৩৮] দেখুন: Page#16, Vol.2, *Al-Widha fi al-Hadeeth* - Umar ibn Hasan Uthmaan al-Fullaatah.

[১৩৯] দেখুন: Page#17, Vol.2, *Al-Widha fi al-Hadeeth* - Umar ibn Hasan Uthmaan al-Fullaatah.

[১৪০] দেখুন: Page#60-74, *Studies in Early Hadith Literature* - Mustafa Muhammad Azami.

www.pathagar.com

করে গিয়েছিলেন।[১৪১] এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে যে, তাঁর এই অতি সাবধানতার মূলে কিন্তু নবীর (সা.) কোন নিষেধাজ্ঞা ছিল না, বরং তার গ্রন্থসমূহ থেকে তাঁর হাদীস বর্ণনা করার বেলায় লোকে ভুল করবে, এই ভয়েই কেবল তিনি অমনটা বলে গিয়েছিলেন।

এরপর আল-আজামী 'প্রথম শতাব্দীর শেষ ভাগ ও দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগ জুড়ে যারা ছিলেন, সেইসব স্কলারদের' তালিকায় ৮৭ জনের নাম লিপিবদ্ধ করেছেন, যারা হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন।[১৪২] তারপর তিনি 'দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরুর দিকের স্কলারদের' বর্ণনা করতে গিয়ে ২৫১ জন এমন ব্যক্তির নাম তালিকাভুক্ত করেছেন, যারা হাদীস সংগ্রহ করেছেন ও লিখে রেখেছেন।[১৪৩] এভাবে আল-আজামী ২৫০ হিজরীর আগেই যারা মৃত্যুবরণ করেছেন এমন মোট ৪৩৭ স্কলারের তালিকা দিয়েছেন, যারা হাদীস লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এদের অনেকেই উমর বিন আবদুল 'আযীযের যুগের আগের যুগের ছিলেন – যদিও বলা হয়ে থাকে যে, তিনি ছিলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি হাদীস সংগ্রহের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। **উমর বিন আব্দুল আযীযের** কাহিনীকে আসলে ভুল বোঝা হয়ে থাকে এবং এটা মনে করার কোন কারণ নেই যে, তাঁর আগে কেউ হাদীস সংগ্রহ করেন নি। [বুখারীর বর্ণনায় এসেছে যে, **উমর বিন আবদুল আযীয** (৬১হিঃ–১০১হিঃ) **আবুবকর বিন মোহাম্মদকে** (মৃত্যু ১০০ হিজরী) এক চিঠিতে লেখেন, *"হাদীসের জ্ঞানের সন্ধান কর এবং তা লিখে রাখ, কেননা আমার ভয় হয় দ্বীনের জ্ঞান হারিয়ে যাবে এবং দ্বীনের জ্ঞানে জ্ঞানী ব্যক্তিগণও শেষ হয়ে যাবেন। নবীর (সা.) হাদীস ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করো না।"* তিনি

---

[১৪১] দেখুন: Page#62, *Studies in Early Hadith Literature* - Mustafa Muhammad Azami.

[১৪২] দেখুন: Page#74-106, *Studies in Early Hadith Literature* - Mustafa Muhammad Azami.

[১৪৩] দেখুন: Page#106-182, *Studies in Early Hadith Literature* - Mustafa Muhammad Azami.

www.pathagar.com

সা'দ ইবন ইবরাহিম এবং আল-জুহরীকে একই কথা বলে চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলেন। কেউ কেউ, যেমন এম, জেড, সিদ্দিকী এই ব্যাপারে ভুল ধারণা নিয়ে বলেছেন যে, উমর বিন আবদুল আযীযের এই অনুরোধ থেকেই হাদীস সংগ্রহের সূচনা হয়েছে।)

আজামীকে উদ্ধৃত করে বলতে গেলে বলতে হয় ***"সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে নবীর (সা.) প্রায় সকল হাদীসই সাহাবীদের জীবদ্দশায় লিখে ফেলা হয়েছে, যা হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত।"***[১৪৪] এই শেষ বক্তব্যটি আংশিকভাবে আজামীর নিজের গবেষণার উপর প্রতিষ্ঠিত - যেখানে তিনি অনেক সাহাবী ও তাবেঈনদের কথা উল্লেখ করেছেন, যাদের কাছে লিখিত অবস্থায় হাদীস সংরক্ষিত ছিল। তাঁর লেখার অন্যত্র তিনি বলেছেন, *"আমার পি.এইচ.ডি. থিসিস: 'Studies in Early Hadith Literature' - এ আমি এ ব্যাপারটা প্রতিষ্ঠা করেছি যে, এমনকি হিজরী প্রথম শতাব্দীতেও হাদীসের শত শত পুস্তিকা ব্যবহৃত হচ্ছিল। আমরা যদি আরো একটি শতাব্দী ধর্তব্যে আনি, তবে ব্যবহৃত পুস্তিকা ও পুস্তকের সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। এমনকি বেশ কাটছাঁট করে আন্দাজ করতে চাইলেও সেগুলোর সংখ্যা বেশ কয়েক হাজারে এসে দাঁড়াবে।"*[১৪৫]

কিন্তু কথা হচ্ছে আজামী যেমনটা তাঁর পি.এইচ.ডি. থিসিসে দেখিয়েছেন, হাদীসের যদি এমন বহু নথি ও সংগ্রহ থেকে থাকে, তবে সেগুলোর কেবল অল্প কিছুকেই আজকের দিনেও পাওয়া যায় কেন - এমন প্রশ্ন কারো মনে জাগতেই পারে। এই শুরুর দিকের কাজগুলোর কি পরিণতি হয়েছিল সে সম্বন্ধে আল-আজামী নিজেই আলোচনা

---

[১৪৪] দেখুন: Page#30, *Studies in Hadith Methodology and Literature* - Mustafa Muhammad Azami.

[১৪৫] দেখুন: Page#64, *Studies in Hadith Methodology and Literature* - Mustafa Muhammad Azami.

www.pathagar.com

করেছেন। তিনি লিখেছেন, *"এই বইগুলো নষ্ট করে ফেলা হয়নি বা সেগুলো নষ্টও হয়ে যায়নি বরং পরবর্তী সময়ের স্কলারদের কাজে সেগুলোর আত্মীকরণ ঘটেছে। যখন এনসাইক্লোপিডিয়া শ্রেণীর কিতাবসমূহ সংকলিত হয়েছে, তখন স্কলাররা আর প্রথম যুগের পুস্তক বা পুস্তিকাগুলো সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নি। আর তাই ধীরে ধীরে সেগুলো হারিয়ে গেছে।"*[১৪৬]

প্রথম যুগের কাজগুলোর ভেতর একটা সুনির্দিষ্ট কাজ আমাদের মনোযোগী পর্যবেক্ষণের দাবী রাখে। সেটা হচ্ছে **হাম্মাম ইবন মুনাব্বিহের** সহীফা। এটা হচ্ছে আসলে হাদীসের এক লিখিত সংগ্রহ যা সাহাবী **আবু হুরায়রা** (রা.) তাঁর ছাত্র হাম্মামের কাছে লিখে রাখার জন্য বর্ণনা করেছিলেন।[১৪৭] যেহেতু **আবু হুরায়রা** (রা.) ৫৮ হিজরীর দিকে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, সেহেতু হাম্মামের কাছে এই সংগ্রহ তার পূর্বেই নিশ্চয়ই বর্ণনা করা হয়েছিল। এরপর ঐ সহীফা কিভাবে হস্তান্তরিত হয়েছিল, তা জানতে চাইলে দেখা যায় যে, হাম্মাম[১৪৮] (মৃত্যু ১০১ হিজরী) তাঁর ছাত্র মামারকে (মৃত্যু ১১৩ হিজরী) সেটা পড়ে শুনিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে **হামিদুল্লাহ** লেখেন, "নিশ্চয়ই অনেকেই সহীফা থেকে শিক্ষা লাভ করে থাকবেন। সৌভাগ্যবশত তাঁর (হাম্মাম) শিষ্যদের ভিতর **মামার ইবন রাশিদের** মত একজন ব্যতিক্রমী ও উৎসাহী মানুষ ছিলেন, যিনি কিনা কোন যোগ-বিয়োগ ছাড়াই সেটা তাঁর ছাত্রদের কাছে পৌঁছে দিয়ে গেছেন। মামারও এ ব্যাপারে সৌভাগ্যবান ছিলেন যে, তাঁরও এমন একজন বিশ্ববিখ্যাত শিষ্য ছিলেন যিনি বিদ্যাশিক্ষার ব্যাপারে নিজেকে অন্যদের চেয়ে স্পষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব দান করতে পেরেছিলেন, যাঁর নাম হচ্ছে **আবদুর রাজ্জাক ইবন**

---

[১৪৬] দেখুন: Page#75, *Studies in Hadith Methodology and Literature* - Mustafa Muhammad Azami.

[১৪৭] দেখুন: *Sahifah Hammam ibn Munabbih* - Muhammad Hamidullah.

[১৪৮] দেখুন: Page#62, *Sahifah Hammam ibn Munabbih* - Muhammad Hamidullah.

www.pathagar.com

হাম্মাম.....। তাঁর শিক্ষক মামারের মতই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, হাম্মামের সহীফাকে তিনি তাঁর নিজের কাজে মিশিয়ে ফেলবেন না, বরং সেটাকে অক্ষুণ্ণ অবস্থায় সংরক্ষণ করবেন এবং একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ কাজ হিসাবে – তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের কাছে হস্তান্তর করে যাবেন। তাঁর ছাত্রদের ভিতর দুইজন পরবর্তীতে বিখ্যাত হাদীসবিদে পরিণত হন যাঁর একজন হচ্ছেন **আহমাদ ইবন হাম্বল** এবং অপরজন হচ্ছেন **আবদুল হাসান আহমাদ ইবন ইউসুফ আল সুলায়মী**।"[১৪৯]

দু'টি হাদীস ছাড়া, আহমাদ তাঁর মুসনাদে এই গোটা কাজটিকে (অর্থাৎ, "সহীফা"কে) অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অপরদিকে আল সুলায়মী এই সংগ্রহকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কাজ হিসেবেই হস্তান্তর করা জারী রেখেছিলেন। নবম শতাব্দী পর্যন্ত এভাবেই তা পর্যায়ক্রমে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে হস্তান্তরিত হয়ে আসছিল, যখন বার্লিন পান্ডুলিপি লিখিত হয়েছিল – যা কিনা ঐ কাজের চারটি পান্ডুলিপির একটি যা এখনও বর্তমান। যেহেতু আহমাদের মুসনাদের হাদীসগুলো হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবী-বিন্যাস অনুযায়ী লিপিবদ্ধ রয়েছে, সেহেতু এই সংগ্রহের ভিতরে হাম্মামের কাছ থেকে পাওয়া আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসগুলো খুব সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। অন্যান্য পুস্তকাদি যেখানে ফিকহের বিষয়বস্তু ভিত্তিক হাদীস বিন্যাস রয়েছে, সেখানেও সহীফা অনেকাংশেই স্থান পেয়েছে। সহীহ আল-বুখারী এবং সহীহ আল মুসলিম পর্যবেক্ষণ করলে নিম্নলিখিত তথ্যগুলো পাওয়া যায়। হাম্মামের সহীফার ১৩৭টি হাদীসের ভিতর ২৯টি এমন হাদীস রয়েছে যেগুলো বুখারী ও মুসলিম দুটিতেই লিপিবদ্ধ রয়েছে। অন্য ২২টি হাদীস রয়েছে যেগুলো কেবল সহীহ আল-বুখারীতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। অপর ৪৮টি হাদীস রয়েছে যেগুলো কেবল সহীহ আল-মুসলিমে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

---

[১৪৯] দেখুন: Page#66-67, *Sahifah Hammam ibn Munabbih* - Muhammad Hamidullah.

www.pathagar.com

এভাবেই সহীফার ১৩৭টি হাদীসের ৯৯টি হয় সহীহ্ বুখারী অথবা সহীহ্ মুসলিমের ভিতর পাওয়া যাবে। উপরন্তু **হামিদুল্লাহ্** যেমন বলেন, *"ইমাম মুসলিমের ব্যাপারে বলতে গেলে বলতে হয় যে, তিনি এই হাদীসগুলিকে (সহীফার হাদীস) সাধারণভাবে এভাবে বর্ণনা করেন: হাম্মাম ইবন মুনাব্বিহের উদ্ধৃতিতে মামার আমাদের কাছে হাদীসগুলো এভাবে বর্ণনা করেছেন: "এই হাদীসগুলো আল্লাহ্‌র রাসূলের (সা.) কাছ থেকে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন আবু হুরায়রা (রা.) – এবং তিনি বেশ কিছু হাদীস বর্ণনা করেছেন যার একটি হচ্ছে এটা – আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেন ..... ।"*[১৫০]

এখানে খেয়াল করার বিষয় হচ্ছে এই যে, নীচের কাজগুলোর সবকটিতেই, সবগুলো না হলেও এই সহীফার বহু হাদীস স্থান পেয়েছে: **আল-বুখারীর** আল-জামি আল-সহীহ, **মুসলিমের** সহীহ, **আহমাদের** মুসনাদ, **আবদুর রাজ্জাকের** মুসান্নাফ, **মামারের** জামি এবং এমনকি **হাম্মামের** সহীফা [অর্থাৎ এই সমস্ত প্রকাশিত গ্রন্থে আদি সহীফার হাদীসগুলোর অনেক কটিই ছাপা হয়েছে]। এই সকল সংগ্রহগুলো পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে, হাদীসগুলোর অর্থ – আসলে এগুলোর শব্দাবলীও - আবু হুরায়রার (রা.) সময় থেকে নিয়ে আল-বুখারীর সময়কাল পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়নি। **হামিদুল্লাহ** মন্তব্য করেন,

"ধরা যাক আল-বুখারী উপরোক্ত ইসনাদ (আহমাদ, আব্দুর রাজ্জাক, মামার, হাম্মাম, আবু হুরায়রা) সহকারে একটা হাদীস বর্ণনা করলেন। যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ববর্তী বর্ণনাকারীদের এই যোগসূত্র বা ইসনাদ পাওয়া না যেতো, ততক্ষণ পর্যন্ত একজন সংশয়বাদীর এই সন্দেহ পোষণ করার ও প্রকাশ করার অধিকার থাকতো যে, আল-বুখারী সম্ভবত সত্য বলেননি - বরং হয় সূত্র অথবা বক্তব্য অথবা দুটোই নিজেই বানিয়ে

---

১৫০ দেখুন: Page#79, *Sahifah Hammam ibn Munabbih* - Muhammad Hamidullah.

www.pathagar.com

নিয়েছেন। কিন্তু এখন যেহেতু পূর্ববর্তী সকল সূত্রই আমাদের জানা আছে, সেহেতু আল বুখারী নিজে বানিয়ে কিছু লিখেছেন এমনটা কল্পনা করার সম্ভাবনা নেই অথবা জালকারীদের কাছ থেকে শুনে কোন কিছু বর্ণনা করছেন সেটা কল্পনা করারও কোন অবকাশ নেই। ... সাম্প্রতিক সময়ে এই পূর্ববর্তী কাজগুলো আবিষ্কার হওয়াতে এগুলোর প্রত্যেকটির সত্যতা যাচাই করা এখন আমাদের পক্ষে সম্ভব। এগুলো যে সবই বিশুদ্ধ সেটা স্বীকার করতে এখন যে কেউ বাধ্য।"[১৫১]

আহমাদ যেভাবে এই হাদীসগুলোকে লিপিবদ্ধ করেছেন, সেটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এবং মনোযোগ আকর্ষণকারী। মুসনাদে তিনি সহীফার হাদীসগুলো, সহীফায় যেভাবে পাওয়া যায় প্রায় সেই ক্রমবিন্যাসে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর মুসনাদে এমন কেবল একটি হাদীস পাওয়া যায় যা সহীফার পান্ডুলিপিগুলোতে নেই এবং সেখানে এমন দুটো হাদীস অনুপস্থিত যেগুলো সহীফার পান্ডুলিপিগুলোতে পাওয়া যায়।

হামিদুল্লাহ্ উপসংহারে বলেন:

"তেরশত বৎসরের বেশী পার হয়ে গেলেও, এই সংগ্রহের লিখিত বক্তব্যে কোন পরিবর্তন ঘটেনি।... এই হাদীসগুলো কেবল আবু হুরায়রা (রা.) থেকেই বর্ণিত হয়নি, বরং তাঁর সাথে সম্পর্ক নেই এমন সূত্রে নবীর (সা.) অন্যান্য সাহাবীগণ কর্তৃকও বর্ণিত হয়েছে। এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই যোগসূত্র বা ইসনাদগুলো আলাদা। .... একঘেঁয়ে লাগবে এমন সম্ভাবনা না থাকলে, আমরা বিস্তারিত বর্ণনাসহ দেখিয়ে দিতে পারতাম যে, আবূ হুরায়রা (রা.) ছাড়াও, হাম্মামের সহীফায় সংগৃহীত প্রতিটি হাদীসই কিভাবে অন্যান্য সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। .... এই হাদীসগুলো কিছুতেই তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীতে

[১৫১] দেখুন: Page#80-81, *Sahifah Hammam ibn Munabbih* - Muhammad Hamidullah.

www.pathagar.com

জাল করা সম্ভব হতো না।"[১৫২]

প্রথম বছরগুলোর ইসনাদ

হাদীস সংরক্ষণের ব্যাপারে মুসলিম জাতি আরেকটি অদ্বিতীয় কৌশল উদ্ভাবন করেছিল, যেটা ছিল ***ইসনাদ*** **পদ্ধতি**। ইসনাদ পদ্ধতি হচ্ছে এমন একটা পদ্ধতি, যেখানে যে কেউ তার তথ্যের উৎসসমূহ উল্লেখ করে। এবং সেই উৎস - সূত্র ধরে পিছনে যেতে যেতে সেই তথ্যের বর্ণনা নবী (সা.) পর্যন্ত পৌঁছে।

ইসনাদের গুরুত্ব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে **আবদুল্লাহ ইবন মুবারক** খুব সুন্দর এক বর্ণনায় বলেন, ***"ইসনাদ হচ্ছে দ্বীনের এক অংশ। ইসনাদ পদ্ধতি না থাকলে যে কেউ তার যা খুশী তাই বলতে পারতো।"*** বাস্তবে সহীহ হাদীসকে দুর্বল হাদীস থেকে পৃথক করতে এবং জাল হাদীস সনাক্ত করতে ইসনাদ পদ্ধতি অত্যাবশ্যক। এমনকি আজও কারো একটা হাদীস বর্ণনা করতে সাহস হবে না – ঐ হাদীসের সূত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবার সম্ভাবনা এড়িয়ে। **ইবন আল মুবারক** তাঁর বর্ণনায় এরপর আবার বলেন, *"আপনি যদি ব্যক্তিটিকে জিজ্ঞাসা করেন যে, হাদীসটিকে কোথায় পেয়েছে, তবে সে চুপ করে যেতে বাধ্য হবে।"* হাদীসের শুদ্ধতার জন্য ইসনাদ এক গ্যারান্টি অথবা নিরাপত্তা হিসেবে কাজ করেছে এবং এখনও করে থাকে। প্রথম যুগের হাদীস স্কলারগণ কোন জানা ইসনাদ না থাকলে, একটি হাদীসকে গ্রাহ্যই করতেন না।

ইসনাদের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে **সুফিয়ান আস সাওরী** (মৃত্যু ১৬১ হিজরী) বলেন, *"বিশ্বাসীর জন্য ইসনাদ হচ্ছে তার তরবারী। তার সাথে যদি তার তরবারী না থাকে তবে সে কী দিয়ে যুদ্ধ করবে?"*

---

[১৫২] দেখুন: Page#87, *Sahifah Hammam ibn Munabbih* - Muhammad Hamidullah.

www.pathagar.com

ইসনাদ ব্যবহার করে মুসলিম স্কলারগণ ঐসব নব্য উদ্ভাবনকে নির্মূল করতে সক্ষম হয়েছিলেন - নানা লোকে ইসলামে যেগুলোকে সংযোজন করার চেষ্টা করছিল। **মুহাম্মাদ ইবন সীরীন** (মৃত্যু ১১০ হিজরী), **আনাস ইবন সীরীন, আল দুহাক** এবং **উকবা ইবন নাফি** সকলেই এমনটা বলেছেন বলে জানা যায় যে *"(হাদীসের) জ্ঞান হচ্ছে দ্বীন, সুতরাং খোঁজ করে দেখ তুমি কার কাছ থেকে তোমার দ্বীন গ্রহণ করছো।"*[১৫৩] সুন্নাহ্ যেহেতু ইসলামের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাই কারো কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করাটা কারো কাছ থেকে নিজের দ্বীন গ্রহণ করার সমতুল্য। আর তাই যে কারো উচিত, এই ব্যাপারে সাবধান হওয়া যে, সে যেন কেবল এ ব্যাপারে বিশ্বাসযোগ্য লোকদের কাছ থেকেই তার দ্বীন গ্রহণ করে। যাদের সূত্র ধরে তারা যা বলছেন, তা নবী (সা.) পর্যন্ত যাবে। এবং সেটা কেবল ইসনাদ পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমেই সম্ভব। এমনকি আমাদের এই যুগের প্রকাশনা ও স্বত্বাধিকারের চেয়ে ইসনাদ পদ্ধতি অধিকতর নিরাপত্তা বিধানকারী ছিল। **হামিদুল্লাহ্** বলেন,

"বর্তমান যুগের পন্ডিতগণ বড় বড় কাজগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করতে গিয়ে সূত্র উল্লেখ করে থাকেন। কিন্তু সবচেয়ে সতর্কতা সহকারে লিপিবদ্ধ কাজগুলোতেও দুটো দুর্বলতা থেকে যায়:

***ক>** মুদ্রিত কাজগুলোতে ছাপার ভুল বা অন্যান্য অশুদ্ধতা রয়েছে কিনা সেটা তলিয়ে দেখার সম্ভাবনা খুবই কম বা নাই বললেও চলে। কেউ যদি কোন একটা কাজের উপর নির্ভর করতে গিয়ে সরাসরি লেখকের কাছ থেকে শোনার পর অথবা তার দ্বারা সত্যায়িত একটা পান্ডুলিপি পাবার পরই কেবল সেই কাজের উপর নির্ভর করতো, তাহলে (ভুলের সম্ভাবনা কমে যেতো) তেমন হতো না; অথবা পুরানো কাজগুলোর*

---

[১৫৩] দেখুন: Page#10, Vol.2, *Al-Widha fi al-Hadeeth* - Umar ibn Hasan Uthmaan al-Fullaatah.

www.pathagar.com

ব্যাপারে বলা যায়, যদি কেউ বর্ণনাকারীর কাছ থেকে শোনার সুযোগ পেতেন অথবা তার কর্তৃক নির্বাচিত বর্ণনাকারীর কাছে শুনতেন।

খ> আজকাল দেখা যায় যে, কেউ তার নিজের পূর্ববর্তী উৎস বা সূত্র নিয়েই সন্তুষ্ট। সেই উৎসের পূর্ববর্তী উৎসসমূহ নিয়ে তারা তেমন ভাবিত নয়। এবং একটা ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী পর্যন্ত যাওয়ার প্রচেষ্টায় আগ্রহী নয়। হাদীসের কাজের বেলায় ব্যাপারটা একদমই ভিন্ন.. ।"[১৫৪]

উপসংহারে আমরা বলতে পারি যে, প্রত্যেকটি হাদীসের জন্যই ইসনাদ হচ্ছে এক অপরিহার্য অংশ। কেননা তা ছাড়া কারো পক্ষেই একটি বর্ণনার সত্যতা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। **আবদুল্লাহ্ ইবন মুবারক** নিশ্চিতভাবেই সত্য বলেছেন, যখন তিনি বলেন যে, ইসনাদের ব্যাপার না থাকলে যে কেউই যা ইচ্ছা তাই বলতে পারতো এবং দাবী করতে পারতো যে সেটাই দ্বীন ইসলামের একটা অংশ [১৫৫]। ইসনাদের গুরুত্ব বাস্তবে তাই অত্যন্ত স্পষ্ট। এবং খুব সামান্য সংখ্যক মানুষই এর গুরুত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, এই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করা যে, ইসনাদ পদ্ধতি ঠিক কখন শুরু হয়েছিল। কেননা যদি তা নবীর মৃত্যুর অনেক পরে শুরু হয়ে থাকে, তবে স্বাভাবিকভাবেই তা অর্থহীন বলে গণ্য হয়।

---

[১৫৪] দেখুন: Page#83, *Sahifah Hammam ibn Munabbih* - Muhammad Hamidullah.

[১৫৫] এখানে যে কারো মনে **সেইন্ট পল** এবং অনেক খৃস্টান বিশ্বাসের উৎসের কথা উদিত হবে। **পল** অবশ্য কখনোই ঈসা (আ.)-কে দেখেননি। তিনি যে শিক্ষা দিয়েছিলেন সেগুলোর সূত্র ঈসা (আ.) পর্যন্ত পৌঁছায় না এবং বাস্তবে তিনি ঈসা (আ.)-এঁর এমন অনেক সঙ্গী-সাথীদের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন, যারা জানতেন তিনি কি বলে গেছেন। দুর্ভাগ্যবশত, ঐতিহাসিক শুদ্ধতা এবং কোন শিক্ষার সূত্র ধরে তা খতিয়ে দেখতে মূল শিক্ষক ঈসা (আ.) পর্যন্ত পৌঁছানোর প্রচেষ্টা হচ্ছে এমন একটা ব্যাপার, যা কখনো খৃস্টান চিন্তাধারায় বিকাশ লাভ করেনি। আর তাই তাদের ধর্ম ঈসা (আ.) যা শিক্ষা দিয়ে গিয়েছিলেন, তা থেকে বিকৃত হয়ে অনেক দূরে সরে গিয়েছে।

www.pathagar.com

সঠিক ইসনাদ পদ্ধতির ব্যাপারে মূলত তিনটি মত রয়েছে। প্রত্যেকটি মতই নিচে আলোচনা করা হলো - যার শেষে **ফুল্লাতাহ্‌র** সারমর্ম ও উপসংহার থাকবে।

১)**প্রথম** মতটি হচ্ছে ইসনাদ পদ্ধতির ব্যবহার শুরু হয় ফিতনার পর থেকে (প্রথম গৃহযুদ্ধের পর থেকে)। এই মতের প্রমাণ হিসেবে **ইবন সীরীন** এর বক্তব্য উঠে আসে, যেখানে তিনি বলেছিলেন, *"তারা ইসনাদ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতেন না, কিন্তু যখন ফিতনা সংঘটিত হলো তখন লোকেরা বলতেন, '(হাদীস সম্পর্কে) তোমার দলিল উল্লেখ কর।' এবং তারা সুন্নাহ্‌র উপর প্রতিষ্ঠিত লোকদের খোঁজ করতেন এবং তাদের হাদীস গ্রহণ করতেন। এবং তারা বিদ'আতী লোকদের খোঁজখবর করতেন এবং তাদের হাদীস প্রত্যাখ্যান করতেন।"* **ড. আকরাম জিয়া আল উমরী** বলেন যে, এটা বের করা সহজ নয় যে, **ইবন সীরীন** ঠিক কোন ফিতনাটার কথা বলেছিলেন, কেননা তার বক্তব্য যে কোন যুদ্ধ, গন্ডগোল অথবা বিপর্যয়ের ব্যাপারে প্রয়োগ করা যেতে পারে। যদিও খুব সম্ভাব্য ব্যাপার হচ্ছে এই যে, খুব সম্ভবত উসমানের (রা.) মৃত্যুর কথা সেখানে বলা হয়েছে, কেননা **ইবন সীরীন** ঐ সময়ের কথা বলছিলেন, যখন ইসনাদের ব্যবহার শুরু হয়েছিল। এবং এই ব্যাখ্যা বাহ্যিক প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত। উপরন্তু সেটাই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বজনবিদিত ফিতনা এবং কোন শ্রোতার মনে শব্দটি শোনা মাত্র সেটার কথাই মনে আসবে। সুতরাং এই প্রথম মত বলছে যে, ইসনাদ পদ্ধতি শুরু হয়েছিল ফিতনার পরে - যা দিয়ে সম্ভবত উসমানের মৃত্যুর পরের কথা বোঝানো হচ্ছে।

২)**দ্বিতীয়** মত অনুযায়ী ইসনাদ পদ্ধতির ব্যবহার শুরু হয়েছিল **আল যুহরীর** সময় (প্রথম শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে)। এই মতের পক্ষে প্রমাণ হিসেবে আসে **ইমাম মালিকের** ঐ বক্তব্য, যেখানে তিনি বলেছিলেন যে, **আল যুহরীই** ছিলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি হাদীসের

www.pathagar.com

ব্যাপারে ইসনাদ ব্যবহার করেছেন।[১৫৬] (এখানে বলা আবশ্যক যে সাহাবীদের সময়কালটা হিজরী প্রথম শতাব্দী পেরিয়ে অল্প কিছু সময়কাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।) সুতরাং আল যুহরীর সময় পর্যন্ত (যিনি ১২৪ হিজরীতে মারা যান) কিছু সাহাবী বেঁচে ছিলেন।

৩)**তৃতীয়** মতের উৎপত্তি হয় **ইয়াহিয়া ইবন সাঈদ আল কাত্তান** এর একটি বক্তব্য থেকে। তিনি বলেছিলেন যে, **আমর আল শা'বী** (১৭-১০৩ হিজরী) ছিলেন ইসনাদ পরীক্ষাকারী প্রথম ব্যক্তি। **আর- রাবিঈ** তাকে একটি হাদীস পড়ে শুনিয়েছিলেন এবং **আমর আল শা'বী** তাকে বলেন, *"তোমার কাছে এটা কে বর্ণনা করেছে?"* তিনি উত্তর দেন, *"আমর ইবন মায়মুন।"* এবং তিনি আমরকে জিজ্ঞাসা করেন, *"তোমার কাছে এটা কে বর্ণনা করেছে?"* তিনি উত্তর দেন, *"নবীর (সা.) সাহাবী আবু আইয়ুব (রা.)।"*[১৫৭] লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে এই যে এই ঘটনা (এবং আয যুহরী সম্পর্কে উদ্ধৃত বক্তব্য) এই ব্যাখ্যাকে অতিরিক্ত সমর্থন যোগায় যেখানে বলা হয়েছে যে, ইবন সীরীনের বক্তব্যে ফিতনা বলতে সম্ভবত উসমানের কথা বলা হয়েছে।

ফুল্লাতাহ্ তার পি.এইচ.ডি থিসিসে ইসনাদের ব্যবহারের সূচনা ঠিক কখন হয়েছিল, সে ব্যাপারটা আবিষ্কার করতে চেয়ে বিভিন্ন মতের পরীক্ষা-নিরীক্ষার এক চমৎকার কার্য সম্পাদন করেছেন। তিনি বলেন যে, ইসনাদের প্রসঙ্গটিকে তিনটি ভিন্ন প্রশ্নে বিভক্ত করা উচিত:

ক) প্রথম কখন ইসনাদের ব্যবহার শুরু হয়েছিল?

খ) শ্রোতারা কখন বর্ণনাকারীদের ইসনাদ উল্লেখ করতে বাধ্য করা শুরু করেছিলেন?

---

[১৫৬] দেখুন: Page#49-50, *Buhooth fi Tareekh al-Sunnah al-Musharriifah* - Akram Dhiyaa Al-Umari.
[১৫৭] দেখুন: Page#48, *Buhooth fi Tareekh al-Sunnah al-Musharriifah* - Akram Dhiyaa Al-Umari.

www.pathagar.com

গ) কখন বর্ণনাকারীরা নিজেরাই প্রতিটি হাদীসের ইসনাদ উল্লেখ করার ব্যাপার এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন?

ক) সম্বন্ধে বলতে গিয়ে, অর্থাৎ কখন ইসনাদের ব্যবহার প্রথম শুরু হয়েছিল, সে সম্বন্ধে বলতে গিয়ে, তিনি বলেছিলেন যে, স্বাভাবিকভাবেই সাহাবীরা ইসনাদ ব্যবহার করতেন। কিন্তু তাঁদের আর রাসূলের (সা.) মাঝে যেহেতু কোন মধ্যবর্তী ব্যক্তিত্ব থাকতেন না, সেহেতু তাঁরা যে ইসনাদ ব্যবহার করতেন, তা স্পষ্ট বোঝা যেত না। সাহাবীরা যেভাবে হাদীস বর্ণনা করতেন, তাতে এটা পরিস্কার হয়ে যেতো যে, হয় তাঁরা হাদীসটিকে সরাসরি নবীর (সা.) কাছ থেকে শুনেছেন, অথবা তাঁদের বর্ণনায় এটা পরিস্কার হয়ে যেতো যে, তাঁরা ঐ নির্দিষ্ট হাদীসটি সরাসরি নবীর (সা.) কাছ থেকে শোনেন নি। **আনাস বিন মালিক** (রা.) এবং **ইবন আব্বাসের** (রা.) মত, এমন অনেক স্বল্প বয়সী সাহাবীগণ যেসব হাদীস বর্ণনা করেছেন, তা তাঁরা সরাসরি নবীর (সা.) কাছ থেকে শোনেননি, বরং তাঁরা সেগুলো অপর কোন সাহাবীর মুখে শুনেছেন, যিনি সরাসরি নবীর (সা.) কাছ থেকে শুনেছেন। **ফুল্লাতাহ্** অবশ্য এ প্রসঙ্গে বলেন,

"তার অর্থ এই নয় যে, সাহাবীগণ অথবা তাবেয়ীগণ প্রত্যেকবার যখন কিছু বর্ণনা করেছেন, তখনই তার সাথে ইসনাদ জুড়ে দিয়েছেন এবং পরিস্কারভাবে তারা কিভাবে হাদীস শুনেছিলেন তা উল্লেখ করেছেন। তাদের কেউ কেউ নবীর (সা.) কাছ থেকে আসা হাদীস বর্ণনা করেছেন, যদিও তারা সেটা সরাসরি নবীর (সা.) কাছ থেকে শোনেননি।"[১৫৮]

ফুল্লাতাহ্ তারপরে **আনাসের** উদ্ধৃতি দেন যেখানে তিনি বলেন, *"আমরা রাসূল (সা.)-এঁর কাছ থেকে আসা যা কিছু তোমাদেরকে বলি তার প্রত্যেকটিই যে আমরা তাঁর কাছ থেকে সরাসরি শুনেছি এমন*

---

[১৫৮] দেখুন: Page#15, Vol.2, *Al-Widha fi al-Hadeeth* - Umar ibn Hasan Uthmaan al-Fullaatah.

www.pathagar.com

নয়। বরং আমাদের সাহাবীরা সেগুলো আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। এবং আমরা এমন ব্যক্তিবর্গ যারা একে অপরের ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলে না।”[১৫৯] তিনি বলেন যে, সাহাবীদের বেশীর ভাগ হাদীসই ছিল এমন যা তারা সরাসরি আল্লাহ্‌র রাসূলের (সা.) কাছ থেকে শুনেছিলেন। সুতরাং ইসনাদ পদ্ধতির প্রথম ব্যবহার ছিল সাহাবীদের সময় – যদিও এটা বলা যেতে পারে যে, সেটা সম্বন্ধে হয়তো তারা সচেতন ছিলেন না। **আল যুহরী** সম্বন্ধে মালিকের বক্তব্যের প্রসঙ্গে **আল উমরী** লেখেন,

“এর অর্থ এই নয় যে, যুহরীর পূর্বে ইসনাদের অস্তিত্ব ছিল না। বাস্তবে সাহাবীদের জীবদ্দশায়ই লোকে ইসনাদ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতে শুরু করেছিলো এবং সেই জিজ্ঞাসা মুখ্য তাবেয়ীদের পর্যন্ত জারী ছিল। কিন্তু আল যুহরীর সময়ে, লোকে ইসনাদ উল্লেখ করার ব্যাপারে ব্যাপক গুরুত্ব আরোপ করতে শুরু করেছিল।”[১৬০]

এবার **খ)** এর প্রসঙ্গে আসা যাক, যখন শ্রোতাগণ বর্ণনাকারীদের ইসনাদ উল্লেখ করতে বাধ্য করতে শুরু করেছিলেন – **ফুল্লাতাহ্‌** উল্লেখ করেন যে, **আবু বকর** (রা.) ছিলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি বর্ণনাকারীকে তার বর্ণনার নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণ করতে বাধ্য করেছিলেন, কেননা কখনো কখনো তিনি, কেউ একটা হাদীস উপস্থাপন করলে, সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া সেই হাদীস গ্রহণ করতে চাইতেন না। উমরও (রা.) একই রকম করতেন। এটা করে তাঁরা এ ব্যাপারটা পরিষ্কার করে নিতে চাইতেন যে, বর্ণনাকারী ব্যক্তি সরাসরি রাসূল (সা.)-এঁর কাছ থেকে হাদীসটি শুনেছেন কিনা, নাকি কোন মধ্যবর্তী ব্যক্তির মাধ্যমে বর্ণনাটি তার কাছে এসেছে। তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল কোন একটি

---

[১৫৯] দেখুনঃ Page#18, Vol.2, *Al-Widha fi al-Hadeeth* - Umar ibn Hasan Uthmaan al-Fullaatah.

[১৬০] দেখুনঃ Page#49, *Buhooth fi Tareekh al-Sunnah al-Musharriifah* - Akram Dhiyaa Al-Umari.

www.pathagar.com

বর্ণনা সঠিক বা শুদ্ধ কিনা সেটা নিশ্চিত করা, যদিও তা করতে গিয়ে না চাইলেও তাঁরা বর্ণনাকারীকে তার হাদীসের ইসনাদ সম্বন্ধেই জিজ্ঞাসা করছিলেন। সুতরাং তাঁদের সময়টাতেই [নবীর (সা.) মৃত্যুর ঠিক পর পর – আবু বকর (রা.) ও ওমরের (রা.) সময়টাতে] বর্ণনাকারীদের ইসনাদ উল্লেখ করার চাপ প্রয়োগের প্রথম সূচনা হয়েছিল। চতুর্থ খলিফা, অর্থাৎ ফিতনার সময়কার খলিফা **আলী** (রা.) কখনো কখনো কোন বর্ণনাকারী ব্যক্তিকে এ ব্যাপরে হলফ করতে বাধ্য করতেন যে, সে বর্ণিত হাদীসটি, নিজে সরাসরি নবীর (সা.) কাছ থেকে শুনেছে। স্পষ্টতই তার পরে বর্ণনাকারীর জন্য ইসনাদ উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারটা অব্যাহতভাবে চলতে থাকে।[১৬১]

ইবন সীরীন-এঁর বক্তব্য থেকে আমরা যা বুঝি সেটা হচ্ছে এই যে, ফিতনার পর থেকে হাদীসের ব্যাপারে আগ্রহী যে কারোর জন্য ইসনাদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করাটা নিয়মিত প্রথায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু তার বক্তব্য - ফিতনার আগেই আবু বকর (রা.) এবং ওমরের (রা.) খেলাফতের সময়টায় ইসনাদ ব্যবহারের যে দৃষ্টান্তের কথা আমরা উপরে উল্লেখ করেছি - কোনভাবেই সেটার বিরোধিতা করে না।

গ) অর্থাৎ, যখন বর্ণনাকারী নিজেই প্রত্যেক হাদীসের সাথে ইসনাদ উল্লেখ করার ব্যাপারটাতে জোর দিতে শুরু করেন, সে সময়ের কথা বলতে গিয়ে **ফুল্লাতাহ্** বলেন যে, যখন দুর্বল এবং অনৈতিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্যক্তিগণও হাদীস বর্ণনা করতে শুরু করে, তখন ইসনাদ বর্ণনা করার প্রয়োজনটা প্রকট হয়ে উঠলো। এই সময় থেকে বর্ণনাকারীগণ নিজেরাই নিশ্চিত করতে শুরু করলেন যে, তিনি যে হাদীস বর্ণনা করছেন – তার ইসনাদ উল্লেখ করবেন। **আল-আমাশ** হাদীস বর্ণনা করতেন এবং তারপর বলতেন *"এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা*

---

[১৬১]দেখুন: Page#20-22, Vol.2, *Al-Widha fi al-Hadeeth* - Umar ibn Hasan Uthmaan al-Fullaatah.

www.pathagar.com

আসছে" এবং এই বলে তিনি ইসনাদ উল্লেখ করতেন। আল শাম-এর **আল ওয়ারিদ ইবন মুসলিম** বলেন, *"একদিন আল যুহরী বললেন, 'তোমাদের সমস্যাটা কোথায় যে, আমি তোমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটা ছাড়াই হাদীস বর্ণনা করতে দেখি? সেইদিনের পর থেকে আমাদের সঙ্গী-সাথীরা (আল শামের লোকজন) ইসনাদ উল্লেখের ব্যাপারটা নিশ্চিত করতো।"*[১৬২] যারা ইসনাদ ছাড়া হাদীস উল্লেখ করতো, তাদের কাছ থেকে হাদীস শুনে থাকলে স্কলাররা তাদের ছাত্রদের তিরস্কার করতেন।[১৬৩] সত্যি বলতে কি ইসনাদবিহীন হাদীসকে তারা প্রত্যাখ্যান করতেন। **ইবন আসাদ** বলেন, *"এমন কারো কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করো না যে বলে না যে, তিনি আমাদের কাছে বর্ণনা করলেন..... ।"* অর্থাৎ যে বর্ণনাটা ইসনাদ ছাড়া হয়। হাদীস ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রেও যেমন ইতিহাস, তাফসীর, কবিতা ইত্যাদি ইত্যাদির বেলায়ও মুসলিমরা ইসনাদের দাবী উত্থাপন করতে শুরু করে।

এভাবে ইসনাদ সম্পর্কিত ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার পর **ফুল্লাতাহ্** স্বচ্ছন্দে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলোতে পৌঁছান :

১) সাহাবীদের সময়েই প্রথম ইসনাদ পদ্ধতির ব্যবহার শুরু হয়।

২) আবু বকর (রা.) প্রথম বর্ণনাকারীদের হাদীসের উৎস উল্লেখ করতে বাধ্য করেন।

---

[১৬২] দেখুন: Page#28, Vol.2, *Al-Widha fi al-Hadeeth* - Umar ibn Hasan Uthmaan al-Fullaatah.
[১৬৩] দেখুন: Page#28-29, Vol.2, *Al-Widha fi al-Hadeeth* - Umar ibn Hasan Uthmaan al-Fullaatah.

www.pathagar.com

৩)উপরোল্লিখিত ১ ও ২-এর ধারাবাহিকতায় বর্ণনাকারীগণ নিজেরাই ইসনাদ উল্লেখ করার ব্যাপারে জোর দিতে শুরু করেন।[১৬৪]

আল-উমরী আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট উল্লেখ করেন। তা হচ্ছে এই যে, কিছু কিছু পূর্ববর্তী স্কলার যে তাদের হাদীসের ইসনাদ উল্লেখ করেন নি, তার মানে এই নয় যে, তারা ইসনাদ জানতেন না অথবা অন্য কোথাও কখনো সেটা উল্লেখ করেন নি। (একদম শুরুর দিকের বছরগুলোতে তারা সবসময় ইসনাদ উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নি; যখন মিথ্যাবাদীদের আবির্ভাব ঘটলো, স্পষ্টতই ইসনাদ উল্লেখের প্রয়োজন খুব প্রকটভাবে দেখা দিল।) **আল-উমরী** বলেন :

*"**কাতাদা** (মৃত্যু ১১৮ হিজরী) সময় বাঁচাতে এবং তাঁর ছাত্রদের জন্য ব্যাপারটা সহজ করতে গিয়ে বসরায় ইসনাদ উল্লেখ ছাড়াই হাদীস বর্ণনা করতেন। কখনো কখনো তাঁর ছাত্ররা ইসনাদ জানতে চাইতেন এবং তখন তিনি তাদের জন্য ইসনাদ বর্ণনা করতেন। **শুবা ইবন আল হাজ্জাজ** তাকে ইসনাদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতেন, যেমনটি করতেন **মামার ইবন রশীদ** – এছাড়াও আরো নতুন লোকজন যারা কেবল তাঁর সভায় যোগ দিয়েছেন, তারাও তাঁকে তেমনটা জিজ্ঞেস করতেন। অন্যরা তাদের এই ইসনাদ জিজ্ঞাসা করার বিরোধিতা করতেন। খুব সম্ভবত এই জন্য যে, তারা অনেক দিন ধরেই তাঁর ভাষণ শুনে আসছিলেন এবং তারা যাবতীয় ইসনাদ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। আর তাই তারা অন্যদের প্রতি সময়ক্ষেপণের অভিযোগ তুলতেন।"*

কাতাদা ইসনাদ সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন না এবং সত্যি বলতে কি তাঁর জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে তিনি হাদীসের সাথে ইসনাদ উল্লেখ করার দাবী জানাতেন।[১৬৫]

---

164 দেখুন: Page#30, Vol.2, *Al-Widha fi al-Hadeeth* - Umar ibn Hasan Uthmaan al-Fullaatah.

www.pathagar.com

উপসংহারে এটা বলা যায় যে, **এমন কোন সময়কাল ছিল না যখন ইসনাদ উল্লেখ করাটা পুরোপুরি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছিল**। সাহাবীদের সময় ইসনাদের ব্যবহারটা স্পষ্টত ধরা পড়তো না - যেহেতু সাধারণত যিনি হাদীস উল্লেখ করতেন, তাঁর আর নবীর মাঝখানে অন্য কোন ব্যক্তি থাকতেন না। (সাহাবীদের যুগটার ঐতিহাসিক অবসান ঘটে ১১০ হিজরীতে – শেষ সাহাবীর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে।) **আবু বকর** এবং **উমর** (রা.) হাদীসের শুদ্ধতা যাচাইয়ের ব্যাপারে খুবই কঠোর ছিলেন। পরবর্তীতে **আল-শাবী** এবং **আল যুহরীর** মতো লোকদের আবির্ভাব ঘটে যারা হাদীসের সাথে ইসনাদ উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্বন্ধে সাধারণ মুসলিমদের সচেতন করে তোলেন। এটা প্রকটভাবে বোঝা গেল [উসমানের(রা.) মৃত্যুর মত] বৃহৎ ফিতনার পরে, যা মানুষজনকে এই ধারণা দিল যে, হাদীসের বর্ণনা হচ্ছে তাদের দ্বীন, আর তাই তারা কার কাছ থেকে তাদের দ্বীন গ্রহণ করছেন সে ব্যাপারে তাদের সতর্ক হওয়া উচিত। শুরুর দিকের বছরগুলোর পরে ইসনাদ পদ্ধতি এবং তার সঠিক ব্যবহার, নিয়মে পরিণত হলো এবং এ সম্বন্ধে জ্ঞানচর্চা হাদীস শাস্ত্রের এক স্বনির্ভর শাখায় পরিণত হলো। হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে মুখ্য হাদীস সংকলন অস্তিত্বে আসার আগে পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া জারী ছিল।

আল্লাহ্ নবী (সা.)-কে শেষ নবী বলে ঘোষণা করেছেন, যাঁকে গোটা মানবকুলের জন্য পাঠানো হয়েছে। সুতরাং এই শেষ নবীর শিক্ষাগুলো বিশুদ্ধভাবে সংরক্ষিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। পূর্ববর্তী নবীগণের বেলায় ব্যাপারটা প্রযোজ্য ছিল না, কারণ তাঁদেরকে কোন নির্দিষ্ট জাতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল এবং তাঁদের নিয়ে আসা বাণী একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য উদ্দিষ্ট ছিল। সুতরাং আল্লাহ্ মুহাম্মাদ

---

[১৬৮] দেখুন: Page#50-51, *Buhooth fi Tareekh al-Sunnah al-Musharriifah* - Akram Dhiyaa Al-Umari.

www.pathagar.com

(সা.)-এঁর উম্মাহ্কে মূল শিক্ষাগুলো সংরক্ষণ করার এক অদ্বিতীয় পদ্ধতি দ্বারা আশীর্বাদ করেছেন - যা হচ্ছে এই ইসনাদ পদ্ধতি।

মুহাম্মাদ ইবন হাতিম ইবন আল মুজাফফর লেখেন:

*"নিশ্চিতই আল্লাহ্ এই জাতিকে ইসনাদের ব্যবহারের মাধ্যমে অন্যদের উপর সম্মানিত ও বিশেষিত করেছেন এবং তাদের মর্যাদা অন্যদের উপর নির্ধারিত করেছেন। পূর্ববর্তী অথবা বর্তমান কোন জাতিরই অবিচ্ছিন্ন ইসনাদ নেই। তাদের কাছে প্রাচীনকালের পুস্তকাদি রয়েছে, কিন্তু সেসবের সাথে তাদের ঐতিহাসিক বর্ণনা ইত্যাদি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে এবং তারা **তোরা** বা **ইনজিল** হিসাবে কতটুকু নাযিল হয়েছিল তার সাথে পরবর্তী সময়ের মানবিক বর্ণনার কতটুকু যুক্ত হয়েছে যা কিনা "অবিন্যস্ত (অথবা খুব সম্ভবত অজানা) বর্ণনাকারীদের" কাছ থেকে এসেছে – তা নিরূপণ করতে অক্ষম।"*[১৬৬]

হাদীস সংগ্রহ করতে গিয়ে পরিভ্রমণ

পৃথিবীতে যত ধর্মীয় সম্প্রদায় রয়েছে, তার মাঝে একমাত্র ইসলামী জাতিকে এমন দুইটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য দ্বারা আশীর্বাদ করা হয়েছে, যা কিনা সেই জাতিকে তার আদি ও বিশুদ্ধ শিক্ষাকে হারিয়ে ফেলা থেকে রক্ষা করেছে। এই দুটো অভূতপূর্ব বৈশিষ্ট্যের একটি হচ্ছে ইসনাদ যা আমরা কেবলমাত্র আলোচনা করলাম। আর অপরটি হচ্ছে হাদীসের খোঁজে পরিভ্রমণ যা আমরা এখন আলোচনা করবো ইনশা'আল্লাহ্। মুসলিমদের ভিতর দ্বীনী জ্ঞানের প্রবল আকাঙ্খা ব্যক্তিবিশেষকে একাধারে মাসের পর মাস কেবল নবীর (সা.) মুখের একটি কথাকে সংগ্রহ করতে অথবা নিশ্চিত করতে ভ্রমণ করার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। হাদীসের প্রতি এই নিবেদিত প্রাণ অনুভূতি এবং সেজন্য জাগতিক

---

[১৬৬] দেখুন: Page#18, *Al-Mukhtasaar fi Ilm Rijaal al-Athar* - Abdul Wahaab Abdul Lateef -এ উদ্ধৃত।

www.pathagar.com

জীবনের যেকোন দিক কুরবানী করার প্রস্তুতি নবী (সা.)-এঁর হাদীসসমূহকে সংরক্ষণ করার ব্যাপারে বিশেষ সহায়তা করে। **এম, যুবায়ের সিদ্দিকী** লেখেন:

"হাদীস শাস্ত্রবিদদের এসকল বিভিন্ন প্রজন্ম হাদীসের খোঁজে তাদের চমৎকার কর্মব্যস্ততার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রতি তাদের ভালবাসা ছিল সুগভীর। এ ব্যাপারে তাদের উৎসাহ উদ্দীপনার কোন সীমা ছিল না। তা করতে গিয়ে ভোগান্তি স্বীকার করার ব্যাপারে তাদের কোন সীমারেখা ছিল না। তাদের ভিতর যারা ধনী ছিলেন, তারা তাদের ধন-সম্পদ কুরবানী করেছেন এবং যারা গরীব ছিলেন তারা তাদের গরীবী সত্ত্বেও তাদের জীবনকে এই পথেই উৎসর্গ করেছেন।"[১৬৭]

এইসব প্রথমযুগীয় মুসলিমদের মধ্যে জ্ঞানার্জনের জন্য এই প্রবল আকাঙ্খা কেন ছিল? এই প্রশ্নের পুরোপুরি উত্তর দেয়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু, এই প্রবল আকাঙ্খার নিশ্চয়ই বহুবিধ কারণ ছিল যার ভিতর নিম্নলিখিত কারণগুলি থেকে থাকবে :

ক) এই সব পরহেজগার মহাত্মারা জানতেন যে, হাদীসের জ্ঞান থেকেই তারা কেবল নবীর (সা.) তরিকা বা পদ্ধতি সম্বন্ধে জানতে পারবেন এবং তারা জানতেন যে, তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তারা আল্লাহ্র নিকটবর্তী হতে পারবেন।

খ) কুর'আন ও নবী (সা.) উভয়েই জ্ঞান অর্জনের সুফল ও গুরুত্ব সম্বন্ধে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আল্লাহ্ বলেন **"বলুন! যাদের জ্ঞান আছে এবং যাদের জ্ঞান নেই তারা কি সমান?"** (সূরা আল যুমার, ৩৯:৯)। আল্লাহ্ আরো বলেন, **"তাঁর বান্দাদের ভিতর জ্ঞানীগণ শুধুমাত্র আল্লাহকেই ভয় করে।"** (সূরা ফাতির, ৩৫:২৮)। একই

---

[১৬৭] দেখুন: Page#48, *Hadith Literature: Its OrDgin; Development, Special Features and Criticism* - M.Z. Siddiqi.

www.pathagar.com

বিষয়ে নবীর (সা.) অনেক বক্তব্যের মাঝে নিম্নলিখিতগুলো উল্লেখযোগ্য:

"যে কেউ, যে জ্ঞানের অন্বেষণে বেরিয়ে গেল, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতের কোন একটি রাস্তা সহজ করে দেন..... ।" (মুসলিম)

নবী (সা.) আরো বলেন: *"আদম সন্তান যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন তার সকল ভাল কাজের সমাপ্তি ঘটে কেবল তিনটি ছাড়া - সদকায়ে জারিয়া, উপকারী জ্ঞান (যা সে পিছনে রেখে গেছে ও যা থেকে অন্যেরা উপকৃত হবে) এবং পরহেজগার সন্তান যে তার জন্য দু'আ করবে ।"* (মুসলিম)

প্রথম দিকের স্কলারগণ জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব অনুধাবন করেছিলেন এবং তারা এটাও বুঝেছিলেন যে, খোদ সৃষ্টিকর্তা সম্বন্ধে জ্ঞানের চেয়ে শ্রেয় আর কোন জ্ঞান নেই । আর তাই, তাঁর নবীর (সা.) শিক্ষা সম্বন্ধে তারা সাধ্যমত সবচেয়ে ভাল জানার চেষ্টা করেছেন ।

গ) বিশেষত হাদীস জাল করার সূচনা ঘটার পর, স্কলারগণ বুঝেছিলেন যে, পূর্ববর্তী জাতিগুলোর মত পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে এই জাতিকে বাঁচনোর একমাত্র উপায় হচ্ছে এই যে, নবীর (সা.) বিশুদ্ধ শিক্ষাগুলোকে অক্ষত অবস্থায় সংগ্রহ করতে হবে । আর পরিভ্রমণের মাধ্যমেই আংশিকভাবে জালকারী, দুর্বল বর্ণনাকারী ও অবিশ্বস্ত সূত্র সনাক্তকরণ সম্ভব হয়েছে ।

ঘ) নবী (সা.) সাবধান করে দিয়ে গেছেন যে, কেউ যদি তাঁর নামে মিথ্যা আরোপ করে তবে সে জাহান্নামে তার স্থান করে নেবে । নবীর (সা.) মৃত্যুর পরে বিশ্বস্ত দ্বীনদারদের জন্য এটা ছিল এক বিরাট দায়িত্বের বোঝা । তাদের অনেকেই হাদীস উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকতেন, যতক্ষণ না তারা নিশ্চিত হতে পারতেন যে, তারা বাস্তবিকই তাই বর্ণনা করছেন যা হুবহু নবী (সা.) বলে গেছেন । আর তাই তারা

www.pathagar.com

বিশাল দূরত্ব অতিক্রম করে আল্লাহ্‌র রাসূলের (সা.) বাণীকে নিশ্চিত ও সত্যায়িত করতে ছুটে যেতেন।

শুরুর দিকের বছরগুলোর কিছু উদাহরণ দিলেই হাদীস সংগ্রহ করতে গিয়ে দূরদূরান্তে ভ্রমণের চিত্রটা পরিস্কার হয়ে উঠে। বাস্তবে যদিও, **"নবীর (সা.) হাদীসের খোঁজে পরিভ্রমণ তাঁর জীবদ্দশাতেই শুরু হয়েছিল"** - একথা বললেও বেশী বলা হবে না। অর্থাৎ এমনকি সেই সময়েও, মদীনার বাইরে থেকে লোকজন এসে নবীকে (সা.) কোন সুনির্দিষ্ট ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতো। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, নবীর (সা.) পাঠানো দূতগণ কর্তৃক পঠিত কোন বিষয় নিশ্চিত করতে তারা নবীর (সা.) কাছে এসে জিজ্ঞাসা করতো। বুখারী এবং মুসলিমের বর্ণনা থেকে দেখা যায় যে, অন্যান্য সাহাবীরা বরং এরকম একটা ঘটনা ঘটবে, সে আশায় অপেক্ষা করতেন।

আনাস (রা.) যেমন বর্ণনা করেন, এটা এজন্য যে, নবীকে (সা.) খুব বেশী প্রশ্ন করতে তাদের বারণ করা হয়েছিল। আর তাই তারা অপেক্ষা করে রইতেন যে, কখন কোন এক বুদ্ধিমান বেদুইন নবীকে (সা.) কোন সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন করার জন্য বাইরে থেকে ভ্রমণ করে নবীর (সা.) কাছে আসবে।

নীচে আমরা নবীর (সা.) কাছ থেকে যারা সরাসরি হাদীস শুনেছেন, তাদের কাছ থেকে নিশ্চিত করতে গিয়ে অন্য সাহাবীদের তাদের উদ্দেশ্যে যাত্রার কিছু উদাহরণ দেখবো।[১৬৮]

সহীহ বুখারী বর্ণনায় এসেছে যে, **জাবীর বিন আব্দুল্লাহ, আব্দুল্লাহ বিন উনায়েমের** কাছ থেকে একটি মাত্র হাদীস নিশ্চিত করার জন্য একমাসের যাত্রাপথ অতিক্রম করে গেছেন। তাবারানীর অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে যে, জাবীর বলেন, *"উচিত শাস্তির (বা প্রতিশোধের)*

[১৬৮] অন্যান্য উদাহরণের জন্য দেখুন: Page#203, *Buhooth fi Tareekh al-Sunnah al-Musharriifah* - Akram Dhiyaa Al-Umari.

www.pathagar.com

ব্যাপারে আমি নবীর (সা.) একটি হাদীস শুনতাম। আর সেই হাদীসের বর্ণনাকারী [যিনি নবীর (সা.) মুখ থেকে সরাসরি হাদীসটি শুনেছিলেন] তখন মিশরে থাকতেন। তাই আমি একটা উট কিনলাম এবং মিশরে গেলাম..... ।[১৬৯]

সাহাবী **আবু আইয়ুব** (রা.), **ওকবা ইবন আমরকে** একটি হাদীস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে সুদূর মিশরে গিয়েছিলেন। তিনি ওকবাকে বলেন যে, তিনি এবং ওকবাই তখন বেঁচে ছিলেন, যারা ঐ নির্দিষ্ট হাদীসটি নবীর (সা.) কাছ থেকে সরাসরি শুনেছিলেন। ঐ হাদীস শোনা শেষে তার মিশর যাত্রার উদ্দেশ্য হাসিল হয়েছিল এবং তিনি মদীনায় ফিরে আসেন। আরেকজন সাহাবী **ফাযালা ইবন হুবায়েদের** সাথে দেখা করার জন্য ভ্রমণ করেন এবং তাঁর সাথে দেখা হলে তাঁকে বলেন যে, তিনি কেবল এজন্যই গেছেন যে, তাঁরা দুজন নবীর (সা.) মুখ থেকে একত্রে একটা হাদীস শুনেছিলেন। এবং তিনি আশা করেছিলেন যে, **ফাযালার** কাছে তিনি ঐ হাদীসের পূর্ণ শব্দাবলী পাবেন। (এই ঘটনাটি আবু দাউদে বর্ণিত রয়েছে)।

সাহাবীদের কাহিনী থেকে কেউ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন যে, হাদীসের খোঁজে তাদের এই পরিভ্রমণ মূলত দুইটি কারণে ছিল:

১)একজন সমসাময়িক সাহাবীর কাছ থেকে একটি হাদীস শোনা যা সরাসরি নবীর (সা.) মুখ থেকে শোনার সৌভাগ্য তাদের হয়নি। আর সেই সূত্রে নিজেদের হাদীসের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করা।

২)অথবা, কোন একটি হাদীসের শব্দাবলী এবং/অথবা অর্থ সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া, যা তিনি নিজে এবং সেই অপর সাহাবী সরাসরি আল্লাহর রাসূলের (সা.) কাছ থেকে শুনেছিলেন।

---

[১৬৯] দেখুন: Page#174, Vol.1, *Fath al-Baari bi Sharh Saheeh al-Bukhari* - Ahmad ibn Hajr

www.pathagar.com

এভাবে সাহাবীরা প্রতিনিয়ত তারা যে সব হাদীস বর্ণনা করতেন, সেগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সেগুলোর শুদ্ধতা নিশ্চিত করতেন।

তাবেঈদের সময়, নবীর (সা.) একটা হাদীস শোনা বা সেটাকে নিশ্চিত করার খাতিরে পরিভ্রমণের আকাঙ্খা ও সদিচ্ছা মোটেই হ্রাস পায়নি। নবীর (সা.) বাসস্থান হওয়ার সুবাদে, সুন্নাহ্র আবাসস্থল হওয়ার সুবাদে এবং এমন একটা শহর যেখানে নবীর (সা.) মৃত্যুর পরে বহু সাহাবী বসবাস করতেন - তা হওয়ার সুবাদে সম্ভবত মদীনাই ছিল এই ধরনের পর্যটকদের প্রধান লক্ষ্যস্থল ও আবাসস্থল। কিন্তু বাস্তবে যে কোন স্থান, যেখানে গেলে একটি সুনির্দিষ্ট হাদীস সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যাবে, সে স্থানই এই ধরনের পর্যটকদের আকর্ষণ করতো।

এ ধরনের বহু উদাহরণ দেওয়া যাবে। **আল-খতীব আল-বাগদাদী** হাদীসের খোঁজে ভ্রমণ সম্পর্কে গোটা একটি বই লিখেছিলেন। আর সেই বই হচ্ছে: **'আর রিহলা ফি তালাবাল হাদীস' (ট্রাভেলস ইন সার্চ অব হাদীস)**। যা এই কাজকে বিশেষ মনোযোগের দাবীদার করে তোলে তা কেবল হাদীস সংগ্রহের জন্য স্কলারদের পরিভ্রমণই নয়, ইসলামের ইতিহাসের পূর্ববর্তী স্কলারগণের সবাই এমন ভ্রমণ করেছিলেন। বরং ভ্রমণ করাটাই স্বাভাবিক ছিল, এবং যদি কোন স্কলার ভ্রমণ না করে থাকতেন, তবে সেটাই অদ্ভুত ব্যাপার বলে চিহ্নিত করা হতো। কিন্তু এই বইয়ের সম্পাদক নূর আল দীন ইতর যেমনটা বলেছেন – **এই বইখানি সাধারণভাবে হাদীস সংগ্রহ করতে গিয়ে স্কলারদের ভ্রমণের কাহিনী নয়, বরং কেবল একটি মাত্র হাদীস সংগ্রহ করার জন্য স্কলারদের ভ্রমণের কাহিনীগুলো এখানে সংকলিত করা হয়েছে।**[১৭০]

---

[১৭০] দেখুন: Page#10, *Al-Rihla fi Talab al-Hadeeth* - Al-Khateeb al-Baghdaadi.

www.pathagar.com

হাদীস সংরক্ষণের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে হাদীসের সমালোচনা এবং বর্ণনাকারীদের মূল্যায়নের পদ্ধতির উদ্ভাবন। এমনকি রাসূল (সা.)-এঁর জীবদ্দশায়ই সাহাবীরা প্রায়ই তাঁর কাছে এমন কিছু নিশ্চিত করতে যেতেন, যা নবীর (সা.)-এঁর কাছ থেকে এসেছে বলে তাঁরা শুনে থাকতেন। আহমাদ, বুখারী, মুসলিম এবং নাসাঈর হাদীস সংগ্রহ থেকে উদাহরণ দিতে গিয়ে **আজামী** বলেন:

"সমালোচনাকে আমরা যদি শুদ্ধ ও ভুলের মাঝে পার্থক্য নিরূপণের চেষ্টা বলে ধরে নিই, তাহলে আমরা বলতে পারি যে, তা নবীর (সা.) জীবদ্দশাতেই শুরু হয়েছিল। কিন্তু ঐ পর্যায়ে ব্যাপারটা কেবল নবীর (সা.) কাছে যাওয়া এবং তিনি যা বলেছেন বলে শোনা গেছে - তা নিশ্চিত করার চেষ্টার চেয়ে বেশী কিছু ছিল না।

আলী, উবাই ইবনে কাব, আবদুল্লাহ ইবন আমর, উমর (রা.), ইবন মাসউদের (রা.) স্ত্রী জয়নাব এবং অন্যান্যদেরও আমরা এ ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সত্যতা নিরূপণ করতে দেখি। এ ধরনের ঘটনার আলোকে এটা দাবী করা যেতে পারে যে, হাদীস সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা অথবা অন্য কথায় প্রাথমিকভাবে হাদীসের সমালোচনা নবীর (সা.) জীবদ্দশাতেই শুরু হয়েছিল।"[১৭১]

স্পষ্টতই নবীর (সা.) মৃত্যুর সাথে সাথে সরাসরি তাঁর কাছে গিয়ে কোন হাদীস নিশ্চিত করার ব্যাপারটার সমাপ্তি ঘটেছিল। তখন আবুবকর, উমর, আলী, ইবন উমর (রা.) এবং অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সাহাবী একে অপরের কাছ থেকে হাদীস নিশ্চিত করতেন।

উদাহরণস্বরূপ হাদীস বর্ণনার শুদ্ধতার ব্যাপারে উমর (রা.) কঠোর ছিলেন। কেউ চাইলে সহীহ মুসলিমে আবু মূসা আল-আশআরীর

---

[১৭১] দেখুন: Page#48, *Studies in Hadith Methodology and Literature* - Mustafa Muhammad Azami.

www.pathagar.com

(রা.) বেলায় ঘটে যাওয়া একটা ঘটনার উদাহরণ পাবেন। ওমরের (রা.) এর কাছে তিনি একটি হাদীস বর্ণনা করেছিলেন, যার সাক্ষী উপস্থাপন করতে না পারলে, তাঁকে শাস্তি দেওয়া হবে বলে উমর (রা.) তাঁকে শাসিয়েছিলেন। এ হাদীসের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে **আবদুল হামিদ সিদ্দিকী** বলেন যে, উমর (রা.) আসলে আবু মূসাকে (রা.) সন্দেহ করেন নি, কিন্তু হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি কঠোর নিয়ন্ত্রণ বা পর্যবেক্ষণের প্রথা চালু রাখতে চাইছিলেন।[১৭২]

এই ধরনের আরো বহু উদাহরণ দেওয়া যাবে। আবু হুরায়রা (রা.), আয়শা (রা.), উমর (রা.) এবং ইবন উমর (রা.) – তাঁরা হাদীস নিশ্চিত করতেন। কখনো কখনো তাঁরা একাধিক সূত্র থেকে বা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে একটি হাদীস নিশ্চিত করতেন, যেমন উমর (রা.) এবং আবু মূসার (রা.) বেলায় ঘটেছিল বলে আমরা উল্লেখ করেছি এবং অন্যান্য সময় তাঁরা একটা পদ্ধতি ব্যবহার করতেন যেটাকে **'সময়ের সাথে পরিবর্তন'** নিরূপণ পদ্ধতি বলা যেতে পারে। মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে যে, আয়শা (রা.) আবদুল্লাহ্ ইবন আমরের (রা.) কাছ থেকে বর্ণিত একটা হাদীস শুনেছিলেন। এক বছর পরে তিনি তাঁর ভৃত্যকে পাঠিয়েছিলেন আবদুল্লাহ্ ইবন আমরের (রা.) কাছ থেকে হাদীসটি শোনার জন্য - এটা নিশ্চিত করতে যে, তিনি নবীর (সা.) কাছ থেকে ঠিক যেমনটি শুনেছিলেন, তেমনটি হাদীসটি বর্ণনা করলেন কিনা এবং এটা নিশ্চিত করতে যে, (সময়ের ব্যবধানে) তিনি সেটার বর্ণনায় কোন ভুল করেন নি বা কিছু যোগও করেন নি।[১৭৩]

---

[১৭২] দেখুনঃ Page#1175-6, Vol. 3, *Sahih Muslim (translation)* - Abdul Hamid Siddiqui.
[১৭৩] দেখুনঃ Page#1405, Vol. 4, *Sahih Muslim (translation)* - Abdul Hamid Siddiqui.

www.pathagar.com

হাদীস জাল করার সূত্রপাত

হাদীস সংরক্ষণের সাথে সংশ্লিষ্ট আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, কখন হাদীস জাল করার সূচনা হয়? – এই প্রশ্নের উত্তর। হাদীস সংরক্ষণের ঘটনার সাথে এই প্রশ্নটির গুরুত্ব এবং গভীর সংশ্লিষ্টতার কারণে এখানে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

অনুসারীদের কাছে নবীর (সা.) রেখে যাওয়া শিক্ষাগুলোর মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বিশ্বস্ত ও সৎ হবার শিক্ষা। সত্যি বলতে কি ইসলামে সৎ হওয়াটা ঈমানের একটি বৈশিষ্ট্য এবং অসৎ হওয়াটা মুনাফেকীর একটি বৈশিষ্ট্য। নবী (সা.) বলেছেন, *"এমন চারটি বৈশিষ্ট্য আছে, কেউ যদি তার সবকয়টি ধারণ করে তবে সে হচ্ছে এক নিখাদ মুনাফিক। তার যদি এই বৈশিষ্ট্যগুলির যে কোন একটি থাকে তবে সে মুনাফেকীর একটি বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হবে যতক্ষণ না সে সেটি ত্যাগ করবে। (সেগুলো হচ্ছে:) যখন সে কথা বলে সে মিথ্যা বলে----- ।"* (বুখারী ও মুসলিম) সাহাবীদের মিথ্যা বলা থেকে দূরে রাখার জন্য ব্যাপারটার উপর নবীর গুরুত্ব আরোপ এবং সাবধান বাণীই যথেষ্ট ছিল। এ ছাড়া নবী (সা.) তাদেরকে দ্বীন ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছেন এবং তাঁর নামে কোন মিথ্যা আরোপ করার ব্যাপারে কঠোরভাবে সাবধান করে দিয়ে গেছেন। উপরোক্ত হাদীস ছাড়াও নবী (সা.) আরো বলেছেন, *"আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করা অন্য কারো প্রতি মিথ্যা আরোপ করার মত নয়। আমার প্রতি যে কেউ মিথ্যা আরোপ করলো, সে জাহান্নামে তার আসন গ্রহণ করবে।"* (বুখারী)

হাদীস সাহিত্যের ঐতিহাসিক গ্রহণযোগ্যতার প্রসঙ্গে হাদীস জাল করার সূচনার ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ব্যাপারে কয়েকটি মত রয়েছে। সংক্ষিপ্ততার খাতিরে বিভিন্ন মতের আমরা এখানে বিস্তারিত আলোচনা করবো না।

www.pathagar.com

তিনটি উল্লেখযোগ্য মত হচ্ছে নিম্নরূপঃ

১)আল্লাহর রাসূলের (সা.) জীবদ্দশাতেই হাদীস জাল করা শুরু হয়, সেজন্যই তিনি বলেন, *"যে আমার নামে মিথ্যা কিছু আরোপ করবে সে জাহান্নামের আগুনে তার আসন বানিয়ে নেবে।"* (বুখারী)

২)দ্বিতীয় মতটি হচ্ছেঃ হাদীস জাল করা উসমানের (রা.) খিলাফতের শেষ অংশে শুরু হয়। যখন অনেক মানুষই উসমানের (রা.) প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে এবং ইবন উদায়েস মিম্বরে উঠে উসমানের (রা.) বিরুদ্ধে একটি বানোয়াট বক্তব্য প্রদান করে (যদিও সেই বানোয়াট বক্তব্য নবীর (সা.) হাদীসরূপে উদ্ধৃত হয়নি)।

৩)তৃতীয় মত অনুযায়ী উসমানের (রা.) মৃত্যুর পর ছড়িয়ে পড়া গৃহযুদ্ধের সময় থেকে হাদীস জালের সূচনা হয়ঃ ইবন সাবা - যে কিনা এক বিপথগামী নেতা - তার দ্বারা এবং তার অনুসারীদের মত লোকজন দ্বারা।

এর আগে উল্লিখিত **উমর ফুল্লাতাহ্**র পি.এইচ.ডি থিসিসে তিনি বলেনঃ

"এটা পরিষ্কার যে, (উপরে উল্লিখিত) মতগুলো সবই তত্ত্বীয় এবং সবকটির বেলায়ই বাস্তব প্রমাণ উপস্থাপনের প্রয়োজন রয়েছে যে, কোন সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি উল্লিখিত সময়কালে কোন হাদীস জাল করেছিলেন। এবং তা যদি প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তাহলেই কেউ কেবল বলতে পারবে হাদীস জালের সূত্রপাত ঠিক কখন হয়েছিল। উসমানের (রা.) মৃত্যুর পরে বিভিন্ন দলের উৎপত্তি ঘটে। এটার অর্থ এই নয় যে, তারা হাদীস জাল করতে শুরু করেছিলেন। এটা পরিষ্কার যে, বড়জোর এই সকল নেতা ও উপদলের কোন অনুসারী চরম একটা অবস্থান নেবে এবং নিজের দলকে সমর্থন করতে একটা হাদীস জাল করবে।"[১৭৪]

---

[১৭৪]দেখুনঃ Page#182, Vol.1, *Al-Widha fi al-Hadeeth* - Umar ibn Hasan Uthmaan al-Fullaatah.

www.pathagar.com

তিনি আরও বলেন যে, যে সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনার কথা উল্লেখ করে হাদীস জাল করার কথা বলা হয়, সেগুলো এমন সুনির্দিষ্ট নয় যার উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, সত্যি সত্যি ঐ সময়টাতে হাদীস জালকরণের সূচনা হয়েছিল। এরপর তিনি হাদীস জাল করার সূত্রপাতের ব্যাপারে উপরে উল্লিখিত বিভিন্ন মতকে খন্ডন করেন। এ বিষয়ে সম্ভবত নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজা উচিত:

এটা কি সম্ভব যে, নবীর (সা.) জীবদ্দশায়ই হাদীস জাল করা শুরু হয়েছিল? এটা অকল্পনীয়। কেননা তেমনটা ঘটলে ব্যাপারটা সর্বজনবিদিত হতো এবং তা নবীর (সা.) গোচরে আনা হতো, সম্ভবত আল্লাহর কাছ থেকেই ওহীর মাধ্যমে তা তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হতো। এ ধরনের ঘটনা রয়েছে বলে কারো জানা নেই এবং এ ধরনের কোন ঘটনার বর্ণনার কোন অস্তিত্ব ছাড়া কারো এ দাবী করা উচিত নয় যে, নবীর (সা.) সময় হাদীস জাল করার কাজ শুরু হয়েছিল।

এটা কি সম্ভব যে, কোন একজন সাহাবী হাদীস জাল করেছিলেন? সাহাবীদের কেউ একটা হাদীস জাল করে থাকবেন এই ধারণাটা অকল্পনীয়। কুর'আনে বেশ কিছু জায়গায় সাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহ তাঁর সন্তুষ্টির কথা উল্লেখ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ আল্লাহ বলেন,

وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَٰنٍ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾

"আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম ও অগ্রগামী এবং যারা তাদেরকে অনুসরণ করেছে সুন্দরভাবে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তারাও আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তিনি

www.pathagar.com

তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাতসমূহ, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। এটাই মহাসাফল্য।" (সূরা তওবা, ৯:১০০)

এটা অকল্পনীয় যে, একটা জনসমষ্টি সম্পর্কে আল্লাহ্ তাঁর সন্তুষ্টি ঘোষণা করবেন - যারা তাঁর নবীর নামে হাদীস জাল করতে পারে। এছাড়া তাদের হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে সাহাবীরা অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন, যাতে তারা নিশ্চিত হতে পারেন যে, নবীর কথাগুলো বর্ণনা করতে গিয়ে তারা কোন ভুল করছেন না।

সাহাবীগণ আল্লাহর জন্য তাদের জীবন এবং সম্পদ কুরবানী করেছিলেন। সত্য এবং সুবিচারকে তাঁরা কতখানি ভালবেসেছিলেন, তা তাঁরা দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। সাহাবীরা যে আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে ভয় করতেন না, সেটা দেখাতে গিয়ে **মুস্তাফা আল সিবায়ী** অনেক উদাহরণ উপস্থাপন করেন। যেমন, আবু বকর (রা.) মুরতাদদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেন এবং উসামাকে (রা.) তাঁর সামরিক অভিযাত্রায় পাঠান যদিও অনেক সাহাবী এ ব্যাপারে তাঁকে সতর্ক করেন। বিশেষ ঘটনায় আলী (রা.) উমরকে (রা.) ভুল শুধরে দেন এবং ওমরের (রা.) মর্যাদাবোধ যার সত্যতা গ্রহণ করা থেকে তাঁকে বিরত রাখতে পারে নি। আবু সাইদ (রা.) খলিফা মারওয়ানের মুখের উপর বলেছিলেন যে, ঈদের সালাতের পূর্বে খুতবা দিয়ে তিনি সুন্নাতের খেলাফ করেছিলেন। অত্যাচারী আল-হাজ্জাজের সামনেই ইবন উমর (রা.) আল যুবায়েরের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। আল-সিবায়ীর উপস্থাপিত এই সব উদাহরণ এবং এই ধরনের আরো অনেক উদাহরণ থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, এই সমস্ত মহৎপ্রাণ ব্যক্তিগণ সত্য এবং আল্লাহ্‌কেই সব কিছুর চেয়ে বেশী ভালবেসেছিলেন। এটা বিশ্বাসযোগ্য নয় যে, তাঁরা কোন একটা কথা বানিয়ে বলবেন এবং সেটাকে তাদের প্রাণপ্রিয় নবীর (সা.) হাদীস বলে চালিয়ে দেবেন। আনাস (রা.) একবার একটা হাদীস বর্ণনা করেছিলেন এবং তাকে

www.pathagar.com

জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, *"আপনি কি এটা রাসূল (সা.) এঁর কাছ থেকে শুনেছেন?"* তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, *"হ্যাঁ, অথবা আমি এমন একজনের কাছ থেকে শুনেছি যিনি মিথ্যা বলেন না। আল্লাহর শপথ, আমরা কখনো মিথ্যা বলিনি, অথবা আমরা জানি নি মিথ্যা বলা কাকে বলে।"*[১৭৫] **ফুল্লাতাহ্** লেখেন, *"আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন, তবে আমার কাছে যা প্রতীয়মান হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, হাদীস জালকরণ – অর্থাৎ আমি বোঝাতে চাচ্ছি আল্লাহর রাসূলের (সা.) প্রতি কিছু মিথ্যারোপ করা - এই সময়ের পরে শুরু হয়েছিল (হিজরী ৪১ সনের পরে)। তবে এটাকে প্রথম শতাব্দীর শেষ তৃতীয়াংশের ভিতরে সীমাবদ্ধ রাখা যায়। এই সময়টায় নবীর (সা.) হাদীস জালকরণের সম্ভাবনার প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। মুসলিম উম্মাহ বিভক্ত হবার এবং দলে দলে ভাগ হয়ে যাবার পর, এমন কিছু ঘটনা ঘটেছিল যা এই জঘন্য কাজের পথ সুগম করে দিয়েছিল। যা নবীর (সা.) কথার পবিত্রতা/শুদ্ধতার অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটায় - তাঁর কথা বা কাজের এমন বর্ণনা জাল করার মাধ্যমে, যা তিনি বলেন নি বা করেন নি।"*[১৭৬]

কিছু কিছু বিষয় যেগুলো হাদীস জাল করার অধ্যায়ের ভিত্তি স্থাপন করেছিল, সেগুলো ছিল নিম্নরূপ:

১)সাহাবীগণ যারা খলিফা ছিলেন এবং যারা মুসলিম উম্মাহকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাঁদের অবস্থান ও শুদ্ধতাকে লোকজন আর সম্মান দেখাচ্ছিল না। সে সময়কার বিভিন্ন ঘটনা থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা যায়। লোকজন খোলাখুলিভাবে তখন এই সকল মহৎপ্রাণ নেতাদের সমালোচনা করতে ও তাঁদের প্রতি আক্রমণ করে কথা বলতে শুরু করেছিল। ইবন উদায়েস নবীর (সা.) মিম্বরে উঠলো এবং তার কথা দিয়ে উসমান (রা.) কে আক্রমণ করলো। মানুষের বিচার মেনে

---

[১৭৫] দেখুন: Page#76-78, *Al-Sunnah wa Makaanatuhaa fi al-Tashree al-Islaami* - Mustafa al-Sibaa'ee.

[১৭৬] দেখুন: Page#202, Vol.1, *Al-Widha fi al-Hadeeth* - Umar ibn Hasan Uthmaan al-Fullaatah.

www.pathagar.com

নেয়ার জন্য খারেজীগণ আলীকে (রা.) দোষারোপ করলো এবং তাঁকে একজন 'কাফির' বলে আখ্যায়িত করলো। কেবলমাত্র মৌখিক সমালোচনাই যে সবটুকু ছিল তাই নয়, বরং খলিফাদের কাউকে কাউকে শহীদও করা হল।

২)মুসলিমগণ ভিন্ন ভিন্ন ফিরকায় বিভক্ত হলেন এবং প্রতিটি ফিরকাই অপর ফিরকার বিরোধিতা শুরু করলো। এটা সর্বজনবিদিত যে, তখন এমনকি একটি গৃহ যুদ্ধের সূচনা হলো।

৩)**আবদুল্লাহ্ ইবন সাবা** নামক এক বিদ্রোহী ও বিপথগামী নেতার প্রভাব তখন মুসলিম বিশ্বে অনুভূত হতে লাগলো। এর মাধ্যমে বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চল থেকে অপরিচিত ধারণাসমূহ মুসলিম বিশ্বে অনুপ্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত হলো।

৪)এই সময়েই প্রথমবারের মত সাহাবীদের নামের বরাত দিয়ে মিথ্যা বক্তব্য প্রচারিত হতে শুরু করলো। বিশেষভাবে আলী ইবন আবু তালিবের (রা.) নামে।

এই সকল বিষয়গুলোই হাদীস জাল করার অধ্যায়ের সূচনার ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেছিল। এছাড়াও, ফুল্লাতাহ্, তার সম্ভাব্য সবচেয়ে জোরালো যুক্তিতে বলেন:

"আমার গবেষণা-কর্মে আমি এমন কারো সাক্ষাৎ পাইনি যে, নবীর (সা.) মৃত্যুর পর থেকে নিয়ে প্রথম শতাব্দীর শেষ তৃতীয়াংশের শুরু পর্যন্ত নবীর (সা.) কোন বক্তব্য জাল করার একটি দৃষ্টান্তও নিশ্চিত করতে পেরেছেন (অন্য কথায় আমি এমন একটি ঘটনাও খুঁজে পাইনি) যে ঘটনাকে হাদীস জাল করার সূচনা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।"[১৭৭]

---

[১৭৭] দেখুন: Page#212, Vol.1, *Al-Widha fi al-Hadeeth* - Umar ibn Hasan Uthmaan al-Fullaatah.

www.pathagar.com

প্রথম নির্ভরযোগ্য ঘটনা (বহু লেখক অবশ্য হাদীস জাল করার সূচনা নিরূপণ করতে গিয়ে অনেক অনির্ভরযোগ্য বর্ণনার আশ্রয় নেন) যেটা থেকে কোন ধরনের বানোয়াট বর্ণনার ধারণা পাওয়া যায়, সেটা হচ্ছে **ইবন আল জাওযী** কর্তৃক 'আল মাওযুয়াত' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ নিম্নলিখিত ঘটনাটি - যা কিনা বুখারী তার আল-সগীর গ্রন্থেও লিপিবদ্ধ করেছেন। আল মুখতার, আল রাবী-আল খুযায়ীকে যিনি কিনা নবীর (সা.) সময়টা দেখেছেন, তাঁকে বলে, *"ওহে, তুমি নবীর (সা.) সাক্ষাত পেয়েছো এবং তুমি নবীর (সা.) বরাত দিয়ে আমাদের কাছে যা বলেছো তাতে কখনোই মিথ্যা বলোনি। আমাদের জন্য নবীর (সা.) কিছু হাদীস রচনা কর এবং তোমার জন্য রয়েছে সাতাশ দিনার।"* তিনি উত্তর দেন, *"যে নবীর নামে মিথ্যা কিছু আরোপ করে, তার জন্য রয়েছে [জাহান্নামের] আগুন। আর তাই আমি তা করবো না।"*

ফুল্লাতাহ্ লেখেন, *"এটা স্পষ্ট যে, আল-মুখতার চেয়েছিল যে, তার দাবীসমূহকে শক্তিশালী করতে তিনি যেন তার হয়ে হাদীস জাল করেন। এটাও জানা যায় যে, সে মুহাম্মাদ ইবন আম্মার ইবন ইয়াসিরকেও একই প্রস্তাব দিয়েছিল যা তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এবং সেজন্য তাকে হত্যা করা হয়েছিল।"*[১৭৮]

উপসংহারে **ফুল্লাতাহ্** বলেন, *"এই সব বর্ণনা থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, আল মুখতার আল সাকাফী মানুষকে নবীর (সা.) হাদীস জাল করার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করতো। যদিও বর্ণনাগুলো থেকে দেখা যায় যে, কেউ তার আবেদনে সাড়া দেয়নি। আর তাই এই ঘটনাগুলোকেও হাদীস জালকরণের সূচনা বলে ধরে নেবার উপায় নেই, যদিও সে সময় হাদীস জালকরণের চিন্তাভাবনা চলছিল। যেহেতু এটা নিশ্চিত যে, এই সময়ের পূর্বে কোন জালকরণ ঘটেনি। সেই ক্ষেত্রে এই সন্দেহ পোষণ করা যায় যে, এই সময়ের পর তা*

---

[১৭৮] দেখুন: Page#213, Vol.1, *Al-Widha fi al-Hadeeth* - Umar ibn Hasan Uthmaan al-Fullaatah.

www.pathagar.com

ঘটে থাকতে পারে। সেজন্য আমার কাছে সবচেয়ে জোরালো মত এটাই মনে হয় যে, হাদীস জালকরণের প্রচেষ্টা প্রথম শতাব্দীর শেষ তৃতীয়ভাগে শুরু হয় - যখন বড় মাপের সাহাবীদের বেশীরভাগই ইতিমধ্যেই মৃত্যুবরণ করেছেন এবং অপেক্ষাকৃত কমবয়সী সাহাবীদের একটি ছোট সমষ্টিই শুধু বেঁচেছিলেন। এবং তাঁরা ততদিনে নিজেদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছেন (মারামারি-কাটাকাটি থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে) এবং ঐ সময়কালে তাঁরা সমাজের ভিতরে উল্লেখযোগ্য প্রভাবশালী অবস্থায় ছিলেন না।"[১৭৯]

কেউ কেউ, ইবন আব্বাস (রা.) এবং ইবন সীরীনের বর্ণনার উপর ভিত্তি করে এই মতের বিরোধিতা করতে পারেন, যা থেকে এমনটা মনে হয় যে, আরো বহু আগেই হাদীস জালকরণের সূচনা ঘটেছিল। **ইবন আব্বাস** (রা.) বলেছিলেন, *"আমরা আল্লাহর রাসূলের (সা.) বর্ণনা দিয়ে হাদীস উদ্ধৃত করতাম এবং কেউ আল্লাহর রাসূলের (সা.) নামে মিথ্যা কিছু আরোপ করতো না। আর তারপরে একটা সময় আসলো যখন থেকে লোকজন বন্য এবং গৃহপালিত পশু দুটোই চড়তে শুরু করলো এবং আমরা তখন তাঁর বরাত দিয়ে বর্ণনা করা বন্ধ করে দিলাম।"* **ইবন সীরীন** বলেন যে, গৃহযুদ্ধের পরে তারা ইসনাদ ছাড়া কোন হাদীস গ্রহণ করতেন না। ইবন আব্বাসের (রা.) বক্তব্য থেকে এটা মনে হয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, গৃহযুদ্ধের পর পরই লোকে মিথ্যা বলতে শুরু করে। *"লোকজন বন্য ও গৃহপালিত পশু দুটোই চড়তে শুরু করে"* বলে তিনি এ সময়টার কথাই বুঝিয়েছেন। **ফুল্লাতাহ্** তার এ উপসংহারের এ আপত্তিরও জবাব দেন।

প্রথমত ইবন সীরীনের বক্তব্য থেকে এটা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় না যে, সেই সময়ে মানুষজন হাদীস জাল করতে শুরু করেছিল। তিনি কেবল এটাই উল্লেখ করেছেন যে, ঐ সময়ে স্কলারগণ হাদীস গ্রহণ

---

[১৭৯] দেখুন: Page#214, Vol.1, *Al-Widha fi al-Hadeeth* - Umar ibn Hasan Uthmaan al-Fullaatah.

www.pathagar.com

করার ব্যাপারে আরো অধিক সতর্ক হয়ে উঠেছিলেন, যেন তারা বিদ'আতীদের কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ না করেন, যারা কিনা এমন একটা পথ অনুসরণ করছিল, যা প্রথম প্রজন্মের মুসলিমদের চেয়ে আলাদা। বিদ'আতীদের প্রতি নরম মনোভাব দেখিয়ে এবং তাদের বর্ণনাসমূহ গ্রহণ করে তাদের বিদ'আত দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ব্যাপারে তারা ভীত হয়ে ছিলেন।[১৮০]

উপরে উল্লিখিত ইবন আব্বাসের (রা.) বক্তব্য তাঁর জীবনের শেষের দিকের বলেই মনে হয়, কেননা তিনি প্রথম শতাব্দীর শেষ তৃতীয়াংশে মারা যান। এটা কোনভাবেই উপরের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে না - যা তাঁর অভিব্যক্তি থেকেই প্রমাণিত হয়, যার অর্থ হচ্ছে এই যে, মানুষ ভিন্ন ভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়ে গেছে এবং এই বিভক্তি ইবন আব্বাসের (রা.) জীবনের শেষের দিকে সবচেয়ে প্রকটভাবে দেখা দেয়। এছাড়া ইবন আব্বাসের (রা.) এই বক্তব্য বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। একটা বর্ণনায় এসেছে যে তিনি বলেন, *"এর পরে লোকজন নবীর (সা.) নামে বিভিন্ন বর্ণনা জাল করতে শুরু করে ..... ।"* কিন্তু এটা হচ্ছে এমন কারো ব্যাখ্যা যিনি ইবন আব্বাসের (রা.) কথাটা শুনেছিলেন। এবং ইবন আববাস (রা.) ঠিক যেভাবে কথাটা বলেছিলেন এটা তা নয়।[১৮১]

সুতরাং পরিশেষে এটা বলা যায় যে, **প্রথম শতাব্দীর শেষ তৃতীয়াংশেই প্রথম হাদীস জালকরণ শুরু হয়**। যে কেউ, যে অন্যরকম দাবী করে, তাকে অবশ্যই ঐ সময়ের আগেই যে হাদীস জাল করা শুরু হয়েছিল তার সপক্ষে শক্ত প্রমাণ রাখতে হবে।

---

[১৮০] দেখুন: Page#215, Vol.1, *Al-Widha fi al-Hadeeth* - Umar ibn Hasan Uthmaan al-Fullaatah.

[১৮১] দেখুন: Page#216-7, Vol.1, *Al-Widha fi al-Hadeeth* - Umar ibn Hasan Uthmaan al-Fullaatah.

www.pathagar.com

ফুল্লাতাহ্‌র এই সাম্প্রতিক গবেষণা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এটা দেখা যায় যে, নিম্নলিখিত ঘটনাসমূহের পরে হাদীস জালকরণের ঘটনা ঘটে;

১) লোকজন যখন নিয়মিতভাবে এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে ইসনাদ ব্যবহার করতে শুরু করে।

২) নবী (সা.)-এঁর বহু হাদীস ইতিমধ্যেই নথিভুক্ত হয়েছিল এবং লিখিত অবস্থায় সংরক্ষিত হয়েছিল।

৩) জারহ্‌ ও তা'দীলের বিজ্ঞান (হাদীস বর্ণনাকারীদের সমালোচনা ও মূল্যায়নের বিজ্ঞান) ইতিমধ্যেই মানুষের কাছে বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছে।

এসব থেকে এটাই বোঝা যায় যে, হাদীস জালকরণ কোনভাবেই নবী (সা.)-এঁর সহীহ-শুদ্ধ হাদীস সংগ্রহকে সংরক্ষণকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারেনি। কিছু মানুষ দাবী করে থাকেন যে, এমন বহুল পরিমাণে হাদীস জাল হয়েছিল যে, স্কলারদের জন্য সত্য ও মিথ্যা হাদীসের মধ্যে পার্থক্যকরণের কোন উপায় ছিল না। অন্তত দুইটি ব্যাপার বিচার করলেই দেখা যাবে যে, এই ধরনের বক্তব্য সত্য ছিল না।

প্রথমত, এমনকি হাদীস জালকরণ শুরু হওয়ার আগেই বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই স্কলাররা ইতিমধ্যেই হাদীস শাস্ত্রের অনেক মূলনীতি প্রণয়ন সম্পন্ন করেছিলেন। আর তাই তাদের জন্য হাদীস জালকারী এবং জালকৃত হাদীস সনাক্তকরণ খুবই সহজ ছিল।

দ্বিতীয়ত, এখানে যদিও এটা প্রমাণ করার অবকাশ নেই, তবুও এটা বলা আবশ্যক যে, জালকারীগণ যে সমস্ত হাদীস জাল করেছিল, সে সবের সংখ্যা যেমনটা মনে করা হয় তেমন বিশাল নয়।

www.pathagar.com

নীচের উক্তির মাধ্যমে প্রথমদিকের বছরগুলোয় সুন্নাহ সংরক্ষণের ব্যাপারে উপসংহার টানার এক চমৎকার দৃষ্টান্ত রেখেছেন **এম. জেড. সিদ্দিকী:**

"ইসলামের ইতিহাসের সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত মুহাম্মাদ (সা.)-এঁর কথা ও কাজ অর্থে হাদীস গোটা বিশ্ব জুড়ে মুসলিমদের নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞান ও পর্যবেক্ষণের একটা বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। মুহাম্মাদ (সা.)-এঁর জীবদ্দশায় তিনি যা বলেছেন, তা অনেক সাহাবী মুখস্থ রাখতে চেয়েছেন এবং তিনি যা করেছেন তা তাঁরা গভীর আগ্রহভরে লক্ষ্য করেছেন; আর তারপরে তাঁরা একে অপরের কাছে সেসব বর্ণনা করেছেন। তাঁদের কেউ কেউ সহীফা আকারে তিনি (সা.) যা বলেছিলেন, সে সব লিখে রেখেছিলেন এবং পরবর্তীকালে তাদের ছাত্রদের সে সব পড়ে শুনিয়েছেন, এবং পরবর্তীকালে সেগুলো তাদের পরিবার ও তাবেয়ীগণ কর্তৃক সংরক্ষিত হয়েছিল। মুহাম্মাদ (সা.)-এঁর মৃত্যুর পর যখন তাঁর সাহাবীরা বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়লেন, তখন তাদের কেউ কেউ এবং তাদের অনুসারীগণ কষ্টলব্ধ দীর্ঘ সফর করেছেন এবং দারিদ্র্য বরণ করে নিয়েছেন সেগুলোকে একত্রে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে। পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে হাদীস সংরক্ষণ এবং বিতরণের ব্যাপারে তাদের লক্ষণীয় কর্মকান্ড এক অদ্বিতীয় বিষয়.....। এবং তাদের সেই বিজ্ঞানের সৌন্দর্য আজ পর্যন্ত সাহিত্যের ইতিহাসে অদ্বিতীয় বলে পরিগণিত হয়।"[১৮২]

যে কেউ যখন বেশী বেশী করে হাদীস বিজ্ঞানে পড়াশুনা করবে, তখন সে আরও বেশী বেশী করে এই অনুভূতি সহকারে আশ্বস্ত হবে যে, নবী (সা.)-এঁর সুন্নাহ সুচারুরূপে সংরক্ষিত হয়েছে, ঠিক যেমনটা

---

[১৮২] দেখুন: Page#4-5, *Hadith Literature: Its OrDgin, Development, Special Features and Criticism* - M.Z. Siddiqi.

www.pathagar.com

আল্লাহ কুর'আনে অঙ্গীকার করেছেন। হাদীসের স্কলারগণ, যারা কিনা ঐ ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ এবং যারা এই বিজ্ঞানে পারদর্শিতা অর্জন করতে তাদের জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন, তারা যখন একটি হাদীসের নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে একমত হন, তখন সে ব্যাপারে বিতর্ক বা প্রশ্নের কোন অবকাশ থাকে না। তখন কেবল সেটার উপর বিশ্বাস করা এবং নিজের জীবনে সেটাকে যথাসম্ভব প্রয়োগ করাটাই বাকী থাকে।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

যে সুন্নাহ প্রত্যাখ্যান করে তার বেলায় বিধান

দ্বীনের এমন কিছু অস্বীকার করা যা কিনা নিশ্চিতভাবেই এর অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত

এই বইয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রমাণিত হয়েছে যার ভিতর রয়েছেঃ

১)সুন্নাহ্ হচ্ছে আল্লাহ্র কাছ থেকে আসা এক ধরনের ওহী।

২)সুন্নাহর অবস্থান ও মর্যাদা কুর'আনের বহু আয়াত দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে। কেউ যদি দাবী করে যে, সে কুর'আন অনুসরণ করছে, আর তথাপি যদি সে সুন্নাহ্ অনুসরণ করতে অস্বীকার করে, তাহলে সে কেবল কুর'আন অনুসরণ করার তার দাবীকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে।

৩)ইসলামী আইনের উৎস হিসেবে এবং দলিল হিসেবে সুন্নাহ্র মর্যাদা কুর'আনের সমপর্যায়ের এবং তা কুর'আনের সাথে হাতে হাত রেখে চলে।

৪)সুন্নাহ্র শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া খোদ কুর'আনকেই সঠিকভাবে বোঝার উপায় নেই।

৫)উপরে বর্ণিত এ সকল পয়েন্টগুলোই নবী (সা.)-এঁর সময় থেকেই প্রতিষ্ঠিত এবং এই বিষয়গুলোর ব্যাপারে স্কলাররা কোন ব্যতিক্রম ছাড়াই একমত।

www.pathagar.com

সুন্নাহ্‌র কর্তৃত্ব ও মর্যাদার ব্যাপারে পরিস্কার সাক্ষ্য-প্রমাণ, সুন্নাহকে সেই সমস্ত বিষয়গুলোর মর্যাদা দান করে, যেগুলো প্রশ্নাতীতভাবে দ্বীন ইসলামের একটা অংশ গঠন করে এবং যেগুলো সম্পর্কে প্রত্যেকের জ্ঞান থাকাটা অপরিহার্য। অপর কথায় বলতে গেলে, স্কলারগণ এবং জনসাধারণ সবাই এই বিষয়গুলো সম্বন্ধে একই রকম সচেতন হওয়া উচিত। অবশ্য একটা আদর্শ ইসলামী পরিবেশে বড় হলে, যে কারো দ্বীনের এই অত্যাবশ্যকীয় ব্যাপারগুলো না মেনে উপায় নেই। **দ্বীনের এই অংশগুলোর যে কোনটি অস্বীকার করা হচ্ছে কুফর ও রিদ্দার সমতুল্য। ইবন তাইমিয়্যা** বলেন,

"পরিস্কার ও নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত অবশ্যকরণীয় এবং পরিস্কার ও নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত বর্জনীয় বিষয়গুলোতে বিশ্বাস স্থাপন হচ্ছে ঈমানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তিগুলোর এবং দ্বীনের মূলনীতিগুলোর একটি। যে সেগুলো অস্বীকার করে সে [স্কলারদের ইজমা মতে] একজন কাফির।"[১৮৩]

একইভাবে **ইমাম নববী** বলেছেন,

"আজ দ্বীন ইসলাম ছড়িয়ে পড়েছে। মুসলিমদের ভিতর যাকাতের বাধ্যবাধকতার জ্ঞান এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে, জনসাধারণ ও বিশেষজ্ঞগণ উভয় দলই সে সম্বন্ধে জানেন, বরং বলা যায় স্কলারগণ এবং অজ্ঞ ব্যক্তিগণ সকলেই এ ব্যাপারে সচেতন। কোনরূপ ব্যাখ্যার কারণে কেউ কেউ তা অস্বীকার করতে চাইলে তাকে ক্ষমা করা হয় না। মুসলিম সম্প্রদায় যেটার ব্যাপারে একমত, দ্বীনের এমন কোন দিক যদি কেউ অস্বীকার করে, তবে তার বেলায়ও একই বিধান প্রযোজ্য - যদি সেই জ্ঞান ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়ে থাকে। এরকম বিষয়গুলোর ভেতর দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, রমাদান মাসের

---

[১৮৩] দেখুন: Page#497, Vol.12, *Majmooat al-Fataawa Shaikh al-Islaam ibn Taimiyyah* - Ahmad ibn Taimiyyah.

www.pathagar.com

রোযা, সংসর্গ পরবর্তী গোসল, ব্যভিচারের নিষেধাজ্ঞা, মদের উপর নিষেধাজ্ঞা, নিকটাত্মীয়কে বিয়ের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা...... ইত্যাদি থাকবে। কিন্তু এটা যদি কেবল বিশেষজ্ঞদের ইজমার ব্যাপার হয়ে থাকে, যেমন একজন মেয়েলোক ও তার ফুফু বা খালার সাথে বিবাহিত হওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা, একজন খুনীর যে মীরাসের অধিকার নেই (যে খুন হয়েছে তার রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে), এই বাস্তবতা যে একজন দাদী ১/৬ উত্তরাধিকার লাভ করে এবং এই ধরনের আরো বিষয়সমূহ – কেউ যদি এর একটিকে অস্বীকার করে, তবে তাকে কাফির বলে গণ্য করা হয় না। বাস্তবে, 'যতক্ষণ না তাকে ব্যাপারগুলো সম্বন্ধে জ্ঞানদান করা হচ্ছে ততক্ষণ' তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। কেননা এই ধরনের বিষয়গুলোর জ্ঞান জনসাধারণের ভিতর ছড়িয়ে দেওয়া হয় নি।"[১৮৪]

অন্যান্য অনেক স্কলারদের থেকে এই ধরনের উদ্ধৃতি দেওয়া যাবে।[১৮৫]

স্কলারদের সিদ্ধান্ত অনেকটা এই রকম যে, যা কিছু শক্তভাবে ও প্রশ্নাতীতভাবে দ্বীন ইসলামের অংশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত, তা যে অস্বীকার করবে সে একজন কাফির এবং এই সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত। বাস্তবে যখন কেউ এই ধরনের কিছু অস্বীকার করে – অর্থাৎ সুন্নাহর অবস্থান ও মর্যাদা অথবা দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এ ধরনের কিছু – তখন সে আসলে খোদ কুর'আন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ব্যাপারে নাযিলকৃত কুর'আনের সকল আয়াতসমূহ অস্বীকার করা ছাড়া আর কিছুই করছে না। কুর'আনকে অস্বীকার করা এবং মিথ্যা মনে করা স্পষ্টতই কুফর ও রিদ্দা। দুর্ভাগ্যবশত যে সব মুসলিমের পশ্চিমা ইহুদী ও খৃস্টান অতীত রয়েছে, তারা এ বিষয়ে ঢিলেঢালা হতে পারেন।

---

[১৮৪] দেখুন: Page#244, *Nawaaqidh al-Islaam al-Qauliyyah wa al-Amaliyyah* - Abdul Azeez al-Abdul Lateef-এ উদ্ধৃত।

[১৮৫] দেখুন: Page#242, *Nawaaqidh al-Islaam al-Qauliyyah wa al-Amaliyyah* - Abdul Azeez al-Abdul Lateef.

www.pathagar.com

উদাহরণস্বরূপ এ ব্যাপারটা দুর্লভ নয় যে, একজন খৃস্টান বাইবেল অথবা খৃস্টান মতবাদের যতটুকু ইচ্ছা ততটুকু প্রত্যাখ্যান করবে এবং তা সত্ত্বেও একই সময়ে সে নিজেকে একজন পরিপূর্ণ ও সৎকর্মশীল খৃস্টানই মনে করবে। ইসলামের বেলায় এই মনোভাব গ্রহণযোগ্য নয়। একবার যখন কেউ ইসলাম গ্রহণ করে, তখন তাকে অবশ্যই গোটা কুর'আন ও সুন্নাহকে নিরঙ্কুশ সত্য বলে গ্রহণ করতে হবে, সন্দেহাতীত ভাবে।

এ ছাড়া নিশ্চিতভাবে যা কিছু দ্বীন ইসলামের একটা অংশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত, তার যে কোন কিছুতে সন্দেহ প্রকাশ করা হচ্ছে অবিশ্বাস বা কুফরের সমতুল্য। এই সিদ্ধান্ত কুর'আনের আয়াতসমূহ থেকে প্রমাণ করা যায়। যে কারো উচিত সুনির্দিষ্টভাবে কুর'আনের নিম্নলিখিত আয়াতগুলো খেয়াল করা:

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَـٰبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ
ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْىٌ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ
أَشَدِّ ٱلْعَذَابِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَـٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾

"তাহলে কি তোমরা কিতাবখানির একটি অংশ বিশ্বাস কর এবং বাকীটুকু অস্বীকার কর? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এরকম করে, তাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে হীনতা, এবং কিয়ামতের দিন তারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে। তারা যা করে আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে অনবহিত নন।" (সূরা বাকারা, ২:৮৫)

যাদেরকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে তাদের বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ বলেন:

www.pathagar.com

فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ ﴿٣١﴾ وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿٣٢﴾

"সে সাদাকা দেয় নি এবং সালাত আদায় করে নি। বরং সে সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।" (সূরা ক্বিয়ামা, ৭৫:৩১-৩২)

আল্লাহ্ আরো বলেন:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِـَٔايَٰتِهِۦٓ ۗ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٢١﴾

"তার চেয়ে আর কে অধিকতর জুলুম করে, যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁর নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে? জালেমগণ কখনোই সফলকাম হয় না।" (আল আনআম, ৬:২১)

অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন:

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا وَٱسْتَكْبَرُوا۟ عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَٰبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِى سَمِّ ٱلْخِيَاطِ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٤٠﴾

"যারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করে এবং সে সম্বন্ধে অহংকার করে, তাদের জন্য আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবে না এবং তারা জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে না – যতক্ষণ না সূঁচের ছিদ্রপথে উট প্রবেশ করে। অপরাধীদেরকে আমরা এভাবেই প্রতিফল দেব।" (আ'রাফ, ৭:৪০)

এরকম আরো বহু আয়াত যদিও আছে, সবশেষে আমরা আরো একটি আয়াত উল্লেখ করবো যেখানে আল্লাহ্ বলেন:

www.pathagar.com

وَمَا يَجْحَدُ بِـَٔايَـٰتِنَآ إِلَّا ٱلْكَـٰفِرُونَ ﴿٤٧﴾

"..... কাফিরগণ ছাড়া কেউ আমাদের নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে না।" (আনকাবুত, ২৯:৪৭)

যে ব্যক্তি সুন্নাহ প্রত্যাখ্যান করে তার ব্যাপারে বিভিন্ন স্কলারদের বক্তব্য

একজন মুসলিমকে একজন অমুসলিম থেকে পার্থক্যকারী বিষয়সমূহ নিয়ে ইসলামের যেসব স্কলার আলোচনা করেছেন, তারা এ ব্যাপারে একমত যে, নবীর (সা.) সুন্নাহকে নিখুঁত উদাহরণ বলে মেনে নেয়ার বাধ্যবাধকতাকে যে অস্বীকার করে, সে মুরতাদ হয়ে যায়। ইবন হাজম বলেন: *"একজন ব্যক্তি যদি বলে, 'আমরা কেবল কুর'আনে যা পাই তাই অনুসরণ করি' তবে এই (মুসলিম) জাতির ইজমা মতে সে একজন কাফির হয়ে গেছে।"*[১৮৬]

আল-শাওকানী বলেন: *"সুন্নাহর অবস্থান এবং আইনের এক স্বনির্ভর উৎস হিসাবে এর মর্যাদা হচ্ছে এমন এক জ্ঞানের অংশ যা প্রত্যেক মুসলিমেরই জানা রয়েছে। এবং ইসলামের সাথে যাদের সম্পর্ক নেই তারা ছাড়া আর কেউই এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করে না।"*[১৮৭]

যে ব্যক্তি সুন্নাহ প্রত্যাখ্যান করে এবং কেবল কুর'আন অনুযায়ী জীবন যাপন করে, তার ব্যাপারে শায়খ আল দাওসিরিকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বলেন:

".....এটা হচ্ছে যিন্দিক এবং উৎপথগামীদের দাবী, যারা কিনা ঈমানের অর্ধেক অস্বীকার করে এবং তারা কুর'আনকে সম্মান দেখাচ্ছে বলে মানুষকে বোকা বানায়। তারা হচ্ছে মিথ্যাবাদী, কেননা কুর'আন নিশ্চয়ই রাসূলের (সা.) প্রতি আনুগত্যের আদেশ দেয় - আর যা কিনা কেবল সুন্নাহ অনুসরণের মাধ্যমেই করা সম্ভব..... । এ

---

[১৮৬] দেখুন: Page#32, *Maalim al-Sunnah al-Nabawiyya* - Abdul Rahmaan Itr-এ উদ্ধৃত।
[১৮৭] দেখুন: Page#33, *Irshaad al-Fahool* - Muhammad ibn Ali al-Shaukaani.

www.pathagar.com

ব্যাপারে আর কারো কাছ থেকেই কোন ভিন্নমত নেই, কেবল তারা ছাড়া যাদের সাথে দ্বীন ইসলামের কোন ধরনের কোন সম্পর্ক নেই।"[১৮৮]

আবদুল আযীয বিন বায লিখেছেন: *"সুন্নাহ অস্বীকার করা এবং সেটাকে প্রযোজ্য নয় বলে মনে করা হচ্ছে কুফর ও রিদ্দার একটা কাজ, কেননা যে কেউ যে সুন্নাহ অস্বীকার করে, সে আসলে কুর'আনই অস্বীকার করে। আর যে কেউ (কুর'আন ও সুন্নাহর) যে কোন একটি অথবা দুটোই অস্বীকার করে, সে আসলে সকল মাযহাবের মত অনুযায়ী কাফির।"*[১৮৯]

আস-সুয়ূতী বলেন: *"নবী (সা.)-এঁর হাদীস, যা তাঁর কোন একটি কথা বা কাজের বর্ণনা (এবং যা সহীহ হবার শর্তগুলো পূরণ করে) - সেটাকে দলিল বলে গ্রহণ করতে যে অস্বীকার করে, তোমাদের জানা উচিত, এবং আল্লাহ্ তোমাদের সকলের উপর রহম করুন, যে সে একজন কাফির হয়ে গেছে। এবং (কিয়ামতের দিন) তাকে ইহুদী ও খৃস্টানদের সাথে অথবা আল্লাহ্ তাকে অন্য যে দলের সাথে ইচ্ছা করেন, সে দলের সাথে একত্রিত করবেন।"*[১৯০]

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে – যে সুন্নাহ অস্বীকার করে তার অবিশ্বাস বা কুফর যে কেবল কিছু মানুষ বা স্কলারদের অনুসিদ্ধান্ত, আর তাই সেটা নিয়ে বিতর্ক চলতে পারে, ব্যাপারটা কিন্তু সেরকম নয়, -অথবা- ব্যাপারটা কিন্তু এমনও নয় যে, তা কেবলই স্কলারদের ইজমা, যা হলে অবশ্য সেটার বিরোধিতা করা আরো কঠিন হতো।

---

[১৮৮] দেখুন: Page#62-63, *Al-Ajwiba al-Mufeedah limubimmat al-Aqeedah* - Abdul Rahmaan al-Dausiri.

[১৮৯] দেখুন: Page#13-14, *Wujoob al-Amal bisunnat al-Rasool wa kufr man inkaraha* - Abdul Azeez Bin Baaz.

[১৯০] দেখুন: Page#30, *Wujoob al-Amal bisunnat al-Rasool wa kufr man inkaraha* - Abdul Azeez Bin Baaz. (Miftah al-Jannah fi al-Ihtijaaj bi al-Sunnah থেকে উদ্ধৃতি)

www.pathagar.com

বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, এমন বেশ কতগুলো আয়াত যেগুলো আমরা ইতিমধ্যেই উপস্থাপন করেছি, তা থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, যে সুন্নাহকে দলিল হিসাবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে (বা সুন্নাহর কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে) তার অন্তর ঈমানশূন্য এবং সে অবিশ্বাসীদের একজন। বিশেষভাবে যে কারো উচিত পূর্বে আলোচিত নিম্নলিখিত আয়াতগুলো খেয়াল করে দেখা[১৯১]:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

"কিন্তু না, তোমার রবের শপথ, তারা ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকার বিশ্বাস করে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের বিচার-ফয়সালার ভার তোমার উপর ন্যস্ত করে না, এবং তুমি যা ফয়সালা দাও সে ব্যাপারে মনে কোন অসন্তোষ বোধ করে না এবং পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে।" (সূরা নিসা, ৪:৬৫)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿٦١﴾

"যখন তাদেরকে বলা হয় 'আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার কাছে আস এবং রাসূলের কাছে আস' তুমি তখন মুনাফিকদের বিরক্তভাবে তোমার দিক থেকে পিঠ ফিরিয়ে নিতে দেখ।" (সূরা নিসা, ৪:৬১)

---

[১৯১] দেখুন: Page#282-283, *Hujiyyat al-Sunnah* - Al-Hussain Shawaat

www.pathagar.com

قُلْ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٣٢﴾

“বলুন, আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য কর। আর তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও তবে জেনে রাখ যে আল্লাহ্ কাফিরদের ভালবাসেন না।” (আলে ইমরান, ৩:৩২)

বাস্তবে গোটা সুন্নাহকে অস্বীকার করার মাঝেই এই কুফর বা অবিশ্বাস সীমাবদ্ধ নয়, বরং রাসূল (সা.)-এঁর বরাত দিয়ে, যে কেউ যা কিছু শোনে, সে যদি নিশ্চিত হয় যে সত্যিই তা রাসূল(সা.)-এঁর কাছ থেকে এসেছে, তবে সেটা অস্বীকার করার নামই কুফর। **সুলায়মান ইবন সাহমান** বলেন,

“স্কলারদের ভিতর এ ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য নেই যে, কোন ব্যক্তি যদি কিছু কিছু বিষয়ে নবীকে (সা.) বিশ্বাস করে এবং কোন বিষয়ে নবীকে (সা.) অস্বীকার করে, তবে সে ইসলামে প্রবেশ করে না; তবে সে হচ্ছে তার মত (ঐ ব্যক্তির মত) যে কোন ফরজ কাজ অস্বীকার করে..... ।” **ইবন বাত্তাহ** বলেন, ***“রাসূল (সা.) যা নিয়ে এসেছেন, কোন ব্যক্তি যদি তার একটি ছাড়া সবকিছুতে বিশ্বাস করে এবং সেই একটিকে প্রত্যাখ্যান করে, তবে সে সকল স্কলারের মতানুযায়ী একজন কাফির।”***[১৯২]

উপরন্তু নবীর (সা.) কোন বক্তব্য সে বিশ্বাস করতে চায়, আর কোন বক্তব্য সে বিশ্বাস করতে চায় না এ ব্যাপারে নিজস্ব খেয়াল খুশির স্বাধীনতা তার নেই। নবীর (সা.) উপর যে কারো বিশ্বাস এই দাবী রাখে যে, সে নবীর (সা.) বলা সবকিছুকে বিশ্বাস করবে।

---

[১৯২] দেখুন: Page#250, *Al-Mukhtasaar fi Ilm Rijaal al-Athar* - Abdul Wahaab Abdul Lateef -এ উদ্ধৃত।

www.pathagar.com

আমরা যা আলোচনা করছি তা যেন কেউ ভুল না বোঝে এবং তার যেন অপপ্রয়োগ না হয় সেজন্য তিনটি বিষয় উল্লেখ করার রয়েছে। **প্রথমত**, একটা হাদীস সহীহ্ কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা এবং একটা হাদীসকে সহীহ্ জেনেও তার বক্তব্যের সত্যতাকে অস্বীকার করার ভিতর তফাত রয়েছে। উপরে বর্ণিত দ্বিতীয় ব্যাপারটা হচ্ছে অনেকটা এরকম যে কেউ বলছে, *"আমি জানি নবী (সা.) বলেছেন, কিন্তু আমি তা বিশ্বাসযোগ্য মনে করি না [অর্থাৎ আমি তা ঠিক মনে করি না]।"* এটাই হচ্ছে সালমান ও ইবন বাত্তাহ্‌র মত স্কলাররা যেটাকে অবিশ্বাস বলে বর্ণনা করেছেন। পূর্ববর্তী উদাহরণ যেখানে কেউ একটা হাদীস সহীহ্ কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে, সেটা একটা অবিশ্বাস বা কুফরের কাজ নাও হতে পারে – **অবশ্য তা নির্ভর করবে ঐ নির্দিষ্ট হাদীসটি কতটুকু প্রতিষ্ঠিত ও সর্বজনবিদিত তার উপর**। সে যাই হোক, **হাদীস সহীহ্ কিনা সেটা বাছবিচার করা হচ্ছে হাদীস বিশেষজ্ঞদের কাজ**। আলেম বা বিশেষজ্ঞ নন এমন একজন মানুষের নিজের থেকে হাদীসের বাছ-বিচার করার স্বাধীনতা নেই। **দ্বিতীয়ত**, কুর'আনে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও, সুন্নাহ্ সম্বন্ধে কারো অজ্ঞতা ক্ষমা করা যেতে পারে; যেমনটা একজন নতুন ধর্মান্তরিত ব্যক্তির বেলায় ঘটতে পারে, যে কুর'আনের দলিল প্রমাণের সংস্পর্শে আসেনি অথবা সে কেবল ঐ ধরনের লোকের সংস্পর্শে এসেছে যারা সুন্নাহ্ অস্বীকার করে। **একবার যখন তাকে প্রমাণ দেখানো হবে, তখন তার সে সব বিশ্বাস করা ছাড়া কোন উপায় থাকবে না**। **সবশেষে**, কাউকে কাফির ঘোষণা করা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। ব্যাপারটিকে হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয়। যে কাউকে কাফির ঘোষণা করার আগে এমন বহু শর্ত আছে যেগুলিকে পূরণ করতে হবে।

এখানে আর একটি বিষয় ভুললে চলবে না যে, তওবার দরজা সবসময় খোলা রয়েছে। যে কেউ যখন বিশ্বস্ততার সাথে ও অনুশোচনার সাথে তওবা করে, আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আসে, আল্লাহ্

www.pathagar.com

সেটা খুবই পছন্দ করেন। কেউ সুন্নাহ্ অস্বীকার করার পর্যায়ে অথবা নবীর কোন একটি সুনির্দিষ্ট হাদীস অস্বীকারের পর্যায়ে কেন পতিত হতে পারে, তার বহুবিধ কারণ সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ্ই অবগত – বিশেষত আজকের এই দিনক্ষণে যখন সুন্নাহ্র উপর অবিশ্বাসীদের পক্ষ থেকে যেমন আক্রমণ আসছে, তেমনি দুঃখজনকভাবে খোদ মুসলমানদের পক্ষ থেকেই আক্রমণ করা হচ্ছে। ব্যাপারটা এরকমও হতে পারে যে, একজন মুসলিমের "সুন্নাহর অবস্থান ও মর্যাদা" সম্পর্কে পড়ার সৌভাগ্যই কখনো হয়নি। ব্যাপারটা এরকমও হতে পারে যে, যারা সুন্নাহ্ অনুসরণ করতে অস্বীকার করে, অথবা যারা ইসলামে এর মর্যাদা ও কর্তৃত্ব অস্বীকার করে – একজন মুসলিম কেবল তাদের দ্বারাই পরিবেষ্টিত থেকেছে। বাস্তবে ব্যাপারটা যাই হোক না কেন, আল্লাহ্র কাছে তওবা করা এবং সুন্নাহ্র সাথে লেগে থাকার সংকল্প এবং বিশ্বস্ত নিয়ত, যে কারো অতীতের সমস্ত গুনাহ্ মুছে দিতে পারে, এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার ও জান্নাতে প্রবেশ করার সৌভাগ্য এনে দিতে পারে।

উপসংহার

ইসলামে সুন্নাহর অবস্থানকে অস্বীকার করা, এটা অস্বীকার করা যে, নবী (সা.) যা বলেছেন তা বিশ্বাস করাটা আমাদের জন্য ফরজ, এটা অস্বীকার করা যে, তাঁর আদেশ ও নিষেধ আমাদের জন্য শিরোধার্য অথবা এটা অস্বীকার করা যে, তিনিই হচ্ছেন সেই উদাহরণ যা প্রতিটি মুসলিমকে অনুসরণ করতে হবে – এ সবই হচ্ছে কুফর বা অবিশ্বাসের কাজ। পরিস্কার প্রমাণ দেখানোর পরে বা ব্যাখ্যা করার পরেও, যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করে বা জেনেশুনে ঐ ধরনের বিশ্বাস [সুন্নাহর মর্যাদা অস্বীকার করার মত বিশ্বাস] ধারণ করা অব্যাহত রাখে, তবে সে ইসলামের গন্ডীর বাইরে চলে যায় বরং সে একজন কাফির। এই পৃথিবীতে তাকে একজন অবিশ্বাসী বা কাফির বলে গণ্য

www.pathagar.com

করতে হবে। একজন মু'মিন ভাইয়ের প্রতি যে কারো যে ভালবাসা ও সম্মান দেখানোর কথা, সে সেটা পাবার যোগ্য নয়। মৃত্যুর পূর্বে সে যদি তওবা না করে, তবে তার সকল সৎকর্ম তার কোন কাজে আসবে না এবং আখিরাতে সে চিরতরে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে।

এর অর্থ এই নয় যে, আমরা তড়িঘড়ি করে অন্যদের কাফির বলে সম্বোধন করবো। যে কাউকে এ ধরনের ব্যাপারে সবসময়ে সতর্ক থাকা উচিত এবং নিশ্চিত করা উচিত যে, যারা দ্বীনবিরোধী বিশ্বাস পোষণ করে, তাদের কাছে পরিস্কার দলিল উপস্থাপন করা হয়েছে। (বাস্তবে সবচেয়ে ভাল হচ্ছে এ ধরনের ব্যাপারগুলো দ্বীনের ব্যাপারে যাদের গভীর জ্ঞান রয়েছে, সেই ধরনের স্কলারদের হাতে ছেড়ে দেয়া) তবে কুর'আন ও সুন্নাহর দলিলসমূহ স্পষ্ট। সেগুলো অবশ্যই মেনে চলতে হবে এবং সেগুলো অবশ্যই প্রকাশ্যে বলতে হবে। এ ধরনের ব্যাপারে আবেগের কোন স্থান নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত না কুর'আন এবং সুন্নাহর দলিল থেকে পরিস্কার ও সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে যে, ঐরকম একজন ব্যক্তিকে কাফির বলে গণ্য করতে হবে এবং এই রায়ের পথে কোন অন্তরায় নেই, ততক্ষণ পর্যন্ত আরেকজন ব্যক্তিকে কাফির ঘোষণা করার অধিকার কারো নেই। একইভাবে কারো উচিত নয়, অপর কোন ব্যক্তিকে মুসলিম বলে গণ্য করা, যতক্ষণ কুর'আন ও সুন্নাহ্র ভিত্তিতে তা প্রমাণিত হয় না যে ঐরকম একজন ব্যক্তি মুসলিম। **পরিস্কার এবং সুনির্দিষ্ট প্রমাণ উপস্থাপন করার পরও যদি কোন ব্যক্তি সুন্নাহ বিশ্বাস করার ও তা অনুসরণ করার বাধ্যবাধকতাকে অস্বীকার করে, তবে সে একজন মুসলিম হিসাবে গণ্য হবার অথবা সুবিধা পাবার অধিকার হারাবে।** এটাই হচ্ছে কুর'আন, সুন্নাহ ও স্কলারদের ইজমার ঘোষণা।

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

সুন্নাহর পথই হচ্ছে ইসলামের পথ

আল্লাহ ছাড়া কেউ ইবাদত লাভের যোগ্য নয় এবং মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহ্‌র রাসূল - এই সাক্ষ্য দিয়ে একজন মানুষ ইসলামে প্রবেশ করে। যখন সে ঈমানের সাক্ষ্য দেয়, তখন সে এর সত্যতাকে সত্যায়িত করে। উপরন্তু সে এই সংকল্পবদ্ধ হচ্ছে যে, তার সাধ্যানুযায়ী সে এই ঘোষণার চাহিদাগুলো পূরণ করে চলবে।

বাস্তবে ঈমানের এই ঘোষণার প্রথমাংশের অর্থ হচ্ছে, এই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটি আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কোন কিছুকে বা কাউকে একজন ইলাহ্‌ বা ইবাদতের বস্তু হিসাবে গ্রহণ করবে না। আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট রাখার স্বার্থেই তার সকল কর্মকান্ড পরিচালিত হবে। দ্বিতীয় অংশে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটি আল্লাহ্‌র ইবাদত করার সঠিক পন্থা হিসাবে নবী মুহাম্মাদের (সা.) দেখিয়ে দেওয়া পদ্ধতিকে গ্রহণ করেন। যদি কোন ব্যক্তি নবীর (সা.) নির্ধারিত মানদন্ডকে মেনে নিতে অস্বীকার করে, তবে তার কর্মকান্ড আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না – সে যতই দাবী করুক না কেন যে, সে এক আল্লাহ্‌য় বিশ্বাস করে, তবুও।

ইমাম নববী বলেন,

"এটা স্পষ্ট যে, কোন মানুষ যদি আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) যে পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়ে গেছেন, সেই অনুযায়ী কোন কাজ সম্পাদন না করে থাকে, তবে আল্লাহ্‌ তার সেই কাজ গ্রহণ করেন না - তা একটা বক্তব্যই হোক অথবা কোন শারীরিক কাজই হোক। একমাত্র ঐ সমস্ত কাজগুলিই আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে, যেগুলোর বেলায় কর্তা সেগুলো কেবল আল্লাহ্‌র জন্য করেছেন এবং রাসূল (সা.)-কে

www.pathagar.com

*অনুসরণ করেছেন - সিরাতুল মুস্তাক্বীমের পথে, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পথে, তাঁর দেয়া দিকনির্দেশনা অনুযায়ী। আল্লাহ্‌ বলেছেন, '**নিশ্চয়ই (হে মুহাম্মাদ) তুমি মানুষকে সরল পথ দেখাও – সেই আল্লাহ্‌র পথ, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার সবই যাঁর মালিকানাধীন। লক্ষ্য কর, কিভাবে সকল কর্মকান্ড আল্লাহর দিকে ফিরে যায়।**' (সূরা আশ-শূরা, ৪২:৫২-৫৩) এবং আল্লাহ্‌ আরো বলেছেন, '**তাদেরকে এ ছাড়া কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে, সালাত কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে। এটাই সঠিক ধর্ম।**' (সূরা বাইয়্যিনাহ, ৯৮:৫)"* [১৯৩]

সুতরাং, যে কোন মানুষের ঈমানের ঘোষণার নিহিতার্থের একটা অংশই হচ্ছে এটা যে, সে রাসূল (সা.) কে অনুকরণ ও অনুসরণ করবে। **আসলে নবীর (সা.) সুন্নাহ্‌ই হচ্ছে ইসলাম। এটা এজন্য নয় যে এর কুর'আনের প্রয়োজন নেই। বরং এইজন্য যে, এটাই হচ্ছে কুর'আনের শিক্ষাগুলোর বাস্তব প্রয়োগ।**

এছাড়া ইসলামের এই পথ, সুন্নাহর পথ - এটাই হচ্ছে ইসলামের একমাত্র বৈধ ও সঠিক বহিঃপ্রকাশ। ব্যাপারটা এরকম নয় যে, আমাদের সামনে নানা পথ খোলা রয়েছে এবং তার সব কয়টিই আমাদের আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে নিয়ে যায়। নবী (সা.) দেখিয়ে দিয়ে গেছেন যে, ব্যাপারটা সেরকম নয় যেরকমটা আমরা নিম্নলিখিত হাদীসে দেখতে পাই:

*আব্দুল্লাহ্‌ আল মাসউদ (রা.)-এঁর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, "**আল্লাহর রাসূল (সা.) আমাদের উদ্দেশ্যে একটি সরল রেখা আঁকলেন। তারপর তিনি বললেন, 'এটা হচ্ছে আল্লাহর রাস্তা।'** তারপর তিনি ঐ রেখার বাঁ পাশে এবং ডান পাশে রেখাসমূহ আঁকলেন। তারপর তিনি*

---

[১৯৩] দেখুন: Page#85, *Sharh Matin al-Arbaeen al-Nawawiya* - Yahya al-Nawawi.

www.pathagar.com

বললেন, 'এগুলো হচ্ছে বিচ্যুত পথ। এর প্রতিটিতে একটি শয়তান রয়েছে, যে সেই পথের দিকে ডাকে।' তারপর তিনি তিলাওয়াত করেন,

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِي مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦ ﴿١٥٣﴾

'নিশ্চয়ই এটাই হচ্ছে আমার সরল পথ। এটা অনুসরণ কর এবং অন্য পথগুলো অনুসরণ করো না। সেগুলো (অন্য পথগুলো) তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে।' *(সূরা আল-আনআম, ৬:১৫৩)।*'[১৯৪]

আল্লাহ্‌র সিরাতুল মুস্তাক্বীম হচ্ছে নিঃসন্দেহে নবীর (সা.) সুন্নাহর পথ। নবী (সা.) সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন

فَٱسْتَمْسِكْ بِٱلَّذِىٓ أُوحِىَ إِلَيْكَ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٤٣﴾

"তোমার কাছে যে ওহী পাঠানো হয়েছে তা আঁকড়ে ধরো, নিশ্চয়ই তুমি সিরাতুল মুস্তাক্বীম এর উপরে রয়েছো।" (সূরা যুখরুফ, ৪৩:৪৩)

নবীর (সা.) দিক নির্দেশনা সম্বন্ধে আল্লাহ্ আরও বলেন,

---

[১৯৪] আহমাদ ও ইবন মাজাহ্ - আলবানীর মতে সহীহ্। এই হাদীস বুঝতে গেলে ভাবতে হবে যে, মাঝখানের মধ্যপন্থার সরলপথ থেকে বেরিয়ে গিয়ে যে কেউ ডানে অথবা বাঁয়ের দু'টো প্রান্তিক অবস্থানের দিকে চলে যেতে পারে: অতি উৎসাহী কেউ [আল্লাহ্‌র রাসূলের (সা.) চেয়েও] বেশী বেশী ইবাদতের কাজ করতে গিয়ে যেমন সুন্নাহ্ তথা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হতে পারে, তেমনি করণীয় অবহেলা করেও কেউ সুন্নাহ তথা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হতে পারে।

www.pathagar.com

وَإِنَّكَ لَتَهْدِيٓ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ ﴿٥٢﴾

"তুমি নিশ্চয়ই এমন পথের নির্দেশনা দাও যা কিনা সরল।" (সূরা শূরা, ৪২:৫২)

কেউ যদি এমনটা দাবী করে যে, নবীর (সা.) সুন্নাহ্ সিরাতুল মুস্তাক্বীম বা সরল পথ নয়, তবে সে আল্লাহ্ কুর'আনে যা বলেছেন, তার বিরোধিতা করছে। এছাড়া কেউ যদি এমনটাও দাবী করে যে, তাঁর পথ হচ্ছে এমন বহু পথের একটি, যেগুলো অনুসরণ করার ব্যাপারে একজন মুসলিমের স্বাধীনতা রয়েছে, তবে সে আবারও কুর'আনে যা বলা হয়েছে তার বিরোধিতা করছে। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের এবং জান্নাতের কেবল একটি এবং একটিই শুদ্ধ পথ রয়েছে। আর সেটা হচ্ছে সুন্নাহর পথ – কুর'আনের বাস্তব ও প্রায়োগিক রূপ।

রাসূল (সা.) বলেছেন, ***"ইসরাইলী গোত্রগুলো ৭২টি ধর্মীয় ফিরকায় বিভক্ত হয়েছিল, আমার উম্মাহ ৭৩টি ফিরকায় বিভক্ত হবে। সেসবের সবকয়টি জাহান্নামে যাবে কেবল একটি ছাড়া।"*** তারা বললেন, ***"সেটি কোনটি, হে আল্লাহর রাসূল?"*** তিনি উত্তর দিলেন, ***"যার উপর আমি এবং আমার সাহাবীরা রয়েছি (সেটা যারা অনুসরণ করে তারা)।"***[১৯৫]

নবী (সা.) তথাপি সেই অন্যান্য ফিরকাগুলোকে তাঁর উম্মাহর অংশ বলেই বর্ণনা করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, সেই অন্যান্য দলগুলো ইসলামের বাইরে অবস্থিত নয়। যদিও এ হাদীস থেকে এটা বোঝা যাচ্ছে যে, নবী (সা.) যে পরিস্কার সরল পথ প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছিলেন এবং যা তিনি তাঁর সাহাবীদের কাছে রেখে গিয়েছিলেন তা থেকে বিচ্যুত হবার জন্য ঐ সমস্ত দলগুলোকে জাহান্নামের শাস্তির একটা অংশ ভোগ করতে হবে – যতক্ষণ না আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা

---

[১৯৫] তিরমিযী - আলবানীর মতে হাসান।

www.pathagar.com

করে দেন। সুন্নাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত হবার ভয়ঙ্কর পরিণতিতেই জাহান্নামের আগুনের এই শাস্তি।

এই হাদীসে নবী (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, তিনি যে পথ প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন এবং যা তাঁর সাহাবীরা বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করেছিলেন, সেই পথ থেকে লোকে বিচ্যুত হবে। তবু একই সময় অপর বেশ কয়েকটি হাদীসে নবী (সা.) এই সুসংবাদও দিয়ে গেছেন যে, মুসলিমদের একটি অংশ সবসময় সেই সঠিক পথের উপর থাকবে। উদাহরণস্বরূপ একটি হাদীসে নবী (সা.) বলেছেন, ***"আমার উম্মাহর একটি অংশ সত্যের উপর থেকে বিজয়ী হয়ে থাকবে। এবং যারা তাদের ত্যাগ করবে, তারা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (তারা সে অবস্থার উপরই অব্যাহতভাবে থাকবে) যতক্ষণ না আদেশ আসে এবং তখনও তারা সেই অবস্থাতেই থাকবে।"*** (মুসলিম)

প্রত্যেক মুসলিমের উচিত মনে এই আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা যে, সে যেন ঐ দলের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে - যারা কিনা নাজাতপ্রাপ্ত দল এবং যারা শেষ দিবস পর্যন্ত সত্যের অনুসরণ করতে থাকবে। প্রথমেই প্রশ্ন আসবে, তাহলে কিভাবে সেই দলকে সনাক্ত করা যাবে। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে আমাদেরকে উপরে উল্লিখিত হাদীসসমূহ এবং আয়াতসমূহের শরণাপন্ন হতে হবে। এই দল হচ্ছে নিশ্চিতভাবে সেই দল, যেটা সুন্নাহর সাথে লেগে থাকবে। এই প্রশ্নের উত্তর যদি অন্য কিছু হয়, তাহলে তার নিহিতার্থ দাঁড়াবে এই যে, নবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীগণ ঐ নাজাতপ্রাপ্ত দল এবং ঐ দল যা কিনা সত্যের পক্ষে যুদ্ধ করতে থাকবে তার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। কুর'আন ও সুন্নাহর আলোকে এই উত্তর হচ্ছে এক অকল্পনীয় ব্যাপার।

তাহলে সেই নাজাতপ্রাপ্ত দল এবং সেই দল যেটা অব্যাহতভাবে বিজয়ী হতে থাকবে, সেটা যারা স্থির ও অবিচলভাবে সুন্নাহ ও আল্লাহ্‌র রাসূলের (সা.) হাদীস আঁকড়ে থাকবে তাদের দল ছাড়া অন্য

www.pathagar.com

কোনটি হতে পারে না। নাজাতপ্রাপ্ত দল সংক্রান্ত হাদীস লিপিবদ্ধ করার পরে আত-তিরমিজী লিপিবদ্ধ করেন যে, **আলী ইবন মাদীনী** (বুখারীর শিক্ষক) বলেন, *"তারা হচ্ছে যারা হাদীস অনুসরণ করে এবং হাদীসের সাথে লেগে থাকে (আহল আল হাদীস)।"* **ইমাম আহমদ** বলেন, *"তারা যদি হাদীসের লোকই না হয়ে থাকে, তবে আমার ধারণা নেই তারা কারা।"*[১৯৬] **আব্দুল্লাহ ইবন মুবারকও** বলেছেন, *"আমার মতে সেই দল কেবলই হাদীসের লোকজন হতে পারে।"*[১৯৭]
আহল আল হাদীস বা হাদীসের লোকজন - এই অভিব্যক্তির অর্থ হচ্ছে ঐ সমস্ত লোকজন যারা সুন্নাহ, হাদীস এবং নবী (সা.) যে হিদায়াহ নিয়ে এসেছিলেন এবং যা তিনি তাঁর সাহাবীদের কাছে রেখে গেছেন, সেসব সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করে এবং সেগুলো প্রয়োগ করে। [**এখানে একটা কথা উল্লেখ না করলেই নয় - উপরে ব্যবহৃত "আহল আল হাদীস" অভিব্যক্তিকে আমরা যেন generic sense-এ বুঝি। এই অভিব্যক্তি থেকে আমরা যেন কিছুতেই কোন ফিরক্কা বন্দী sect বা cult না বুঝি। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে "আহলে হাদীস" বলতে যে জনগোষ্ঠী রয়েছেন - এদের মাঝে অন্তত ৮টা বিভক্তি বা ফিরক্কা রয়েছে। এখন কেউ যদি মনে করেন যে, "আহল আল হাদীস" বা "আহলুস সুন্নাহ্ ওয়া আল জামা'আহ্র" অন্তর্ভুক্ত হতে হলে, আমাদের এদের কোন একটির অর্ন্তভুক্ত হতেই হবে - তা হলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো? আরেকটা নতুন দল বা ফিরক্কা তৈরী হলো!! তাই না??**]

ইবন তাইমিয়্যা বলেন যে, সুন্নাহ্ ও হাদীসের লোকজন বলতে যাদের বোঝানো হচ্ছে, তারা কেবল ঐ সব লোক নয় যারা হাদীস পড়ে

---

[১৯৬] দেখুন: Page#70, *Al-Sunnah: Hujiyyatuhaa wa Makaanatuhaa fi-l-Islaam wa al-Raad ala Munkireehaa* - Muhammad Luqmaan al-Salaafi- তে উদ্ধৃত।
[১৯৭] দেখুন: Page#119, *Miftah al-Jannah fi al-Ihtijaaj bi al-Sunnah* - Jalaal al-Deen al-Suyooti- তে উদ্ধৃত।

www.pathagar.com

থাকেন, লিখে থাকেন অথবা অন্যের কাছে হস্তান্তর করে থাকেন। হাদীসের লোক (আহল আল হাদীস) বলতে যা বোঝানো হয়, তা হচ্ছে সেই সমস্ত লোকজন যারা হাদীসসমূহকে সঠিকভাবে অনুধাবন করার মাধ্যমে, সেগুলোর আপাত ও গভীরতর অর্থ বোঝার মাধ্যমে, সেগুলোকে সংরক্ষণ করে এবং ঐ সব হাদীসকে বাহ্যিকভাবে এবং অন্তরে অনুসরণ করতে থাকে। তার মতে 'কুর'আনের লোকজন' বলতে যা বোঝানো হয়, সে সম্বন্ধেও একই ধরনের বক্তব্য প্রযোজ্য। অর্থাৎ, তারা ঐ সমস্ত লোকজন নন যারা স্রেফ কুর'আন মুখস্থ করে থাকেন। বরং তারা হবেন সেই সমস্ত লোক, যারা কুর'আন শিখেন এবং এমনভাবে প্রয়োগ করেন যেমনভাবে প্রয়োগ করার কথা। ঐ ধরনের লোকজন সম্বন্ধে ন্যূনতম যা বলা যায়, তা হচ্ছে এই যে, তারা কুর'আন ও হাদীসকে ভালোবাসেন। তারা কুর'আন ও হাদীসের সঠিক অর্থ বোঝার চেষ্টা করেন ও সেগুলোকে নিজের জীবনে প্রয়োগ করার চেষ্টা করে থাকেন।[১৯৮]

একটি অধ্যায়ে ইবন তাইমিয়্যা নাজাতপ্রাপ্ত দল এবং বিজয়ী দলের সনাক্তকরণ সম্বন্ধে কথা বলেন। তিনি বলেন যে, অনেক লোকই দাবী করে থাকে যে, কোন একটা সুনির্দিষ্ট ফিরক্বা (বা দল) হচ্ছে নাজাতপ্রাপ্ত দল। কিন্তু তারা যা বলে, তার পক্ষে কোন সত্যিকার দলিল নেই। তাদের দাবীসমূহ কেবলই তাদের অনুমান বা তাদের নিজস্ব কামনা-বাসনার উপর প্রতিষ্ঠিত। তারা দাবী করে যে, তারা হচ্ছে সুন্নাহর লোকজন এবং যারাই তাদের বিরোধিতা করে তারা হচ্ছে উৎপথগামী। কিন্তু তাদের ঐ সমস্ত বিশ্বাস যদি নবী (সা.) ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে এসে থাকে, অথবা, তাদের দলের নেতা যদি নবী (সা.) ছাড়া অন্য কেউ হয়ে থাকে, তবে তাদের সে দাবী গ্রহণযোগ্য নয়। এটা এইজন্য যে, এমন কেউ নেই, যাকে

---

[১৯৮] দেখুন: Page#95, Vol.4, *Majmooat al-Fataawa Shaikh al-Islaam ibn Taimiyyah* - Ahmad ibn Taimiyyah.

www.pathagar.com

পরিপূর্ণরূপে বিশ্বাস করতে হবে অথবা পরিপূর্ণরূপে যার আনুগত্য করতে হবে – কেবল নবী (সা.) ছাড়া। আর যে কারো বেলায়ই তার কিছু বক্তব্য গ্রহণ করা হবে, আর কিছু হয়তো প্রত্যাখ্যান করা হবে – সেগুলিকে অবশ্যই কুর'আন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে বিচার করতে হবে। কিছু দল আছে যারা নবী (সা.) ছাড়া অন্য কোন লোককে সত্যাসত্যের মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করে থাকে – তারা ইমামগণ, আলেমগণ, পরহেজগার লোকজন অথবা অন্য যাই হোক না কেন। তারা দাবী করে থাকে যে, যে কেউ, যে কিনা তাদের নেতাকে অনুসরণ করে থাকে - সেই সরল পথের উপর রয়েছে এবং যে কেউ যে তার বিরোধিতা করে - সেই পথভ্রষ্ট! তারা একে অপরকে ঐ নেতার আনুগত্যের ভিত্তিতে ভালবাসে এবং ঐ নেতার প্রতি কে কি মনোভাব পোষণ করে তার উপর ভিত্তি করে অন্যদের ঘৃণাও করে থাকে।

বাস্তবে তারা যা করছে, তা ঐ সমস্ত লোকের কর্মকান্ড নয় যারা শুদ্ধভাবে নবীর (সা.) শিক্ষার সাথে লেগে থাকে। তাদের ঐ ধরনের কর্মকান্ড বরং ইসলামের ইতিহাসের উৎপথগামী দলগুলোরই কর্মকান্ড। এটা হচ্ছে সুন্নাহ্‌র লোকজনের শুদ্ধতা পরীক্ষা করার একটা পদ্ধতি। সত্যিকার আনুগত্য কেবল আল্লাহ্‌র জন্যই হতে হবে। উপরন্তু **আল্লাহর রাসূল (সা.) ছাড়া আর কারোই সত্যের মাপকাঠি হবার যোগ্যতা বা মর্যাদা নেই**। সুন্নাহর লোকজনের কর্মকান্ড এই দুটো স্তম্ভ – অর্থাৎ, আল্লাহর জন্য আনুগত্য এবং নবীকে (সা.) একমাত্র নির্ভুল সত্যের মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করা – এগুলোকে ঘিরেই পরিচালিত হয়। কুর'আন অথবা সুন্নাহ্‌র মাধ্যমে যদি কোন কিছু নবী (সা.)-এঁর কাছ থেকে এসেছে বলে প্রমাণিত হয়, তবে তারা তা গ্রহণ করেন এবং অনুসরণ করেন। তিনি যা নিয়ে এসেছিলেন তা যারা অনুসরণ করেন, সেই সমস্ত লোককে তারা আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসার অংশ হিসেবেই ভালবেসে থাকেন। আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসার বশবর্তী হয়েই তারা ঐ সমস্ত লোকের বিরোধিতা করেন

www.pathagar.com

যারা নবীর (সা.) শিক্ষার বিরোধিতা করেন। তারাই হচ্ছেন একমাত্র জনসমষ্টি, যারা দাবী করতে পারেন তাদের নেতা হচ্ছেন নির্ভুল। তারাই হচ্ছেন একমাত্র জনসমষ্টি যারা দাবী করতে পারেন যে, আল্লাহ্ তাদের নেতার প্রতি নিরঙ্কুশ আনুগত্য ও তার উপরে বিশ্বাস স্থাপনের ব্যাপারে আদেশ করেছেন। আর তাই তারাই হচ্ছেন একমাত্র জনসমষ্টি যারা সিরাতুল মুস্তাক্বীমের উপর রয়েছেন।[১৯৯]

উপরন্তু, যখন কেউ ঐ সমস্ত লোকদের নিয়ে চিন্তাভাবনা করবে, যারা হাদীস নিয়ে পড়াশুনা করে, সেগুলো অনুধাবন করে ও খুঁটিনাটি সহকারে সুন্নাহ্ ও হাদীসের সাথে লেগে থাকে, তখন সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবে যে, তাদের মাঝে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা তাদেরকে অন্য সকলের মাঝে পৃথক অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করে। উদাহরণস্বরূপ তারাই হবে সেই জনসমষ্টি, যারা কুর'আনকে সবচেয়ে ভালভাবে বোঝে। এটা এইজন্য যে, তারা তাফসীরের সত্যিকার উৎসগুলোর সম্বন্ধে লেখাপড়া করে। কুর'আনের বিভিন্ন তাফসীর পড়লে যে কেউ এটা বুঝবে যে, কিছু সংখ্যক তাফসীরকারীগণ হাদীস ও সাহাবীদের বক্তব্যের উপর অন্য তাফসীরকারদের তুলনায় বেশী নির্ভর করে থাকেন। এখানে যদিও প্রমাণ করার অবকাশ নেই, তবুও সঠিকভাবেই একথা বলা যায় যে, ঐ সমস্ত তাফসীরকারকের তাফসীরেই সবচেয়ে বেশী ত্রুটি ও উৎপথগামী চিন্তাভাবনা দেখতে পাওয়া যাবে, যারা কিনা তাদের ব্যাখ্যার জন্য সুন্নাহ্ ও সাহাবীদের উপর নির্ভর করেছেন সবচেয়ে কম। এটা এইজন্য যে, তারা তাদের নিজের বুদ্ধিমত্তা ও বুঝের উপর নির্ভর করেছিলেন - যা কিনা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। বিশেষত যেখানে আল্লাহ্ কুর'আনে যে মহান হিদায়াত নাযিল করেছেন তা বোঝার ব্যাপারটা সংশ্লিষ্ট। নবীর (সা.) শিক্ষার উপর নির্ভরতা না থাকায়, আয়াতসমূহের সঠিক অর্থ বোঝার তাদের

---

[১৯৯] দেখুন: Page#346-47, Vol.3, *Majmooat al-Fataawa Shaikh al-Islaam ibn Taimiyyah* - Ahmad ibn Taimiyyah.

www.pathagar.com

কোন উপায় ছিল না এবং কেবলমাত্র নিজস্ব বুদ্ধিমত্তার উপর ভিত্তি করেই তারা কুর'আনের ব্যাখ্যা করতে বাধ্য হন - এই সম্বন্ধে কোন সত্যিকারের জ্ঞান ছাড়াই যে কুর'আন প্রথম কার কাছে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং তা ঠিক কি সম্বন্ধে কথা বলছিল। ব্যাখ্যাতত্ত্বের একটা মৌলিক জ্ঞান থাকলেই এটা বোঝা যায় যে, ওহী কি সম্বন্ধে কথা বলছে সে ব্যাপারে একটা সত্যিকার অনুভূতি থাকার জন্য, যে পরিবেশ-প্রতিবেশে ওহী নাযিল হয়েছিল - সে সম্বন্ধে এবং ঐ পরিবেশের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সম্বন্ধে একটা নিশ্চিত জ্ঞান থাকার প্রয়োজনও রয়েছে।

এছাড়া যে সমস্ত লোকজন সুন্নাহ্ এবং হাদীসের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করেন, সেগুলোকে অনুধাবন করেন এবং সেগুলোর সাথে লেগে থাকেন, তারাই হচ্ছেন সেই জনসমষ্টি যারা নবী (সা.)-এঁর জীবন, লক্ষ্যসমূহ এবং আদেশ-নিষেধের সাথে সবচেয়ে বেশী পরিচিত। তারাই নবীর (সা.) জীবন বৃত্তান্ত এবং তাঁর কর্মকান্ডের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞে পরিণত হন। তারা নবীর (সা.) জীবনবৃত্তান্ত এমন বিস্তারিতভাবে অধ্যয়ন করেন যে, নবী (সা.) সম্পর্কে যে কোন কথা শোনা গেলে নবীর (সা.) জীবনবৃত্তান্তের নিরিখে সেগুলো সত্য কিনা তা সনাক্ত করতে পারেন। তারা নবীকে (সা.) খুব ভাল ভাবে জানেন আর তাই কিভাবে নবীর (সা.) মত আচরণ করতে হবে, তাও তাঁরা খুব ভালভাবে জানেন। তাঁদের গভীর ও বিস্তারিত জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্য হচ্ছে নবীর (সা.) কাছ থেকে শিক্ষালাভ করা এবং সেই শিক্ষাগুলোকে নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করা। ***"আমি যখন হাদীসের মানুষজনের একজনকে দেখি, তখন মনে হয় যেন আমি আল্লাহ্‌র রাসূলকেই (সা.) জীবন্ত দেখতে পাচ্ছি।"*** - এই বক্তব্যর মাধ্যমে **ইমাম শাফি'ঈ** ঠিক একথাটাই বোঝাতে চেয়েছেন।[২০০]

---

[২০০] দেখুন: Page#54, *Makaanah Ahl al-Hadeeth* - Rabee al-Madkhali.

www.pathagar.com

যারা হাদীস অনুসরণ করেন এবং যারা হাদীস শাস্ত্রের ছাত্র তারা হচ্ছেন ঐ সমস্ত লোক যারা - সাধারণ মানুষ যারা কেবল কদাচিৎ নবীর (সা.) বক্তব্যের শরণাপন্ন হন, তাদের চেয়ে নবীর (সা.) বাণী সম্বন্ধে অনেক বেশী সচেতন। আজকের দিনে তাদের উপমা দিতে গেলে ঐ সমস্ত লোকের উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যেতে পারে - যারা বিটোফেনের সঙ্গীত অথবা পিকাসোর চিত্রকর্ম সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। ঐ ধরনের বিশেষজ্ঞরা একটা সঙ্গীত শুনে প্রায় তৎক্ষণাৎই বলে দিতে পারবেন যে, তা আসলে বিটোফেনের কিনা। অথবা একটি চিত্রকর্ম যা পিকাসোর বলে দাবী করা হচ্ছে, তা আদতে জালিয়াতি কিনা। এটা এইজন্য যে, তারা তাদের কাজের এত গভীরে চলে গিয়েছেন যে, ঐ সমস্ত বিশেষ ব্যক্তিদের (বিটোফেন, পিকাসো) কাছ থেকে যা কিছুই এসেছে, তার সবকিছুই তারা জানেন। আর ঐ নিশ্চিত জ্ঞানের উপর ভিত্তি করেই তারা এমন কিছুকে সহজেই সনাক্ত করতে পারেন, যা তাদের সূত্র থেকে আসা সম্ভব নয়। হাদীসের স্কলারগণ এবং যারা শক্তভাবে সুন্নাহর সাথে লেগে থাকেন তারাও নবীর (সা.)-এঁর নিরিখে ঐ ধরনের একটি অবস্থানে পৌঁছে গেছেন। যখন মানুষের মাঝে উৎপথগামী চিন্তাসমূহ অথবা নতুন কোন বিষয় উদিত হয়, তখন সুন্নাহ সম্বন্ধে তাদের গভীর জ্ঞানের সুবাদে, এই সমস্ত স্কলারগণ তৎক্ষণাৎ সনাক্ত করতে পারেন যে, ঐ সব (নতুন) ধ্যানধারণা নবীর (সা.) সম্বন্ধে তারা যা জানেন, তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তাই আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় এবং করুণায় তারা সিরাতুল মুস্তাক্বীম থেকে বিচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনামুক্ত। এ ছাড়া সাধারণ মানুষজন অন্যদের কাজ নিয়ে লেখাপড়া ও জ্ঞান অর্জনের চেষ্টায় সময়ক্ষেপণ করেন – হয়তো এমনটা মনে করেন যে, সেগুলো তাদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা.) সম্পর্কে জানার ব্যাপারে সাহায্য করবে – অথচ, হাদীসের লোকজন আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সা.) সম্বন্ধে সরাসরি জ্ঞান লাভ করতে তাদের সময় ব্যয় করেন।

www.pathagar.com

সবশেষে, সুন্নাহ্ ও হাদীসের লোকজন হচ্ছেন সুস্থিতিসম্পন্ন লোকজন কেননা তারা এমন কিছু অনুসরণ করছেন যেটা সত্য, যা কখনোই বদলাবে না এবং যা কিনা সরাসরি আল্লাহ্র কাছ থেকে এসেছে। যখন আকীদাহ্র বিষয়সমূহের কথা আসবে, তখন তারা ব্যক্তিগত মতামত বা যুক্তির ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করেন, কেননা ঐ সমস্ত বিষয়ের অনেকগুলোই মানবিক ধ্যান-ধারণার জগত-বহির্ভূত। ইসলামের ইতিহাসে বিভ্রান্তির উৎসসমূহের বৃহত্তম একটি হচ্ছে আকীদাহ্ বা বিশ্বাসের নিয়মাবলী নির্ধারণ করতে অতি সীমাবদ্ধ বুদ্ধিমত্তার শরণাপন্ন হওয়া। ঐ সব চিন্তাধারার জনকগণ যদিও এটা দাবী করে থাকেন যে, সবচেয়ে নিশ্চিত যুক্তি-ভিত্তিক প্রমাণের উপর ভিত্তি করেই তারা তাদের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, যে কেউ একটু অনুসন্ধান করলেই দেখতে পাবেন যে, তারাই হচ্ছেন ঐ সমস্ত লোকজন, যাদের ভিতর সবচেয়ে বেশী মতবিরোধ দেখা দেয়। এবং উপরন্তু যে কেউ এটাও দেখতে পাবেন যে, তারাই সীমাহীন ভাবে, অর্থহীন ভাবে, পথ পরিবর্তন করেই চলেছেন। আসলে এইসব লোকদের কিছু কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের আমরা দেখি, তারা তাদের গোটা জীবন বিভ্রান্তির মধ্যে কাটিয়েছেন, যতক্ষণ না শেষ পর্যন্ত তারা সুন্নাহ্, হাদীস ও সাহাবীদের পথে ফিরে এসেছেন। আর তখনই তারা সত্যিকার অর্থে এই সত্য অনুধাবন করেছেন এবং বুঝতে পেরেছেন যে, তাদেরকে আর সুদৃঢ় বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হতে হবে না। তাদের অন্তরসমূহ তখন শেষ পর্যন্ত সুস্থির হয়েছে। এবং তারা শেষ পর্যন্ত প্রশান্তি অনুভব করতে সক্ষম হয়েছেন – ঈমানের সেই প্রশান্তি যা নবীর (সা.) পদাঙ্ক অনুসরণ করতে গিয়ে নবীর (সা.) সাহাবীরা অনুভব করেছেন।[২০১]

---

[২০১] দেখুন: Page#70-72, *Al-Intisaar li-Ahl al-Hadeeth* - Muhammad Bazamool -এ উদ্ধৃত। এই প্রসঙ্গে উসমান ইবন হাসান বলেন, সুন্নাহ্র সত্যিকার ও একাগ্র অনুসারীকে কখনো তার বিশ্বাস পরিত্যাগ করতে অথবা সেগুলোতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে দেখা যায় না। যত পরীক্ষাই আসুক না কেন, সুন্নাহ্র সত্যিকার ও একাগ্র কোন অনুসারী ধৈর্য ধারণ করবেন। পৃথিবীর

www.pathagar.com

এ থেকে যে অনুসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তা হচ্ছে এই যে, হাদীসের লোকজনই হচ্ছে সত্যিকার অর্থে একতার লোকজন। এর একটা কারণ হচ্ছে এই যে, ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলোর প্রসঙ্গ যখন আসবে, তাঁরা নিজেদের ব্যক্তিগত মতামতের অনুসারী হন না - যা কিনা বিবিধ ও পরস্পর বিরোধী হতে বাধ্য। তাদের কিতাব হচ্ছে একটি – আল কুর'আন, তাদের নেতাও হচ্ছেন একজন – নবী মুহাম্মাদ (সা.)। তারা এর সাথেই লেগে থাকেন। অন্যরাও একই বিষয়ের সাথে লেগে থাকার দাবী করেন, কিন্তু সেসব ক্ষেত্রে বাস্তবতা ভিন্ন হয়ে থাকে। বাস্তবে অন্যরা কুর'আনের সাথে এবং নবীর (সা.) সাথে ততটুকুই থাকেন, যতটুকু তাদের স্কলার বা ইমাম বা শেখ যা বলেছেন, তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। অপরপক্ষে হাদীসের লোকজন তাদের মতবিরোধের অবসান ঘটাতে কুর'আনের নিম্নলিখিত আয়াতখানি প্রয়োগ করে থাকে।

ইতিহাস জুড়ে এটাই ছিল নবী-রাসূলগণের পন্থা। অপর দিকে, যারা সুন্নাহ্ পরিত্যাগ করে মানুষ প্রদত্ত তত্ত্ব ও দর্শনের অনুসরণ করেছেন, তাদের দেখা যায় পরবর্তীতে আক্ষেপ ও তওবা করতে! **ফখরুদ্দিন আল-রাজী** এই বলে আক্ষেপ করেছেন যে, তাঁর গোটা জীবনের সংগ্রহ হচ্ছেঃ "বলা হয়েছে এবং তারা বলেন..." - এই ধরনের কথা [অর্থাৎ, অন্য মানুষদের দর্শন, মতামত ইত্যাদি - যা সত্যিকার অর্থে তার কোন কাজে আসবে না]। **আল-জুয়াইনি** বলেন যে, তাঁকে যদি আবার জীবনটা শুরু করতে দেয়া হতো, তাহলে তিনি দর্শন বা ধর্মতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করতেন না, কেননা সেগুলো তাঁকে কিছুই দেয় নি। বরং তিনি কেবল কুর'আন ও সুন্নাহ্র শব্দাবলীর সাথে লেগে থাকতেন। আল-শাহ্রিস্তানী ছিলেন "ইলমুল কালাম"(বা ধর্মতত্ত্বীয় তর্কশাস্ত্র)-এর একজন বড় স্কলার - যিনি তাঁর অতীত বিদ্যা-শিক্ষার প্রচেষ্টা সম্পর্কে আক্ষেপ করে বলেন যে, সেগুলো তাঁকে কোন ধরনের "নিশ্চয়তা" দিতে পারে নি। দেখুনঃ Page#739-742, Vol.2, *Minhaj al-Istidlaal ala Masaail al-Itiqaad Ind Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah* - Uthmaan ibn Hasan.

www.pathagar.com

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَـٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

"হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর এবং তাদের – তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বের অধিকারী। তোমরা যদি কোন বিষয়ে মতবিরোধ পোষণ কর, তবে তা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কাছে তা ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা সত্যিই আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাস কর। সেটাই তোমাদের জন্য উত্তম এবং শেষ পর্যন্ত অধিকতর মঙ্গলময়।" (সূরা নিসা, ৪:৫৯)

তারা তাদের ইচ্ছা বা ব্যক্তিগত মত অনুসরণ করেন না, বরঞ্চ তারা কুর'আন ও সুন্নাহ্‌র শরণাপন্ন হন। শাতিবী বলেন যে, কুর'আন ও সুন্নাহ্‌ই তাদের সকল মতবিরোধের অবসান ঘটাবে, তা নাহলে এই আয়াতের আদেশ অর্থহীন হয়ে দাঁড়াবে।[২০২]

বাস্তবে হাদীসের লোকজনই কেবল কুর'আনের নিম্নলিখিত আয়াতখানি প্রয়োগ করে বা প্রয়োগ করতে পারে।

وَٱعْتَصِمُوا۟ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۟ ۚ...

"আল্লাহ্‌র রজ্জু ধরে রাখ এবং বিভক্ত হয়ো না।" (সূরা আলে-ইমরান, ৩:১০৩)

আল্লাহ্‌র রজ্জু হচ্ছে কুর'আন ও সুন্নাহ্‌য় সন্নিবেশিত আল্লাহ্‌র ওহী। সুতরাং সুন্নাহ্ ও হাদীসের লোকজনই হচ্ছে একমাত্র দল, যারা

---

[২০২] দেখুন: Page#60, Vol. 5, *Al-Muwaafaqaat* - Ibraheem al-Shaatibi.

www.pathagar.com

সত্যিকার অর্থে তা ধরে আছে এবং সেহেতু, বিভক্ত না হবার আশা কেবল তারাই করতে পারে।

সুন্নাহ ও হাদীসের প্রকৃত অনুসরণ বলতে আসলে কি বোঝায়

সুন্নাহ্ ও হাদীস অনুসরণ করা হচ্ছে এক অত্যন্ত গুরুতর ও ব্যাপক পর্যবেক্ষণ। যখন সঠিকভাবে তা করা হয়, তখন সে কারণে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তা প্রতিফলিত হয়।

এ ব্যাপারে **উসমান যুমাইরিয়াহ** লেখেন,

"কিছু কিছু মানুষ তাদের নবীকে (সা.) অনুসরণ করার ব্যাপারটা কেবল একটি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করে ফেলেন – বাহ্যিক দিকগুলোর ক্ষেত্রে – এবং তারা বাকী সকল দিকগুলোকে অবহেলা করে থাকেন। তারা বলেন, 'অমুক সুন্নাহর উপর রয়েছে কেননা সে তার দাড়ি বড় হতে দেয়, অথবা, তার পরিচ্ছদের ঝুল কমিয়ে রাখে।' আমরা যদিও এই ব্যাপারগুলোকে কোনভাবেই খাটো করে দেখি না, কেননা বাহ্যিক চেহারা ও আকার এবং এর পেছনে চালিকাশক্তির মাঝে একটা সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে, তবু, (আমরা বলবো যে) তারা এমন অন্য দিকগুলো ভুলে যাচ্ছেন, যেগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। (যেমন: সঠিক আক্বীদাহ্, দ্বীনের জ্ঞান, আচার-আচরণ ইত্যাদি বিষয়গুলো।)"[২০৩]

সুনির্দিষ্টভাবে যে কারো এটা নিশ্চিত করার আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত যে, তার আক্বীদাহ্-বিশ্বাস, তার বাহ্যিক কর্মকান্ড, তার নৈতিকতা ও চরিত্র সবই যেন নবী মুহাম্মাদ (সা.)-এঁর উদাহরণ এবং তাঁর সুন্নাহ অনুযায়ী হয়। এই প্রতিটি ক্ষেত্র নিয়ে কিছু আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে:

---

[২০৩] দেখুন: Page#93, *Madkhal li-Diraasah al-Aqeedah al-Islamiyyah* - Uthmaan ibn Jumuah Dhumairiyyah.

www.pathagar.com

১)আক্বীদাহ্/বিশ্বাসসমূহ: নবী (সা.) যা নিয়ে এসেছিলেন এবং তাঁর সাহাবীদের মাঝে যা রেখে গিয়েছিলেন তার মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আক্বীদাহ্ বা বিশ্বাস সংক্রান্ত ব্যাপারগুলো। নবীর (সা.) সুন্নাহ্ অনুসরণ করার এটাই যে মূল অংশ, এই ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই। আল্লাহ বলেন,

فَإِنْ ءَامَنُوا۟ بِمِثْلِ مَآ ءَامَنتُم بِهِۦ فَقَدِ ٱهْتَدَوا۟ ۖ وَّإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنَّمَا هُمْ فِى شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ ٱللَّهُ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿١٣٧﴾

"তোমরা যাতে ঈমান এনেছ তারা যদি তাতে ঈমান আনে, তবে তারা সঠিক পথের উপর রয়েছে। আর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তারা নিশ্চয়ই বিরুদ্ধভাবাপন্ন, আর তাদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ ।" (সূরা বাকারা, ২:১৩৭)

এই আয়াতটিতে সুনির্দিষ্টভাবে আহলে কিতাবদের কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু এর অর্থ সার্বজনীন। এবং **ইবন আব্বাস** (রা.) যেমনটা বলেছেন তেমন: *"তুমি যাতে বিশ্বাস করেছ তারা যদি তাতে বিশ্বাস করে, তবে তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে।"*[২০৪] বাস্তবে সুন্নাহর অনুসারীদের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাদের আক্বীদা-বিশ্বাস। আর সেজন্যই **ইবন তাইমিয়্যা** বলেছেন:

"'হাদীস ও সুন্নাহ্র খাঁটি লোকজন' (অর্থাৎ আহল আল হাদীস ওয়া আল সুন্নাহ) বলতে যা বুঝানো হয়, সকলেই তার বাইরে থাকবে কেবলমাত্র ঐ সমস্ত লোকজন ছাড়া, যারা আল্লাহ্র সিফাতসমূহকে নিশ্চিত করে, যারা বলে যে কুর'আন কোন সৃষ্ট বস্তু নয়, যারা বলে যে আখিরাতে আল্লাহ্কে দেখা যাবে, যারা ক্বদরে নিশ্চিত বিশ্বাস করে

---

[২০৪] দেখুন: Page#571, Vol.1, *Jaami al-Bayan an Taweel Ayi al-Quran* - Muhammad ibn Jareer al-Tabari- তে উদ্ধৃত।

www.pathagar.com

এবং হাদীস ও সুন্নাহর লোকদের মাঝে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য সুপরিচিত নীতিমালা ও ভিত্তিসমূহ নিশ্চিত করে।'[২০৫]

কুর'আন অথবা সহীহ হাদীসের সূত্রে রাসূল (সা.)-এঁর কাছ থেকে যা কিছু এসেছে, একজন মুমিনের উচিত তার সবকিছুতে সন্দেহ ও সংশয় ছাড়া বিশ্বাস করা। উদাহরণস্বরূপ যদি নবী (সা.) বলে থাকেন যে, কিয়ামতের দিন কোন একটা কিছু সংঘটিত হবে, তবে একজন মুসলিম বিশ্বাস করে যে, নবী (সা.) ঠিক যেমনটা বলেছেন, তেমনটা নিশ্চিতভাবেই ঘটবে।

নবীকে (সা.) অনুসরণ করতে গিয়ে এবং তিনি যা সাহাবীদের কাছে রেখে গেছেন, সেসব অনুসরণ করতে গিয়ে এই দলের লোকরা যে সমস্ত বিশ্বাস ধারণ করেছে তার ভিতর রয়েছে:

ক) একমাত্র প্রতিপালক, সৃষ্টিকর্তা এবং ইলাহ্ হিসাবে আল্লাহ্য় বিশ্বাস: আল্লাহ্র সকল নাম ও সিফাত যেগুলো আল্লাহ্ নিজের ব্যাপারে নিশ্চিত করেছেন, অথবা, যেগুলো নবী (সা.) আল্লাহ্র প্রতি আরোপ করেছেন, তার সবক'টিতে বিশ্বাসও এর অন্তর্ভুক্ত হবে। ঐসব সিফাতগুলোকে অস্বীকার যেমন করা হয় না, তেমনি এমন কোনভাবে ব্যাখ্যা করা হয় না, যাতে সেগুলোর বাস্তব অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়। একই সময় অবশ্য আল্লাহ্র গুণাগুণ এবং তাঁর সৃষ্টির গুণাগুণের মধ্যে কোন ধরনের সাদৃশ্য অস্বীকার করা হয়ে থাকে। ঐ সমস্ত সিফাতের সঠিক প্রকৃতি কেউ অনুসন্ধান করতে পারে না, কেননা সেগুলো কেবল আল্লাহর বেলায়ই প্রযোজ্য এবং মানবিক অভিজ্ঞতার জগতের সীমার বাইরে অবস্থিত।

খ) সকল পূর্ববর্তী নবীতে বিশ্বাস এবং নবী মুহাম্মাদ (সা.)-কে শেষ নবী বলে বিশ্বাস করা: এর ভিতর রয়েছে এটা বিশ্বাস করা যে, নবী

---

[২০৫] দেখুন: Page#221, Vol.2, *Minhaaj al-Sunnah* - Ahmad ibn Taimiyyah.

www.pathagar.com

মুহাম্মাদ (সা.) সকল বাণী পৌঁছে দিয়ে গেছেন এবং এই বাণী পৌঁছানোর কার্যে কোন ভ্রান্তি থেকে আল্লাহ্ তাঁকে রক্ষা করেছেন। কিয়ামতের দিন পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য তাঁর শিক্ষাই হচ্ছে চূড়ান্ত। যা কিছু আল্লাহ্র রাসূল (সা.) বলেছেন, তার সবকিছু নিরঙ্কুশ সত্য – এ বিশ্বাসও এর অন্তর্ভুক্ত।

গ) আল্লাহ্র নাযিল করা সকল কিতাবে বিশ্বাস এবং চূড়ান্ত ও শেষ ওহী হিসাবে কুর'আনে বিশ্বাসঃ কুর'আন যে সৃষ্টবস্তু নয়, অথচ আল্লাহর বাণী – এটা বিশ্বাস করাও এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

ঘ) আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল ঈমানের যে ধ্যান-ধারণা দিয়েছেন, তাতে বিশ্বাস করা যার ভিতরে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্তঃ অন্তরে বিশ্বাস, জিহ্বায় ঘোষণা এবং শারীরিক কর্মকান্ডে ঈমান গঠিত। একজন ব্যক্তির ঈমান বাড়তে পারে এবং কমতে পারে। একটা পাপ করলেই একজন বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী হয়ে যায় না যদি সেই পাপ শিরকের চেয়ে ছোট হয়, যদিও একই সময়ে তার পাপ তার ঈমানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং সে যে বিশাল গুনাহ করেছে সেজন্য তাকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জাহান্নামের আগুনে বসবাসের জন্য পাঠানো হতে পারে। তাঁর জাতির (উম্মাহ্র) যে সমস্ত লোকজন কবীরা গুনাহ করেছে, তাদের জন্য নবী (সা.) তাঁর শাফায়াত সংরক্ষিত রেখেছেন।

ঙ) নবীর (সা.) সকল মহান সাহাবীদের মহত্ত্বে ও উন্নত চরিত্রে বিশ্বাস।

চ) কুর'আন অথবা সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মরণের পরের জীবন এবং সেই সংক্রান্ত এমন সকল বিষয়াবলীতে বিশ্বাসঃ কিয়ামতের আলামত, যে পুলের উপর দিয়ে মানুষকে পার হয়ে যেতে হবে, সকল কর্মকান্ডের ওজন বা মাপজোক, নবীর (সা.) শাফায়াত, ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত হবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এসবের অনেকগুলোই কুর'আনে হয় মোটেই উল্লেখ করা হয়নি অথবা বিস্তারিত উল্লেখ করা

www.pathagar.com

হয়নি। কিন্তু এই বাস্তবতা যেন সেগুলোতে কারো বিশ্বাসের উপর কোন প্রভাব না ফেলে।

ছ) এই বিশ্বাস যে, কারো জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র ইবাদত করা ও তাঁকে সন্তুষ্ট করা। নবী (সা.) যে জীবনযাত্রার ধরন প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন, সেটা যে কেউ অনুসরণ করছে সেটা ভাবা যাবে না, যদি তার লক্ষ্য এবং আকাঙ্খা এই পার্থিব জীবনের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে। এমনকি যদি বাইরে থেকে মনেও হয় যে, সে সুন্নাহ্‌র অনুসরণ করে চলেছে।

কেউ যদি এই নীতিমালাগুলো, যেগুলো কুর'আন ও সুন্নাহ্‌য় সুপ্রতিষ্ঠিত এবং যেগুলো নবী (সা.) যা রেখে গেছেন, সেসব শিক্ষার অংশবিশেষ গঠন করে – এগুলোতে বিশ্বাস না করে, তবে সে এই দাবী করতে পারে না যে সে পরিপূর্ণ সুন্নাহ্‌র অনুসারী।

২) ইবাদতের আনুষ্ঠানিকতাসহ বাহ্যিক কর্মকান্ডসমূহ: কোন ব্যক্তি যে কর্মসমূহ সম্পাদন করে সেগুলো এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, কিছু কিছু প্রথম যুগের স্কলারগণ সঠিক পথ, সুন্নাহ্‌র পথ কিছু কিছু নির্দিষ্ট কর্মকান্ডের নিরীখে সংজ্ঞায়িত করেছেন। উদাহরণস্বরূপ **সুফিয়ান আল আওযায়ী** বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূলের (সা.) সাহাবীগণ এবং তাদের অনুসারীগণ যারা সৎকাজে তাদের অনুসরণ করেছিলেন, তারা তাদের জীবনকে পাঁচটি মৌলিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন:

সম্প্রদায়ের সাথে সংযুক্ত থাকা
সুন্নাহ্‌ অনুসরণ করা
মসজিদ নির্মাণ করা এবং তাতে যোগদান করা
কুর'আন তিলাওয়াত করা
আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা [২০৬]

---

[২০৬] দেখুন: Page#112, *Miftah al-Jannah fi al-Ihtijaaj bi al-Sunnah* - Jalaal al-Deen al-Suyooti- তে উদ্ধৃত।

www.pathagar.com

সুন্নাহ্‌র সত্যিকারের অনুসারী হতে হলে, যে কাউকে অবশ্যই ঈমানের আবশ্যক স্তম্ভগুলো অনুশীলন করতে হবে – দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত সম্পাদন করা, রমজান মাসের রোজা রাখা, সময়মত যাকাত দেয়া, এবং সামর্থ থাকলে জীবনে অন্তত একবার হজ্জ করা। এগুলোর বাইরেও আরো বহু সৎকর্ম রয়েছে - যেমনটা আমরা এইমাত্র উদ্ধৃত করা ইমাম সুফিয়ান আল আওযায়ীর উদ্ধৃতিতে দেখলাম।

সুন্নাহ্‌র অনুসারীরা অনুধাবন করে যে, তাকে অবশ্যই এমনভাবে ইবাদত করতে হবে যেমনটা আল্লাহ্ নবীর (সা.) উদাহরণ ও শিক্ষার মাধ্যমে তার জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, দ্বীনের ব্যাপারে যে কোন ধরনের নব্য প্রথা বা বিদ'আত অথবা উৎপথগামিতার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। তাকে এটাও বুঝতে হবে যে, নব-আবিস্কৃত সৎকাজ আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। নবী (সা.) বলেন, ***"যে কেউ যদি এমন কোন কর্ম সম্পাদন করে, যা আমাদের প্রথা অনুযায়ী নয়, তবে তা প্রত্যাখ্যাত হবে।"*** (বুখারী, মুসলিম)। আল্লাহ্‌র কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার কথা চিন্তা করে সম্পাদন করা হয় - এমন যে কোন কাজ ঐ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটি ত্যাগ করবে, যখন সে জানবে যে, তা নবী (সা.) অনুমোদন করেননি এবং তা নিজেও করেন নি।

পার্থিব কর্মকান্ডের ব্যাপারে, যে কারো নিশ্চিত হওয়া উচিত যে, সে কুর'আন এবং সুন্নাহর আইনসমূহ মেনে চলছে। ইসলামী আইন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকেই ছুঁয়ে যায়। কোন ব্যক্তি যে কোন কাজ করার আগে প্রথমে নিশ্চিত হওয়া উচিত যে, ইসলামী আইন অনুযায়ী তার কাজটি অনুমোদিত। কেউ যদি একটা ব্যবসা পরিচালনা করে, তবে তার এটা নিশ্চিত করা উচিত যে, তার সেই ব্যবসা ইসলামী আইনের বেঁধে দেয়া কোন সীমা লংঘন করছে না। কেউ যদি বিয়ে করে, তবে তার নিশ্চিত হওয়া উচিত যে, সে ইসলামী আইন অনুযায়ী সঠিক পদ্ধতিতে বিয়ে করছে। একটা বিয়ের মধ্যেও আবার স্বামী

www.pathagar.com

এবং স্ত্রী উভয়কে নিশ্চিত করতে হবে যে, তারা ইসলামসম্মত সঠিক আচরণ করছেন এবং একে অপরের হক আদায় করছেন। তালাকের নিয়মকানুন এবং ছেলেমেয়ের অভিভাবকত্বের ব্যাপারসমূহের বেলায়ও ইসলামী আইন রয়েছে। সুতরাং তালাকের প্রশ্ন যখন আসে, যে কারো উচিত সঠিক পদ্ধতিতে তালাক দেয়া এবং সেক্ষেত্রে তার আবেগ যেন তাকে ইসলামী আইনে বেঁধে দেয়া সীমারেখার বাইরে নিয়ে না যায়। জিহাদের প্রশ্ন যখন আসবে, তখন যে কাউকে এই সংক্রান্ত ইসলামী আইনগুলো এবং নবীর(সা.) দিক-নির্দেশনাগুলো জানতে হবে। যে কোন উপায়ে বা অবস্থায় শত্রুকে আক্রমণ করা মানে জিহাদ নয়। বরং জিহাদের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর ও গুরুত্বপূর্ণ কিছু নিয়মকানুন রয়েছে, যা যে কাউকে মেনে চলতে হবে। যখন কোন ব্যক্তি ইসলামের এই নিয়মকানুনগুলো ভঙ্গ করে, তখন সে দাবী করতে পারে না যে সে সুন্নাহ্ মেনে চলছে। বাস্তবে ঐসব কর্মকান্ডে সে সুন্নাহ অনুসরণ করছে না। একজন মুসলিমের চূড়ান্ত লক্ষ্য হবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সুন্নাহকে অনুসরণ করা, যাতে যে কারো জীবন আল্লাহ্‌র পূর্ণ ও সত্যিকার ইবাদতে পরিণত হবে।

৩) <u>আচার-আচরণ, নৈতিকতা ও ব্যবহারের ব্যাপারে যে কাউকে সুন্নাহ্‌র সাথে লেগে থাকতে হবেঃ</u> এটা হচ্ছে সুন্নাহ্‌র এমন একটা দিক, যেটা এমন অনেকের দ্বারাই সবচেয়ে বেশী অবহেলিত হয়ে থাকে, যারা বিশ্বাস করে থাকেন যে, তারা সুন্নাহ্‌র উপর রয়েছেন। একটু আগে উদ্ধৃত **উসমান যুমাইরিয়াহ্‌র** উদ্ধৃতিতেও আমরা দেখি, সুন্নাহ্‌র সত্যিকার অনুসারী হতে হলে কেবল বাহ্যিকভাবে নিজেকে সুন্নাহ্‌র অনুসারী দেখানোটাই পর্যাপ্ত নয়। এমনকি ইসলামের সমস্ত আইন-কানুন মেনে চলাটাও পর্যাপ্ত নয়। কোন ব্যক্তি সকল প্রকার খারাপ কাজ এড়িয়ে যেতে পারে এবং নিশ্চিত করতে পারে যে, সে তার কর্মকান্ড ও লেনদেনে আইনের অনুশাসন মেনে চলছে। তা সত্ত্বেও সুন্নাহ্‌র সাথে লেগে থাকার ব্যাপারে তার কমতি থাকতে পারে,

www.pathagar.com

যদি তার আচার আচরণ, নৈতিক আদর্শ সুন্নাহর দিকনির্দেশনা মোতাবেক না হয়ে থাকে।

এটা আশ্চর্য যে, একজন খারাপ চরিত্রের অধিকারী মানুষও দাবী করে যে, সে সুন্নাহর অনুসারী। সঠিক আচার-আচরণ ও ব্যবহার সুন্নাহর অনুসারী হবার এক অত্যাবশ্যক দিক। এটা হচ্ছে এমন একটা দিক যা আল্লাহ্ সুনির্দিষ্টভাবে নবীর (সা.) ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন।

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾

"আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।" (সূরা কলম, ৬৮:৪)

নবী (সা.) তাঁর মিশনের একটা অংশ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, *"উন্নত নৈতিক আদর্শ নিখুঁতভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমাকে পাঠানো হয়েছে।"* (আল-হাকিমের হাদীস, আলবানীর মতে সহীহ্) নবী (সা.) আরও বলেন, *"উন্নত চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ধর্মপরায়ণতা ও সৎকর্মশীলতা।"* (মুসলিম) এটা হচ্ছে নবীর নিজের কাছেই সুন্নাহ্র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকের একটি যেমনটা আমরা নিম্নলিখিত হাদীসে দেখতে পাই:

"কিয়ামতের দিনে যারা আমার কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় হবে এবং যারা আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়ে বসবে, তারা হচ্ছে তোমাদের মধ্যে যাদের ব্যবহার সবচেয়ে সুন্দর।" (তিরমিযী, আলবানীর মতে সহীহ্)

সুন্নাহ্র অনুসারীদের অবশ্যই নবীর চরিত্র ও আচরণ সম্বন্ধে পড়াশুনা করতে হবে। তারপর তার নিজেকে নিয়ে মেহনত করতে হবে, যাতে সে নিজেকে বদলে ফেলতে পারে এবং নবীর (সা.) মত হতে পারে। তার উচিত নিম্নলিখিত হাদীসটির মত হাদীসগুলো খেয়াল করা এবং তারপরে সেটা যেন তার নিজের একটা বর্ণনায় পরিণত হয়, সে ব্যাপারে আপ্রাণ চেষ্টা করা। আনাস বিন মালেকের (রা.) বর্ণনায়

www.pathagar.com

এসেছে যে, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) এমন একজন মানুষ ছিলেন না যিনি কারো উপর অত্যাচার করেছেন, যাঁর একটা খারাপ জিহ্বা ছিল অথবা তিনি অন্যদের অভিসম্পাত করেছেন। তিনি যদি কাউকে শাসন করতে চাইতেন, তবে সবচেয়ে বেশী যা বলতেন তা হচ্ছে, "ওর সমস্যা কি? তার কপাল ধূলিমাখা হোক।" (বুখারী)

এটা অকল্পনীয় যে, কেউ দাবী করবে যে, সে সুন্নাহ্‌র উপরে আছে অথচ তারপর সে এই ব্যক্তির গীবত করবে অথবা অপর এক ব্যক্তির ব্যাপারে গল্প ছড়িয়ে বেড়াবে, অথবা আর কোন দ্বিতীয় ব্যক্তির ব্যাপারে কটূক্তি করবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এমন কারো জন্য এটা অকল্পনীয় যে কিনা সুন্নাহ্‌কে অনুসরণ করে বলে দাবী করে, যে সে তার অপর কোন ভাইয়ের প্রতি অন্তরে হিংসা পোষণ করবে, অথবা কারো প্রতি অহেতুক সন্দেহ পোষণ করে সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ নেবে। সুন্নাহ্‌র অনুসরণ করছে বলে দাবী করা কারো পক্ষে এটাও অকল্পনীয় যে, সে অন্য কাউকে কাফির, ফাসেক, বিপথগামী, জালিম ইত্যাদি বলে সম্বোধন করবে যখন কিনা সে রকম বলার জন্য তার কাছে আল্লাহ অথবা নবীর (সা.) সুন্নাহ্‌ভিত্তিক কোন প্রমাণ নেই। এটাও অকল্পনীয় যে, কেউ নিজেকে সুন্নাহ্‌র অনুসরণ করে বলে দাবী করে, অথচ বাড়ী গিয়ে সে নিজের স্ত্রীকে গালিগালাজ করবে অথবা কোন যুক্তিযুক্ত কারণ ছাড়া মারধর করবে। এমনকি যদি একজন ব্যক্তির লম্বা দাড়ি, ছোট গোঁফ, মুখে একটা মিসওয়াক, টাখনুর উপরে কাপড় এবং হাতে একখানা সহীহ আল-বুখারীও থাকে, তবুও সে সত্যিকার অর্থে সুন্নাহর অনুসারী নয় যতক্ষণ না সে তার পন্থা ও পদ্ধতি পরিবর্তন করে এবং তার আচরণ ও ব্যবহার নবীর (সা.) আচরণ ও ব্যবহারের মত হয়।

মোটকথা সুন্নাহর সত্যিকারের অনুসারীদের জন্য এটা আবশ্যক যে, আল্লাহর ওহীর ছায়াতলে তার জীবনের সবটুকুই যাপিত হবে – যা কিনা কুর'আন ও সুন্নাহ্।

www.pathagar.com

সুন্নাহ অনুসরণ করতে গেলে কঠোর সংকল্পের প্রয়োজন রয়েছে

একজন মানুষ যখন এটা অনুধাবন করে যে, তাকে অবশ্যই জীবনের সব ক্ষেত্রে নবী (সা.)-কে অনুসরণ করার আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে, তার এটাও বোঝা উচিত যে, এর জন্য তার তরফ থেকে কঠোর সংকল্পের প্রয়োজন রয়েছে। এটা বিশেষ করে আজকের দিনে প্রযোজ্য, যখন মানুষজন নবী (সা.)-এঁর চমৎকার ও সুন্দর উদাহরণ থেকে বহুদূরে সরে গিয়েছে। একজন ব্যক্তি যে সুন্নাহর দিকে অবস্থান নেয় এবং নিজের জীবনে তা প্রয়োগ করতে শুরু করে, তখন খুব সম্ভবত – একদম নিশ্চিত না হলেও, খুব সম্ভবত – সে তার চলার পথে লোকজনের তরফ থেকে, এমনকি মুসলিমদের তরফ থেকে, ভর্ৎসনা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের সম্মুখীন হবে। যারা তার সবচেয়ে নিকটতম, তার পরিবার ও তার প্রিয়জন, এরাই হয়তো তার বিরোধিতায় সবচেয়ে নির্দয় হতে পারে। সুন্নাহ্কে অত গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ না করার ব্যাপারে তাকে বোঝানোর চেষ্টায়, এরাই হয়তো সর্বাগ্রে থাকবে। তারা এমনকি এমন যুক্তি দেখাতে পারে যে, সে যদি কুর'আনের সাধারণ অনুশাসন অনুযায়ী জীবন যাপন করতে পারে, তবে তাই পর্যাপ্ত। তারা এমনও যুক্তি দেখাতে পারে যে, তার উচিত অন্যান্য সকল মুসলিমের মত জীবনযাপন করা – তারা সবাই তো নিজেদের মুসলিম বলেই দাবী করে। বাস্তবে অন্যান্য মুসলিমরা তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগও তুলতে পারে যে, সে নিজেকে অন্যদের চেয়ে আলাদা করে নিচ্ছে এবং সে এমনটাও প্রতীয়মান করতে চাচ্ছে যে, অন্যরা আসলে সত্যিকার মুসলিম নয় – শুধু এইজন্যই যে, সে তার জীবনকে নবীর (সা.) উদাহরণ অনুযায়ী সাজাতে চাইছে। এবং সেরকম জীবনযাত্রার আদলে নয়, যেমনটা আজকের বেশীর ভাগ মানুষ যাপন করে থাকে। যে কোন ব্যক্তি যখন সঠিক সুন্নাহর পথ অনুসরণ করতে চাইবে, তখন তাকে অবশ্যই এই সব বহুমুখী আক্রমণের মুখোমুখি হবার জন্য তৈরী থাকতে হবে। উদাহরণস্বরূপ,

www.pathagar.com

যখন সে এই হাদীস প্রয়োগ করতে চাইবে যে, *"নিম্নাঙ্গের পরিধেয় টাখনুর নীচে যতটুকু পর্যন্ত গড়াবে, ততটুকুর অবস্থান জাহান্নামের আগুনে"* (নাসাঈ, আহমাদ ও অন্যান্য আলবানীর মতে সহীহ্) - তাকে নিয়ে তারা হাসি-ঠাট্টা করবে, যারা ব্যাপারটাকে অসঙ্গত ও ফ্যাশনবিরোধী মনে করে। যে কারো মনে হতেই পারে যে, পরিধেয়ের দৈর্ঘ্য একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত পছন্দের ব্যাপার। আর তাই অন্যদের তাতে বিশেষ কিছু যায় আসে না। কিন্তু বাস্তবে যখন সে টাখনুর উপরে কাপড় রাখতে চাইবে, তখন সে অবাক হয়ে দেখবে যে, কারো পায়জামার দৈর্ঘ্য কিভাবে অন্যদের জন্য বিব্রতকর হতে পারে।

এরপরে আসুন নিম্নলিখিত হাদীসটির কথা ধরা যাক। *"পৃথিবীতে এমনভাবে বসবাস কর যেন তুমি একজন আগন্তুক অথবা কোন পথের মুসাফির।"* (বুখারী) বর্তমান পৃথিবীতে বস্তুবাদ এবং অবস্থান/মর্যাদা নিয়ে মানুষজন এমনকি মুসলিমরাও এতই চিন্তিত যে, কেউ যখন নবীর (সা.) এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপদেশখানি বাস্তবায়ন করতে চায়, তখন সে তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। আজকের দিনে যখন কোন মুসলিম লাভ-লোকসান নিয়ে তেমন একটা ভাবিত হয় না, যখন সে তার মর্যাদা বা ডিগ্রী নিয়ে তেমন চিন্তা করে না, এই জীবনের বিলাসিতা নিয়ে যখন তেমন একটা ভাবিত না, যখন সে একটা সাদামাটা জীবন-যাপন করতে চায়, তখন তার দিকে সবাই এক অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে। অনেক সময়ই সুন্নাহ্‌র অনুসারী একজন মানুষ হয়তো ইচ্ছে করেই কম বেতনের একটা চাকরী নেয়, কেননা ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সেটা হয়তো তার জন্য শ্রেয়। তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ-সম্পদ সঞ্চয় করার জন্য সে ভাবিত নয়, কারণ এই পৃথিবীকে সে তার সত্যিকারের আবাসস্থল বা চূড়ান্ত গন্তব্য বলে মনে করে না। সে চেষ্টা করছে আখিরাতের জন্য কাজ করতে, এই পৃথিবীর জন্য নয়, যেমনটা উপরে উল্লিখিত হাদীস তাকে শিক্ষা দেয়। প্রথমত, এবং সর্বাগ্রে হয়তো তার বাবা-মাই এ ধরনের

www.pathagar.com

আচরণের বিরোধিতা করবেন। তার বাবা-মা হয়তো এজন্য মনক্ষুণ্ণ হবেন যে, তার শিক্ষাগত যোগ্যতাবলে সবচেয়ে বেশী বেতনের যে চাকরীটি সে পেতে পারতো, তা সে নিচ্ছে না – এবং তাদের বস্তুবাদী বন্ধুদের কাছে এ জিনিষটা লজ্জার একটা ব্যাপার হতে পারে। তারা তাকে বলতে পারেন যে, তাকে একটা ভাল শিক্ষা দিতে গিয়ে তারা রীতিমত সংগ্রাম করেছেন - আর এখন সে কিনা স্বল্প বেতনের একটা চাকরী করে সেটার অপচয় করছে। তারা এই জিনিসটা কিছুতেই অনুধাবন করতে পারেন না যে, (যদিও তারা সকলেই মুসলিম,) তাদের ছেলেটি কেন এমন একটা পথ বেছে নিয়েছে, যা কিনা আজকের বেশীর ভাগ মুসলিমগণ যে পথ অনুসরণ করে থাকেন - তা থেকে একেবারেই ভিন্ন। সে জীবনে কিছু নির্দিষ্ট ব্যাপার বেছে নিচ্ছে, কেননা, সে সত্যিকার অর্থেই নবীর (সা.) পথ অনুসরণ করার চেষ্টা করছে।

আজকের দিনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণের একটি, নবীর (সা.) নিম্নলিখিত হাদীসটিকে ঘিরে আবর্তিত হয় যেখানে তিনি বলেছেন, ***“যে কেউ দেখতে যে জনসমষ্টির মত হয়, সে তাদেরই একজন।”*** (আবু দাউদ, আলবানীর মতে সহীহ্) মুসলিমদের এই হাদীস অবজ্ঞা করার চেয়ে সুন্নাহ্ এড়িয়ে চলার অধিকতর উজ্জ্বল কোন উদাহরণ রয়েছে বলে মনে হয় না। **আজকের দিনে গোটা মুসলিম বিশ্ব জুড়ে পোশাক-আশাক ও আচার-ব্যবহারের আদর্শ হিসেবে কাফিরদের দিকে সবাই চেয়ে থাকে।** অথচ, মুসলিমদের সর্বাত্মক চেষ্টা করার কথা ছিল ঐ সকল লোকদের কিছুতেই যেন তারা অনুসরণ না করে। পশ্চিমের সর্বসাম্প্রতিক ফ্যাশন খুব দ্রুত মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। তাই ইউরোপের ফ্যাশন কেন্দ্রগুলো থেকে ডিজাইনার পোশাক ও সুগন্ধি সরাসরি মুসলিম বিশ্বে চলে যায়। পশ্চিমা দেশে আজ একটা আজব ব্যাপার ঘটে চলেছে, যা হচ্ছে এই যে, কেউ যদি সচেতন ভাবে সিদ্ধান্ত নেন যে, তিনি কাফিরদের মত দেখতে হবেন না - আর তা করতে গিয়ে তিনি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে

www.pathagar.com

ঢিলাঢালা পোশাক পরেন, একটা লম্বা কুর্তা পরেন, বিশেষ শিরোভূষণ ধারণ করেন, দাড়ি রাখেন, টাখনুর উপরে কাপড় পরেন এবং অন্যান্য বিষয়গুলো অনুসরণ করেন - যেগুলো সনাতনভাবে মুসলিম পোশাকের সাথে সম্পৃক্ত, তাহলে তিনি আবিষ্কার করবেন যে, তাকে দেখতে আর বেশীরভাগ মুসলিমের মতও লাগছে না। তিনি যদি একটি মসজিদে ঢোকেন, তবে মসজিদের বহু মানুষের কাছেই তাকে একজন বহিরাগত মনে হবে, যারা এই কথাটা বুঝতে অক্ষম যে, তিনি কেন ঐভাবে পোশাক-আশাক পরার ব্যাপারে জোর দিয়ে থাকেন।

নবী (সা.)-এঁর অন্যান্য হাদীস দিয়েও আরো বহু উদাহরণ দেয়া যাবে। আমরা যদিও আশা করছি যে, আমরা যা বোঝাতে চেয়েছি তা পরিস্কার করতে পেরেছি: **একবার যখন কেউ সচেতনভাবে সত্যিকার অর্থে সুন্নাহ্ অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তখন তার উচিত নিজেকে আক্রমণের মুখোমুখি হবার জন্য প্রস্তুত করে নেয়া। তার এ ব্যাপারটা বোঝা উচিত যে, লক্ষ-কোটি মুসলিম, যাদের সত্যিকার অর্থে কোন ধারণাই নেই যে, সুন্নাহ অনুসরণ বলতে কি বোঝায় - তাদের কাছে তিনি একজন আগন্তুক বলে গণ্য হবেন। তিনি নানা দিক থেকে এমনভাবে আক্রমণ-বিদ্ধ হতে পারেন যে, শয়তান তাকে এই সন্দেহে ফেলে দেবে যে, সুন্নাহ অনুসরণ করার তার এই সিদ্ধান্তটা সঠিক হলো কিনা।**

যাহোক, এই বাস্তবতা যেন তাকে ধোঁকা না দেয় যে, সে যে পথের দিকে তার গতি নির্ধারণ করেছে, বহু মুসলিমকে মনে হবে তার বিপরীতে তারা পথ চলছে। আল্লাহ্‌র দয়ায় ও করুণায় অবগত হয়ে নবী (সা.) এমনটা যে ঘটবে, সে সম্বন্ধে মুসলিমদের আগেই সতর্ক করে গেছেন। ঐরকম সময়ে তাদের করণীয় কি সে সম্বন্ধেও তিনি তাদের ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন এবং তাদের সৎকর্মের প্রতিফলন কি হবে

www.pathagar.com

সে সম্বন্ধেও তিনি তাদের সুসংবাদ দিয়ে গেছেন। উদাহরণস্বরূপ নবী (সা.) বলেছেন,

"আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র প্রতি তাকওয়ার উপদেশ দিচ্ছি এবং এমনকি একজন ক্রীতদাসও যদি তোমাদের নেতা হয়, তবে তার প্রতিও তোমাদের আনুগত্যের নির্দেশ দিচ্ছি। নিশ্চিতই তোমাদের মধ্যে যে বেঁচে থাকবে সে অনেক মতপার্থক্য দেখবে। সুতরাং আমার সুন্নাহ্‌ এবং খুলাফায়ে রাশেদীন এর সুন্নাহ্‌র সাথে লেগে থেকো, সেটাকে দাঁত দিয়ে শক্ত করে কামড়ে ধরে রেখে। এবং নতুন উদ্ভাবিত বিষয়গুলো এড়িয়ে চলো। নিশ্চয়ই প্রতিটি বিদআতই হচ্ছে পথভ্রষ্টতা।" (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবন মুহাম্মাদ, আলবানী, আল বাযযার, তিরমিযী, আল হাকিম প্রমুখের মতে হাদীসটি নির্ভরযোগ্য)

এমন সময়কাল যখন মানুষজন নবীর (সা.) রেখে যাওয়া উদাহরণ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে, তখন সুন্নাহ অনুসরণকারী আগন্তুকে পরিণত হয়। সে হাতে গোনা দু'একজনকে পেতে পারে, যারা কাজে-কর্মে আচার-আচরণে তারই মত। শুদ্ধ পথ চলতে গিয়ে এই নিঃসঙ্গতার ভার কারো কাছে অসহনীয় লাগতে পারে। কিন্তু নবীর (সা.) বাণী ঐরকম কোন ব্যক্তিকে কঠিন জীবনের ভার বহন করার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করা উচিত। নবী (সা.) বলেছেন, *"ইসলাম শুরু হয়েছিল অপরিচিত হিসাবে এবং তা যেভাবে শুরু হয়েছিল সে অবস্থায় ফিরে যাবে। অর্থাৎ তা আবার অপরিচিত হয়ে যাবে)। সুতরাং অপরিচিতদের জন্য তূবা (সুসংবাদ/তূবা হচ্ছে জান্নাতের একটি বৃক্ষ।)"* (মুসলিম) আরেকটি বর্ণনায় অপরিচিতদের ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা হয়েছে এভাবে: *"দুষ্ট লোকদের মধ্যে পরহেজগার লোকজন - যারা তাদের অমান্য করবে, তাদের সংখ্যা যারা তাদের মেনে চলবে তাদের চেয়ে বেশী।"* (আহমাদ, আলবানীর মতে সহীহ) আজকে একজন মুসলিম যার মুখোমুখি হচ্ছে তা মক্কায় নবী (সা.) যার মুখোমুখি হয়েছিলেন, তার চেয়ে খারাপ হতে পারে না। নবী (সা.)

www.pathagar.com

যখন তাঁর প্রথম ওহী লাভ করেছিলেন, তখন তার অর্থ দাঁড়িয়েছিল এমন একটা জীবনের ধরন যা তার চারিদিকের সমাজের সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি যখন যাত্রা শুরু করেন, তাঁর সাথে মুষ্টিমেয় কয়েকজন অনুসারী ছিলেন এবং তাঁর চারপাশের সমাজ মনে করেছিল যে তিনি বদ্ধ পাগল অথবা বিকারগ্রস্ত।

এভাবে সবার মাঝে অপরিচিত বলে গণ্য হবার যে বোধটা, সেই পরিস্থিতিকে কিভাবে মোকাবেলা করতে হবে নবী (সা.) তারও উদাহরণ রেখে গেছেন। আজকের মুসলিমরা যখন সুন্নাহ্‌র সাথে লেগে থাকতে গিয়ে অদ্ভুত বা অপরিচিত বলে গণ্য হন, তখন তাদের উচিত একই রকম পরিস্থিতিতে নবী (সা.) যা করেছিলেন, তা অনুসরণ করে তাদের সুন্নাহ্ অনুসরণের প্রচেষ্টাকে পূর্ণতা দান করা। তিনি উদ্ভূত পরিস্থিতিকে ধৈর্য ও নিরন্তর প্রচেষ্টা দিয়ে মোকাবেলা করেছেন। তিনি কখনও দমে যাননি, কেননা তিনি জানতেন তিনি যা অনুসরণ করছেন, তা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আসা সত্য - তিনি জানতেন তাঁর সেই আচরণ আল্লাহ্‌র কাছে পছন্দনীয়। সেটাই ছিল তাঁর মূল ভাবনা। আর তাই তিনি কখনোই আশা ছাড়েন নি এবং কখনোই তাঁর মিশন পরিত্যাগ করেন নি। আজকের কোন 'অপরিচিতকে' একই পথ অনুসরণ করতে হবে - তাকে উপলব্ধি করতে হবে যে, তিনি আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করতে ঐ পথ বেছে নিয়েছেন। আল্লাহ্ তার সংগ্রাম ও ধৈর্যকে বৃথা যেতে দেবেন না। বরং তিনি যদি আল্লাহর প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন, তবে আল্লাহ্ তাকে এই জীবনে সাহায্য করবেন এবং আখিরাতে "তূবা বৃক্ষ" দ্বারা তাকে পুরস্কৃত করবেন।

ইবনুল কাইয়্যিম বলেন যে, এসব অপরিচিতরাই হচ্ছেন সত্যিকার অর্থে 'আল্লাহর মানুষজন'। তারা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো মুখাপেক্ষী নন এবং নিজেদেরকে নবী (সা.) ছাড়া আর কারো দিকে সম্পর্কিত করেন না। তারা নবী (সা.) যা নিয়ে এসেছিলেন, তা ছাড়া অন্য কোন কিছুর দিকে কাউকে দাওয়াত দেন না। কিয়ামতের দিন যখন

www.pathagar.com

লোকজন তাদের মিথ্যা ইলাহ্ ও নেতৃবৃন্দের পেছনে থাকবে, তখন তারা তাদের সত্যিকার প্রভুর অপেক্ষায় থাকবে। বাস্তবে এই আগন্তুক একাকী নয় অথবা ভীতও নয় - কারণ তার সাথে আল্লাহ্ রয়েছেন। তার বন্ধু হচ্ছেন আল্লাহ্, তাঁর রাসূল (সা.) ও সত্যিকার বিশ্বাসীগণ।

ইবনুল কাইয়্যিম আরো বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন যে, ঐ সমস্ত অপরিচিত ব্যক্তিগণ যাদেরকে নবী (সা.) সুসংবাদ দিয়ে গেছেন, তারা হচ্ছেন এমন সব ব্যক্তি, যারা সুন্নাহর সাথে লেগে থাকেন এবং লোকজন যেসব নব্য প্রথা প্রচলন করেছে সেসব এড়িয়ে চলেন – যাদিও ঐ সব লোকজনের আবিষ্কৃত নব্য প্রথা এখন স্বাভাবিক ও স্বীকৃত ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। তাদের কাছে রয়েছে নির্ভেজাল তাওহীদ ও আল্লাহ্‌র ইবাদত, অন্যেরা যদিও সেসবের বিরোধিতা করতে পারে। তারা নিজেদেরকে কোন শায়েখ, তরিকা অথবা মাযহাবের সাথে সম্পৃক্ত করে নাঃ তারা কেবলই নিজেদের আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে সম্পৃক্ত করেন এবং সেই সম্পৃক্ততার সাথে যা কিছু সঙ্গতিপূর্ণ তার সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করেন।

ইবনুল কাইয়্যিম বলেন যে, নিম্নলিখিত হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে নবী (সা.) ঐ সমস্ত লোকের কথাই বলেছিলেন যখন তিনি বলেনঃ ***"মানুষজনের মাঝে এমন একটা সময় আসবে, যখন কারো তার দ্বীনের উপর থাকা হবে কোন ব্যক্তির জ্বলন্ত কয়লা ধরে থাকার মত।"*** (তিরমিজী, আলবানীর মতে সহীহ্)। অন্য কথায় **ইবনুল কাইয়্যিম** যেমনটা বলেছেন, বেশীরভাগ মানুষই, সে যে পথ বেছে নিয়েছে - সেজন্য ঐ ব্যক্তিকে তিরস্কার করবে। সুতরাং ঐ ব্যক্তিকে নিজের দ্বীন সংরক্ষণ করতে হবে এবং ঐ পথে ধৈর্য ধারণ করতে হবে।

হিজরী অষ্টম শতাব্দীতে লিখতে গিয়ে **ইবনুল কাইয়্যিম** বলেছেন যে, সত্যিকার ইসলাম – যা নবী এবং তাঁর সাহাবীগণ অনুসরণ করেছিলেন – তা তাঁর জীবদ্দশায়ই একটা অপরিচিত ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। যদিও ইসলামের বাহ্যিক নিদর্শনগুলো সব জায়গায়ই

www.pathagar.com

দৃশ্যমান ছিল, তবুও সত্যিকার ইসলাম ও তার সত্যিকার অনুসারীরা এক চরম 'অপরিচিত' অবস্থায় ছিল। তিনি বলেন যে, এটা অপ্রত্যাশিত নয় যে, সত্যিকার ইসলামের অনুসারীগণ সংখ্যায় ছোট একটা সমষ্টি হবে। কেননা, এই উম্মাহ্ যে ৭৩টা ভাগে বিভক্ত হবে, তারা হবে সেই বিভক্তির কেবল একটি অংশ। এটাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে লোকজন তাদের কামনা-বাসনা ও ব্যক্তিগত মত অনুসরণ করে। আর তাই, যারা সিরাতুল মুস্তাক্বীম এর উপর লেগে থাকে - তাদের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প হয়।[২০৭]

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে যে এই 'অপরিচিত জনেরা' আসলে একাকী নয়। আমরা উপরে যেমন উল্লেখ করেছি, তাদের সামনে খোদ নবীর উদাহরণ রয়েছে। ইসলামের ইতিহাস জুড়ে তাদের সামনে বহু স্কলারদের উদাহরণ রয়েছে। **ইমাম শাতিবীর** অভিজ্ঞতা, যেমনটা তিনি তার লেখা আল-ই'তিসামে ব্যক্ত করেছেন – তা হচ্ছে আমাদের জন্য এক জলজ্যান্ত উদাহরণ। **ইবনুল কাইয়্যিমের** মতই আল **শাতিবীও** হিজরী অষ্টম শতাব্দীর মানুষ ছিলেন। তিনি লিখেছেন যে, যখন তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, তিনি সকল উৎপথগামিতা ও বিদ'আত পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র নবী (সা.)-এঁর সিরাতুল মুস্তাক্বীম অনুসরণ করবেন, তখন তার সময়কালের মানুষজনের মাঝে তিনি নিজেকে এক অপরিচিত জন হিসাবে আবিষ্কার করেন। তাঁর সময়কার লোকজনের প্রথা ও আচার-অনুষ্ঠান – যদিও সেসব প্রচলিত প্রথা ও আচার-অনুষ্ঠান আল্লাহর পথ নির্দেশনার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না এবং যদিও ঐ সকল লোকজনের সকলেই নিজেদের ইসলামের অনুসারী বলেই মনে করতেন – সেগুলো তাদের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, তারা আর সত্যিকার ইসলামকে সনাক্ত করতে বা গ্রহণ করতে সমর্থ ছিলেন না।

---

[২০৭] দেখুন: Page#196-210, Vol.3, *Madaarij al-Saalikeen bain Manaazil Iyyaka Nabudu wa Iyyaka Nastaeen* - Muhammad Ibn al-Qayyim.

www.pathagar.com

আল শাতিবী বলেন যে, তাঁকে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়েছিল। মানুষজন যা করছিল তার বিপরীতে গিয়ে তিনি সুন্নাহ্ অনুসরণ করতে পারতেন, যার অর্থ দাঁড়াতো এই যে, তাঁকে লোকজনের মাঝে প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে গিয়ে বহু বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হবে, বিশেষত অজ্ঞতাবশত লোকজন যেহেতু বিশ্বাস করতো যে, তাদের মাঝে প্রচলিত প্রথাগুলোই ছিল আদতে সুন্নাহ্। এ ধরনের অবস্থানের অর্থ ছিল স্বেচ্ছায় কাঁধে একটা বিরাট বোঝা টেনে নেওয়া। কিন্তু এর অর্থ এও ছিল – যেমনটা তিনি উল্লেখ করেন– পরিণতিতে এক বিরাট পুরস্কার। অন্যথায় তিনি সুন্নাহ্‌র এবং প্রথম দিকের মুসলিমদের সৎকর্মশীল প্রজন্মগুলোর অনুশীলনের বিপরীতে গিয়ে, তাঁর সমকালীন মানুষদের পথ অনুসরণ করতে পারতেন। যার অর্থ হতো তা তাঁকে পথভ্রষ্টতায় নিয়ে যাবে। আল্লাহ্‌র দয়ায় তিনি উপলব্ধি করেন যে, সুন্নাহ্ অনুসরণ করতে গিয়ে 'ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া' ছিল আসলে সত্যিকার অর্থে নাজাত লাভ করা। তিনি অনুধাবন করেন যে, কিয়ামতের দিন তিনি যখন আল্লাহর সামনে দাঁড়াবেন, তখন তাঁর আশেপাশের লোকজনের কেউই তাঁর কাজে আসবে না।

এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর তাঁকে মানুষের ক্রোধের সম্মুখীন হতে হয়। (এতে সন্দেহ নেই যে, তিনি বুঝেছিলেন যে, আল্লাহ্‌র ক্রোধের মুখোমুখি হবার চেয়ে, লোকজনের ক্রোধের মোকাবেলা করা শ্রেয়)। বিভিন্ন নামে ডাকা এবং নানাভাবে তাঁকে অপমান করা শুরু হয়ে গেল। তারা তাঁকে একজন বিপথগামী ব্যক্তি বলে অভিহিত করল – অজ্ঞ এবং বোকা লোকদের অন্তর্ভুক্ত বলে তাঁকে চিহ্নিত করা হলো। তাঁর মতামতগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হলো এবং তাঁকে কোন না কোন বিপথগামী দলের অন্তর্ভুক্ত বলে চিহ্নিত করা হলো। উদাহরণস্বরূপ লোকজন এমন দাবী করলো যে, তিনি হলেন তাদের একজন যারা বিশ্বাস করে যে, দু'আর কোন কার্যকারিতা নেই। তারা তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এইজন্য করেছিল যে, জামাতে সালাতের শেষে ইমামের সাথে একত্রে দু'আ করার মত বিদ'আতী কর্মকান্ডে

www.pathagar.com

তিনি অংশগ্রহণ করেন নি। কেউ কেউ দাবী করলো যে, তিনি শি'য়াদের একজন এবং তিনি সাহাবীদের ঘৃণা করতেন। তারা তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলেছিল এইজন্য যে, তিনি বলেছিলেন যে, জুমার খুতবায় খুলাফায়ে রাশেদীনদের কথা উল্লেখ করা এবং তাঁদের জন্য দু'আ করাটা জরুরী নয়। তিনি বলেছিলেন যে, প্রথম প্রজন্মের খুতবাগুলোতে তাঁরা তা করতেন না এবং সেজন্য তিনি এই প্রথা অনুসরণ করেন নি। তাঁর বিরোধীরা দাবী করলো যে, তিনি আল্লাহ্র প্রতি নিবেদিতপ্রাণ বান্দাদের বিরোধিতা করছেন। তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযেগের কারণ ছিল এই যে, তিনি ঐ সমস্ত বিদ'আতী সুফী দরবেশদের বিরোধিতা করেছিলেন, যারা সুন্নাহ্ বহির্ভূত কাজ করে যাচ্ছে। তাঁর কথা ছিলঃ তারা আল্লাহর নিবেদিতপ্রাণ বান্দাদের অন্ত ভুক্ত নয়। কেউ কেউ দাবী করেন যে, তিনি আহলুস সুন্নাহ ওয়া আল জামা'আর বিরোধিতা করে যাচ্ছিলেন, কেননা বেশীরভাগ মানুষ যা অনুসরণ করে, সেটাকে আহলুস সুন্নাহ ওয়া আল জামা'আহ বলে ধরে নেয়া হতো। উত্তরে **আল-শাতিবী** বলেন যে, মানুষজন এটা এমনকি উপলব্ধিও করে না যে, হাদীসে যে জামা'আহ্র কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে নবী (সা.), তাঁর সাহাবীগণ এবং যারা তাঁদের অনুসরণ করেন - তাঁদের জামা'আত। তিনি বলেন যে তাঁর বিরুদ্ধে ঐ সব অভিযোগগুলোর সবই ছিল মিথ্যাচার ও কটূক্তি।

আল শাতিবী তারপরে **ইবন বাত্তাহর** কাহিনী উল্লেখ করেন, যিনি ছিলেন একজন নামকরা স্কলার। **ইবন বাত্তাহ** বলেন যে, তার অভিজ্ঞতা ছিল সত্যিকার অর্থে বিস্ময়কর। তিনি দূরদূরান্তে ভ্রমণ করেছেন এবং বহু জনগোষ্ঠীর সাক্ষাত লাভ করেছেন। যখন তিনি কোন জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে একমত হয়েছেন, তখন তাঁর কোন

www.pathagar.com

সমস্যা হয়নি। কিন্তু যখন কোন ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেছেন, তখনি তাঁকে কোন বিশেষ নামে অভিহিত করা হয়েছে।[২০৮]

তিনি যদি এই মতামত ব্যক্ত করতেন যে, তাদের কোন একটা মত কুর'আন ও সুন্নাহর বিরুদ্ধে যাচ্ছে, তারা তখন তাকে খারেজীদের একজন বলে ডাকত। তিনি যদি তাদের তাওহীদ সম্বন্ধে কোন হাদীস পড়ে শুনাতেন, তারা তখন দাবী করতো যে, তিনি নরত্ব আরোপে বিশ্বাসী (মানুষের আদলে আল্লাহকে কল্পনা করা)। হাদীসগুলো যদি ঈমান সংক্রান্ত হতো, তবে তারা তাকে মুরজিয়া বলে ডাকতো (যারা কার্যকলাপকে ঈমানের অংশ মনে করে না)। যদি আবু বকর এবং ওমরের (রা.) সদ্গুণ সংক্রান্ত কোন হাদীস আলোচিত হতো, তবে তারা তখন তাকে নাসাবী বলে ডাকতো [যারা আলী (রা.) কে অভিশাপ দিত]। যদি নবীর (সা.) পরিবারের গুণাগুণ বর্ণনা করে কোন হাদীস আলোচিত হতো, তবে তারা তাকে রাফেদী (শিয়া) বলে অভিহিত করতো। তিনি যদি কোন একটি আয়াতের বা হাদীসের ব্যাখ্যার ব্যাপারে মৌন থাকতেন এবং তিনি যদি কেবল ঐ সংশ্লিষ্ট আয়াত অথবা হাদীসটি উল্লেখ করে তার মতামত ব্যক্ত করতেন, তবে তারা তাকে জাহেরী বলে অভিহিত করতো। তিনি যদি কোন ব্যাখ্যা সহকারে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতেন, তারা তখন তাকে বাতেনী বলে ডাকতো (গূঢ় তত্ত্বে বিশ্বাসী)। তিনি যদি একটা ব্যাখ্যা প্রদান করতেন, তখন তারা কখনো তাকে আশ'আরী বলে অভিহিত করতো (আবুল হাসান আল আশ'আরী - যিনি আল্লাহর অনেক সিফাতের রূপক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন)। তিনি যদি কোন একটা লিখিত বিষয়ের

---

[২০৮] বিশেষ নামে অভিহিত হওয়াটা আজো অব্যাহত রয়েছে। কেউ যখন সুন্নাহ্ অনুসরণ করেন তখন তাকে "মধ্যযুগীয়", "সেকেলে", "পশ্চাদপদ", "মৌলবাদী", "ওয়াহাবী", "সন্ত্রাসী" ইত্যাদি নানাবিধ নামে ডাকা হয়। আদতে ঐ ব্যক্তির সন্ত্রাসবাদের সাথে কোন সম্পর্ক না থাকলেও, পশ্চিমা ধারার মিডিয়াগুলো এক্ষেত্রে খুবই সফলভাবে সন্ত্রাসীকে যেমন ভাবে উপস্থাপন করা হয়, তেমনিভাবে সত্যিকার সুন্নাহ্র অনুসারীকেও উপস্থাপন করেছে। আজ তাই "সন্ত্রাসী" অভিব্যক্তিটা সুন্নাহ্র অনুসারী যে কারো বেলায় যে কাউকে অনায়াসে প্রয়োগ করতে দেখা যায়।

www.pathagar.com

আপাত অর্থ প্রত্যাখ্যান করতেন, তখন তারা তাকে মু'তাযিলী কাফির বলতো (যারা যুক্তিকে ওহীর উপর প্রাধান্য দেয়)। নবীর (সা.) কাছ থেকে আসা বর্ণনার সূত্র দিয়ে তিনি যদি সবচেয়ে শক্তিশালী মতটা ব্যক্ত করতেন, তারা তখন বলতো যে তিনি তাদের স্কলারদের বিশ্বস্ততা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করছেন। এ সকল অভিজ্ঞতার পর **ইবন বাত্তাহ** এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এসব থেকে বেঁচে থাকার কোন উপায় নেই। তিনি কেবল কিতাব ও সুন্নাহর সাথে প্রাণপণে লেগে থাকতে পারেন এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারেন।

ইবন বাত্তাহর গল্পের বর্ণনা করার পর **শাতিবী** বলেন, তাঁর কাছে মনে হচ্ছিল যে, **ইবন বাত্তাহ** বুঝি সকলের মুখের মাধ্যমে কথা বলছেন। অর্থাৎ, এমন কোন স্কলার বা সৎকর্মশীল ব্যক্তি নেই, যিনি সুন্নাহর সাথে লেগে থাকবেন অথচ, যারা সত্যিকার অর্থে কুর'আন ও সুন্নাহর অনুসরণ করছে না তাদের তরফ থেকে এই ধরনের আক্রমণের মুকাবিলা করবেন না। এটা এইজন্য যে, অন্যেরা আসলে তাদের ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা ও পছন্দ-অপছন্দ অনুসরণ করে চলেছে এবং কোনটা সর্বোৎকৃষ্ট ও সত্য সে সম্বন্ধে তারা অজ্ঞ।[২০৯]

কোন ব্যক্তি যখন নবী (সা.)-এঁর সুন্নাহর সাথে লেগে থাকার সচেতন ও বিজ্ঞ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তখন সে উপরে বর্ণিত সকল কিছু অথবা তারও চেয়ে বেশী বিরোধিতার সম্মুখীন হতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, যে কারো কখনোই নিরাশ হওয়া বা বিশ্বাস হারানো উচিত নয়। নবী (সা.) যে রাস্তা দেখিয়ে গেছেন, তার চেয়ে ভিন্ন পথসমূহ যারা অনুসরণ করে চলেছে, তারা নিজেদের খেয়াল-খুশী অনুযায়ী সেগুলো করছে এবং নিজেদের ক্ষতির বিনিময়ে তা করে চলেছে। যে নবীকে (সা.) অনুসরণ করার ও তাঁর সুন্নাহ অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নেয়, সে হচ্ছে এমন এক ব্যক্তি যে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করবে ও যাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। যেমনটা নবী (সা.) বলে গেছেন,

---

[২০৯] দেখুন: Page#33-39, Vol.1 , *Al-Itisaam* - Ibraheem al-Shaatibi.

www.pathagar.com

"আমার উম্মাহর সকল লোকজন জান্নাতে প্রবেশ করবে কেবল তারা ছাড়া যারা প্রত্যাখ্যান করে।" তাঁর সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, *"কারা প্রত্যাখ্যান করবে?"* তিনি উত্তর দিলেন, *"যারা আমাকে মান্য করে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে; যারা আমাকে অমান্য করবে তারাই (জান্নাতে প্রবেশ করাকে) প্রত্যাখ্যান করলো।"* (বুখারী এবং অন্যান্য)

উপসংহার

ইসলামের পথ অর্থাৎ সেই সকল পথ যা আল্লাহর সন্তুষ্টিতে আমাদের নিয়ে যায়, তা নবী মুহাম্মাদ (সা.) যে পথ অনুসরণ করেছিলেন তা ছাড়া আর কিছুই নয়। সেটা হচ্ছে একমাত্র ইসলামের সত্য 'সংস্করণ'। নবী (সা.) পরিস্কার করে দিয়ে গেছেন যে, বাকী সকল পথের উপরে শয়তানরা রয়েছে যারা সেদিকে লোকজনকে ডাকছে। বুদ্ধিসম্পন্ন যে কারো এই সত্যতা উপলব্ধি করা উচিত এবং দাঁত দিয়ে কোন কিছু শক্ত করে কামড়ে ধরে রাখার মত করে, নাছোড়বান্দার মত সুন্নাহ আঁকড়ে থাকা উচিত।

কিন্তু নবীর (সা.) এই অনুসরণ বিশুদ্ধ ধরনের হতে হবে। এটা যেন ঈমানের কিছু ব্যাপারের দিবানিশি পুনরাবৃত্তি না হয়, বা তা যেন কেবল জনসমক্ষে নিজেকে সুন্নাহর অনুসারী বলে প্রতীয়মান করার চেষ্টা না হয়। তার পরিবর্তে, তা যেন সুন্নাহ অনুসরণ করার এক সমন্বিত প্রচেষ্টা হয় - যাতে জীবনের প্রতিটি দিক অন্তর্ভুক্ত থাকবে। যে কারো বিশ্বাস, তার কর্মকান্ড এবং আচার-ব্যবহার সবকিছুই রাসূল (সা.) এঁর সুন্নাহ মোতাবেক হতে হবে।

আজকের এই দিনে এবং যুগে এই উদ্দেশ্য হাসিল করা সহজ নাও হতে পারে। খুব অল্প সংখ্যক মানুষই যে কাউকে এ পথে চলার ব্যাপারে সহযোগিতা করতে রাজী হতে পারে। সুন্নাহ্‌র এই পথে যারা পদচারণা করবেন, তাদেরকে অবশ্যই অপরিচিত বলে সাব্যস্ত হওয়ার মত অভিজ্ঞতা লাভ করতে হবে - ঠিক যেমনটা নবী (সা.) নিজে

www.pathagar.com

অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন এবং সে সম্বন্ধে তিনি বলে গিয়েছেন। কিন্তু জান্নাতের সুসংবাদ হচ্ছে 'অপরিচিতদের' জন্য। ইনশা'আল্লাহ আখিরাতে তারা উপলব্ধি করবেন যে, এই পৃথিবীর মানুষকে সন্তুষ্ট করার পরিবর্তে আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার পথ বেছে নিয়ে তারা সঠিক সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছিলেন।

শেষ কথা

এ পর্যায়ে বিভিন্ন পর্যায়ের উপসংহারগুলি উল্লেখ করার বোধ করি আর প্রয়োজন নেই। সুন্নাহর কর্তৃত্ব, মর্যাদা ও গুরুত্ব প্রশ্নাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ব্যাপারটা এক জ্বলন্ত শিখার মত পরিস্কার ও উজ্জ্বল। মুসলিমকে এই সত্য অনুধাবন করতে হবে। আল্লাহ্ তাঁর দয়া ও করুণায় মুসলিমদের দুটো নিখুঁত ও পর্যাপ্ত দিক-নির্দেশনা দান করেছেন: পবিত্র কুর'আন এবং আল্লাহ্‌র রাসূলের (সা.) সুন্নাহ্। একজন মুসলিমের কেবল সেগুলোকে পরিপূর্ণরূপে বিশ্বাস করতে হবে এবং তার সার্বিক সামর্থ অনুযায়ী সেইগুলোকে প্রয়োগ করার ইচ্ছা থাকতে হবে। সে যদি তা করে, তবে ইনশা'আল্লাহ সে আল্লাহর ক্ষমা, দয়া এবং সন্তুষ্টির চিন্তা করতে পারে। একজন ব্যক্তি যদি তা করতে অস্বীকার করে, তবে সে নিজেকে কেবল নিজের ধ্বংসের দিকেই ঠেলে দিচ্ছে। আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন: ***"আমি তোমাদেরকে একটা স্পষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর রেখে যাচ্ছি যার রাত হচ্ছে দিনের মতই। আমার পরে এই পথ থেকে কেউ বিচ্যুত হবে না, কেবল একজন ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া।"*** (আহমাদ, ইবন মাজা এবং আল হাকিম আলবানীর মতে সহীহ। হাদীসগ্রন্থ বহির্ভূত অনেক কাজে এই হাদীসটি বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়, "আমি তোমাদেরকে এক পরিস্কার প্রমাণের উপর রেখে যাচ্ছি।" কিন্তু জামাল জারাবযোর জ্ঞান মতে, কোন হাদীসগ্রন্থে কথাটা এই ভাবে উল্লিখিত নেই। বরং উপরে আমরা হাদীসটি যে শব্দাবলীতে বর্ণনা করেছি, সেটাই শুদ্ধ। আর আল্লাহ্‌ই সবচেয়ে ভাল জানেন।)

www.pathagar.com

www.pathagar.com

রণী প্রকাশনীর অন্যান্য বই

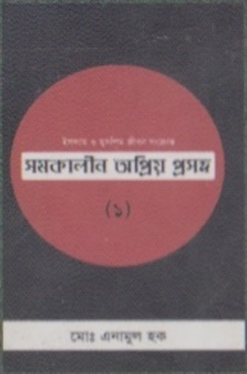

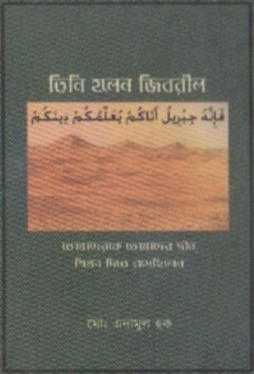

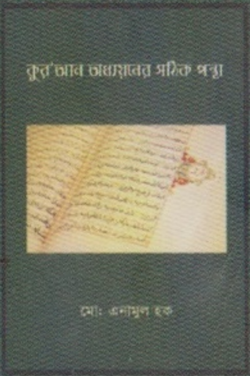

ণী প্রকাশনী